

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
কালাম মাহমুদ

ছেপেছেন :
বলিয়াদী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩৭ বংশাল রোড
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

পরম স্নেহভাজন

খোশরু নাবলু লুলু নায়লা মুমু—কে

আবদুস সাত্তার-এর অন্যান্য গ্রন্থ

বৃষ্টি মুখর (কাব্যগ্রন্থ)
অন্তরঙ্গ ধ্বনি (কাব্যগ্রন্থ)
আমার ঘর নিজের বাড়ি (কাব্যগ্রন্থ)
নামের মৌমাছি (ট্রিওলেট কাব্যগ্রন্থ)
আরবী কবিতা (অনুবাদ)
বালি ও ফেনা (আরবী অনুবাদ কবিতা)
আধুনিক আরবী গল্প (অনুবাদ)
আরণ্য জনপদে (গবেষণা)
আরণ্য সংস্কৃতি (গবেষণা)
মোমেনশাহীর জারিগান (গবেষণা)
বাংলাদেশের উপজাতীয় সংস্কৃতি (প্রবন্ধ সংকলন)
উপজাতীয় ভাষা ও সাহিত্য (গবেষণা)
In the Sylvan Shadows (Research)
Patterns of Tribal Culture (Research)
The Sowing of Seeds (Sociology on Primitive Sex)
The Chakmas (Research)
Tribal Culture in Bangladesh (Research)

ভূমিকা

পৃথিবীতে যে-সমস্ত ভাষার আদিম রূপ নির্ণয় করা যায় এবং আদিম রূপ থেকে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হবার ক্রমধারাগুলো সর্বাংশে আবিষ্কার করা যায়, আরবী ভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম। অনেক ভাষার আদিম রূপ নিশ্চিহ্ন হয়েছে আবার অনেক ভাষার আদিম রূপের সঙ্গে আধুনিক রূপের ক্রমধারা সুপরিস্ফুট নয়। কিন্তু আরবী ভাষার ক্ষেত্রে এ কথাটি সত্য নয়। বিশেষ করে ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত আরবী ভাষার বিকাশ এবং বিস্তার এত সুচারুরূপে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল যে, সহজেই সেই যুগ থেকে আরম্ভ করে আজকের কাল পর্যন্ত আরবী ভাষা ও সাহিত্যের স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া মোটেই জটিল হয় না।

ধর্মীয় কারণে কোরআন শরীফ এবং তার ব্যাখ্যার সূত্রগুলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হাদিস ও তার ব্যাখ্যার সূত্রগুলো বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাষার দিক থেকে সহজেই মানুষের বোধের আয়ত্তে এবং সম্ভবত এই কারণেই এবং ধর্মীয় আবেগের কারণেত বটেই, আমাদের দেশে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বলতে ধর্মীয় সাহিত্যের চর্চা বোঝায় এবং আমাদের মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সাধনায় যারা রত তাঁরাই সবসময় গুরুত্ব দিয়ে আসছেন ধর্মীয় সাহিত্যের উপর। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য যে অর্থে একমাত্র একটি অতীত যুগের স্বাক্ষর বহন করছে, আরবী ভাষা ও সাহিত্য শুধুমাত্র সেই অর্থে একটি কালকে বহন করে নেই, তার অগ্রগতি ঘটেছে এবং বিবিধ প্রকার পরিবর্তন ঘটেছে।

ইসলামী সাহিত্য আরবী সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ, কিন্তু তারও একটি ক্রমধারা আছে এবং পরিবর্তন-লিপি আছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় ধর্মীয় সাহিত্যের যে তাৎপর্য নির্ণীত হয়েছিল, বর্তমানকালে সেই তাৎপর্যগুলো নতুনভাবে

পরিবর্তিত হয়েছে। আবার মোতাজিলাদের সময় নতুন যুক্তির সাহায্যে কোরআনের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করবার চেষ্টা হয়েছিল।

মানুষের চিন্তা কখনও একটি বিশেষ বিবেচনায় চিরকাল আবদ্ধ থাকে না, সে নতুন নতুন বিবেচনার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে চায়। সেই কারণেই দেখি আরবী ভাষায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন তাৎপর্যে ধর্মীয় সত্যকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, এই ইতিহাসও একটি বিরাট ইতিহাস। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে এই ইতিহাসের সমগ্র অংশকে আমরা শিখি না, মধ্যযুগের অংশকে শুধুমাত্র আমাদের আয়ত্তে আনি। আমাদের মাদ্রাসাগুলো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আরবী পাঠ্যসূচী পরীক্ষা করলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

এ-ছাড়া আরবী সাহিত্যের বিরাট একটা আধুনিক যুগ রয়েছে। আরবী ভাষা-ভাষিগণ বিভিন্ন সময় ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হয়েছেন, প্রধানত ফরাসী এবং ইংরেজী সংস্কৃতির সঙ্গে। সেই সংস্কৃতির ছাপ তাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে ধরা পড়েছে। এই বিরাট সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের আরবীশিক্ষিত পণ্ডিতদের বিশেষ কোনও যোগাযোগ নেই। এই যোগাযোগ না থাকার কারণ ঐতিহাসিক।

মোগলযুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আরবী চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। সেইসমস্ত কেন্দ্রে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ইসলামধর্ম। প্রধানত রাজনৈতিক কারণে এবং অংশত ধর্মীয় কারণে মোগলযুগে আরবী শিক্ষার অর্থ ধর্মীয় শিক্ষাই বোঝাত। অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতিপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের একমাত্র উপায় ছিল মুসলমান হিসাবে চিহ্নিত হওয়া।

বৃটিশ আমলে একই ঐতিহ্য প্রবহমান রইল। বৃটিশরাও এদেশের জনসাধারণকে রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিষ্ঠার সুযোগ না দিয়ে ধর্মীয় চিন্তায় এবং অনুশীলনে তাদেরকে ব্যাপৃত রাখলেন। পাকিস্তানী আমলে পুরানো ঐতিহ্যই সমর্থিত রইল।

বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের সুযোগ এসেছে আরবী ভাষা এবং সাহিত্যকে সমগ্রভাবে জানার এবং যতটা সম্ভবপর পরিপূর্ণভাবে জানার। কেননা এই ভাষা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র একটি ধর্মকে জানতে চাচ্ছি না, আমরা একটি বিরাট জাতিকে জানতে চাচ্ছি এবং তাদের ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করতে চাচ্ছি।

জনাব আবদুস সাত্তারের 'আধুনিক আরবী সাহিত্য' গ্রন্থটি এই জানতে-চাওয়ার পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। লেখকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক আরবী

ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা পাঠককে পরিচিত করানো এবং এই পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি সফলকাম হয়েছেন বলে আমি মনে করি।

গ্রন্থটিকে আধুনিক আরবী সাহিত্যের সহজ ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করলে গ্রন্থটির প্রতি সুবিচার করা হবে। লেখক কোনও জটিল সাহিত্য-তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করেননি অথবা আরবী ভাষা এবং সাহিত্যের বিস্তারের পটভূমি হিসাবে যে বিচিত্র সমাজ-জীবন রয়েছে সে সমাজ-জীবনের তাৎপর্যও পরীক্ষা করেননি অথবা ফরাসী এবং ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক আরবী সাহিত্যের যে বিপুল রূপ পরিবর্তন ঘটেছিল তার বিশেষত্বও তিনি বিশ্লেষণ করেননি। তিনি সহজ ভাষায় আধুনিক আরবী সাহিত্যের একটি পরিচয়লিপি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতা প্রথম পথপ্রদর্শকের।

আমি এ গ্রন্থের বহুলপ্রচার কামনা করি।

সৈয়দ আলী আহসান

প্রসঙ্গ কথা

আরবী ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম উন্নত ভাষা ও সাহিত্য। সাম্প্রতিককালে অন্যান্য সাহিত্যের মতো আরবী সাহিত্যও বেশ অগ্রগতির পথে এবং এই অগ্রগতির একমাত্র ফলশ্রুতি আধুনিক আরবী সাহিত্যিকদের নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত।

আধুনিক আরবী সাহিত্য যে কতটা উন্নত এবং সমৃদ্ধ তা পঞ্চম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়কালের আরবী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলেই বোঝা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই আধুনিক আরবী সাহিত্যের সময়কাল শুরু এবং এর গতি আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। 'আধুনিক আরবী সাহিত্য' প্রসঙ্গে প্রাচীন আরবী সাহিত্যের কথা আপনা-আপনি এসে যায় এবং এই কারণেই আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচীন আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রতি সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।

আরবী ভাষাভাষী মধ্যপ্রাচ্যের সউদী আরব, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, আল-কোয়েত, লিবিয়া, জর্দান, ফেলিস্তিন, তিউনিস, মরক্কো, ইরাক, সুদান প্রভৃতি দেশের কবি-সাহিত্যিকদের মিলিত প্রচেষ্টাই আরবী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে নিয়োজিত। কেবল মুসলমানরাই যে আরবী সাহিত্যের লেখক এমন কথা বলা যায় না। কেননা অনেক খৃষ্টান এবং ইহুদী লেখকও আরবী সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে নিবেদিতপ্রাণ। এই প্রসঙ্গে খৃষ্টান লেখক জীবরান খলীল জীবরান ও জুরজী জায়দানের নাম করা যায়। আরবী সাহিত্যে এঁদের অবদান যে-কোন মুসলিম আরবী লেখকদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। বরং খলীল জীবরানের মুসলিম দর্শন বিশ্ববিশ্রুত এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য তাঁকে নিয়ে রীতিমত গর্বিত।

জীবরান খলীল জীবরানের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম সমালোচনা গ্রন্থ 'আর-রাওআ'-উল মুখতারাতা ফিল আদাবুল আরবী' আরবী সমালোচনা-সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। অনুরূপভাবে সুবৃহৎ ছয় খণ্ডে সমাপ্ত জুরজী জায়দানের 'তারিখ-ই-আদাবুল লুগাতুল আরাবিয়্যা'-ও আরবী সমালোচনা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। তা'ছাড়া লেবাননের খৃষ্টান লেখক লুইস শাইখোব অবদানও আরবী সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। এমনকি লেবাননেব মাবটিন জে.দাস-এর আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ 'আরাক্ষু মাজহাবাকা' মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টির গবেষণামূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ।

কাজেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য কেবল আরব রাজ্যসমূহের মুসলমানদের হাতেই সীমাবদ্ধ নয়; খৃষ্টান ও হিন্দুধর্মাবলম্বী অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিতও আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁদের মূল্যবান অবদান সংযোগ করেছেন এমন নজিরও বিরল নয়। এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর 'মুনজেরাতুল আদিয়ান' আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর পরবর্তী ফারসী গ্রন্থ 'তোহ্ফাতুল মুয়াহ্হিদীন'-এর ভূমিকাও আরবী ভাষায় লিখিত এবং তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

ধর্মান্ধতার স্পর্শ আধুনিক আরবী সাহিত্যে অনুপস্থিত। অধিকাংশ আরবী লেখক ও পণ্ডিতগণ স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার নায়ক। এবং স্বাধীন ও মুক্ত বুদ্ধির নায়ক বলেই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার ও মননশীল রচনার রূপকার ডক্টর তাহা হোসাইন লিখতে সমর্থ হয়েছেন 'ফিল আদাবিল জাহেলী'। এই গ্রন্থে লেখক ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবী সাহিত্যের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, পবিত্র কুরআনের ভাষা সম্পর্কেও আলোচনাধর্মী আলোকপাত করেছেন।

অনুরূপভাবে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী তাওফীক আল-হাকীম রাসূলে-করীমের জীবনকেন্দ্রিক নাটক 'মুহম্মদ' রচনা করতেও দ্বিধা প্রকাশ করেন নি। আধুনিক আরবী সাহিত্যে এসব অবদান নিঃসন্দেহে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তারই নামান্তর, সন্দেহ নেই।

আসলে ইসলামও অন্ধ-সমর্থন পছন্দ করে না। এ শ্রেণীর ধর্মান্ধ গোঁড়া ব্যক্তিরাই ইসলামকে খাটো করার প্রয়াসে সচেষ্ট। ইসলামধর্মের মতো উদারপন্থী ধর্ম পৃথিবীতে খুব কমই আছে; যে জন্যে ইসলামের আবির্ভাবের পর কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বিশ্বে এর বিস্তৃতি সম্ভব হয়।

'আধুনিক আরবী সাহিত্য' গ্রন্থে আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন কবিতা, প্রবন্ধ ও মননশীল রচনা, কথা-সাহিত্য, নাটক, লোকগীতি ইত্যাদির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। তবে আরবী সাহিত্যের আধুনিক চিন্তা-ভাবনা এবং অগ্রগতির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অধিকমাত্রায়। প্রসঙ্গক্রমে আরবী সাহিত্যের অতীত ইতিহাসের প্রতিও যে দৃষ্টিনিবদ্ধ না করা হয়েছে এমন নয়। আরবী কবিতা ও গদ্যরীতির উল্লেখে আইয়্যামে জাহেলিয়া, আইয়্যামে ইস-লামিয়া, উমাইয়া, আব্বাসীয় যুগ ছাড়াও অষ্টাদশ শতব্দীর আরবী কবি-সাহিত্যিক পর্যন্ত আরবী সাহিত্যের একটা মোটামুটি ধারাবাহিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। আধুনিক আরবী সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির তুলনামূলক পরিচয়ের সাপেক্ষে এসবের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য মনে করেই এরূপ করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।

'আধুনিক আরবী সাহিত্যের' এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে 'আদাবুল আতফাল' বা শিশু-সাহিত্য। আরবী শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে আলাদাভাবে গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছে আছে বলে এই গ্রন্থে 'শিশু-সাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনায় বিরত রইলাম।

'আধুনিক আরবী সাহিত্য' গ্রন্থে সাম্প্রতিককালের আরবী কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। যে-সব কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থের নাম এই গ্রন্থের শেষে 'আধুনিক আরবী গ্রন্থাবলী' শীর্ষক তালিকায় জুড়ে দেয়া হলো, অন্ততঃ তাঁদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা সৃষ্টির জন্য। আধুনিক

আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও যে নগণ্য নয় এই তালিকা সে কথাও সপ্রমাণ করে।

আধুনিক আরবী সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন এই প্রথম। কাজেই বাঙালী পাঠক-পাঠিকা ও সুধীসমাজ যদি আধুনিক আরবী সাহিত্য সম্পর্কে সামান্যতমও অবহিত হতে সমর্থ হন তবে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে-সব পুস্তক থেকে সাহায্য নিয়েছি 'গ্রন্থ-পঞ্জীতে' সে-সবের উল্লেখ রইলো। তা'ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আধুনিক আরবী সাহিত্যের রূপকারদের সম্পর্কে অবহিত হতে আমাকে সাহায্য করেছেন লেবানন, মিশর ও ইরাকের কতিপয় কবি-সাহিত্যিক। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তা'ছাড়া এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে অধিক মাত্রায় উৎসাহিত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মুহম্মদ ইসহাক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আফতাব আহমদ রহমানী, একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান এবং বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহম্মদ আবুতালিব।

'মুক্তধারা' [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ] এই গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ না করলে নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটতো। 'মুক্তধারা'র নির্বাহী পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহার উৎসাহ এবং উদ্দীপনাই এ গ্রন্থ প্রকাশের একমাত্র উৎস। এঁদের সবার কাছে আমি ঋণী।

আমার শ্রদ্ধের শিক্ষক সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির মূল্য বাড়িয়েছে বহুগুণে। আমি তাঁর কাছেও চিরকৃতজ্ঞ।

আবদুস সাত্তার

সূচীপত্র

আধুনিক আরবী সাহিত্য

কাব্যসাহিত্য

আববী সাহিত্যে কাব্যশাখাব পরিধিই সবচেয়ে বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ। এই বিস্তৃতির পরিধি এবং সমৃদ্ধিব ঔজ্জ্বল্যকে অন্যান্য শাখার প্রাবল্য আজ পর্যন্ত সঙ্কুচিত কিংবা ম্লান করতে সমর্থ হয নি। তাই আরবী সাহিত্যে কাব্যশাখাই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বেব দাবিদার।

আধুনিক ইতিহাসবেত্তাবা আববী সাহিত্যকে মোটামুটি পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন:

১. আইয়্যামে জাহেলিয়া বা অন্ধকাব যুগ—৫০০ খৃীষ্টাব্দ থেকে ৬১০ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বাসুলুল্লাহ্‌র নবুয্যতপ্রাপ্তির সময়কাল পর্যন্তকে আইয়্যামে জাহেলিযা ধবা হয।

২. আইয্যামে ইসলামিয়া—৬২০ খৃীষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত আইয্যামে ইসলামিযার সময়সীমা। পবিত্র কুরআন, চার খলিফা এবং উম্মাইদ বংশের গৌরবময কীর্তির সাহিত্যিক মূল্যায়ন আইয়্যামে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

৩. আব্বাসীয় যুগ—৬২০ খৃীষ্টাব্দ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আব্বাসীয যুগের বিস্তৃতি। আব্বাসীয় যুগই আরবী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবময় যুগ। ১২৫৮ খৃীষ্টাব্দে মঙ্গলদের কর্তৃক বাগদাদ দখলের পর থেকেই আব্বাসীয় যুগের অবসান হয়।

৪. রেনেসাঁ-পূর্ব যুগ—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাগদাদের পতনের পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত

রেনেসাঁ-পূর্ব যুগ বলে চিহ্নিত। এই সময়কালকে আরবী সাহিত্যের শোচনীয় কাল বলে আখ্যায়িত করা যায়। কেননা, এই সময়সীমায় আরবী সাহিত্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরানুকরণই ছিল এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫. রেনেসাঁ যুগ বা আন-নাহ্‌দা—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত রেনেসাঁ যুগের ব্যাপ্তি। এবং এটাই আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগ। সাহিত্যে পাশ্চাত্যের প্রভাব, জাতীয়তাবোধ এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাই এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

পঞ্চম শতাব্দীই আরবী কাব্য-সাহিত্যের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত। পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধের হাতিম আত্-তাঈ-এর কাব্যাদর্শ আরবী সাহিত্যের উৎস-কেন্দ্র স্বরূপ। বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালী সুধীমহলের কাছে হাতিম আত্-তাঈ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দানশীল 'হাতেম তাঈ' নামে খ্যাত। দয়া-দাক্ষিণ্য এবং মহানুভবতার আলখেল্লাই তাঁর সুনামের শরীর জড়িয়ে রাখে নি, প্রতিভাদীপ্ত কাব্যের স্বাক্ষরও তাঁকে অমর করে রেখেছে। আল-বুহ্‌তুরী সংকলিত দিওয়ান-ই-হামাসা তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। এই সংকলনে হাতিম আত্-তাঈ-এর বেশ কিছুসংখ্যক কবিতার অন্তর্ভুক্তি তাঁর কাব্য-কুশলতার পরিচয় বহন করে। প্রায় দুই হাজার বছরের কবির কাব্য-কথা আধুনিক যুগ-মানসের কানেও সমানভাবে আন্দোলিত। এ জন্যেই বলা হয় কবিতা সর্বযুগের, সর্বকালের।

আধুনিক কাল বলতে কোন দিকচিহ্ন নেই। কবি যে যুগের—সেটাই তাঁর আধুনিক কাল এবং হাতিম-আত্-তাঈ-এর কাব্যাদর্শেও তা সুস্পষ্ট :

তোমার সকল অস্থি পৃথিবীর অমর্ত প্রণয় :
অন্তিমে মৃত্যুর লীলা চিত্রার্পিত মাকড়সার জাল
নানান সৌকর্যে বোনা, অনন্ত কালের অগণন
পূর্ব-পুরুষের কাছে কী পেলে নির্জনে ?

চারুময়

মাকড়সার-স্বর্ণজাল অথবা সে অস্থির বলয়?
না হ'লে বিক্রেতা যেন কিছুই রাখে না আর বাকী
তোমার মনের মৌনে যা আছে স্মৃতির মূলধন
ঔষধের শেষ ফোঁটা কিংবা সে রাজস্ব এককণা।
অবজ্ঞার ম্লান হাসি। অতঃপর বিদ্রূপে একাকী
তোমার ও প্রেম যেন বিদীর্ণ বাঁশির আলোচনা।

হাতিম আত্-তাঈ-এর কাব্যকৃতিতে যে জীবন তংগত সে জীবন মাকড়সার অন্তরঙ্গ শৈল্পিক স্বর্ণসুতোর সমন্বয়সাধন। শিল্পই জীবন এবং শিল্প থেকে বিচ্ছিন্নতার অর্থই 'বিদীর্ণ বাঁশির আলোচনা'। বাঁশিও একটা শিল্পসঞ্জাত প্রেমময় জীবন। সে প্রেমের জন্য সুরের মাধুর্য। প্রেমহীন মন, অস্থিহীন দেহ, সুরহীন বাঁশি এবং শিল্পহীন জীবন সমার্থক।

আইয়্যামে জাহেলিয়ার প্রারম্ভিক সময়ে আরবী কবিতার স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য কি ছিল সে সম্পর্কেও সামান্য ইংগিত দেওয়া প্রয়োজন। তখনও কবিতার লিখিতরূপের প্রচলন ঘটে নি, বেদুঈনদের স্মৃতিচারণ ও মুখে মুখে প্রচারই ছিল কাব্যের বিস্তৃতির একমাত্র পন্থা। এমনকি বংশানুক্রমিকভাবে এই ধারা অব্যাহত ছিল। কবি ও কবিতা উভয়ই অলৌকিক শক্তি সমর্থিত বলে সর্বজন কর্তৃক আদৃত হতো। কাব্যপ্রীতি ও কাব্যবিস্তৃতির এটাও ছিল অন্যতম লক্ষণ।

কাব্যের বিষয়বস্তুতে আবর্তিত ছিল বেদুইনদের যাযাবর জীবন-প্রবাহের গতিপ্রকৃতি এবং অধিকাংশ কবিতাই ছিল হিদা, হিজা, রাজাজ ও কাসাস-কেন্দ্রিক গীতিকবিতা।

হিদা: কারাভাঁ-সঙ্গীত। উষ্ট্রের শকট (কারাভাঁ) চালকগণের মুখেই এ গান গীত হতো। গানের বিষয়বস্তু সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ ইত্যাদিতে ছিল মুখর। গানের সুরমাধুর্যে এমন ব্যঞ্জনা ব্যাপ্ত ছিল, যে জন্যে মরুভূমিতে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আরোহীরা ক্লান্তিবোধ করতো না। এমনকি উষ্ট্রের পদচালনায়ও গানের অনুপ্রেরণা ছিল অতিমাত্রায়।

হিজা : দ্বন্দ্ব-সঙ্গীত। গোত্রে গোত্রে লড়াই ছিল আরবদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই লড়াইয়ে অনুপ্রেরণার উদ্দেশ্যে রচিত ও গীত হতো হিজা। আরবদের ধারণায় কবি অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং কবিতা বা গানই সেই অলৌকিক শক্তি (supernatural power). আদিম বিশ্বাসে মন্ত্রের যেমন রয়েছে সারবস্তু (life-essence) তেমনি আরবদের বিশ্বাসে কবিতা বা গানেও সংযুক্ত অলৌকিক শক্তি। অতএব ভালো কবিতা বা গানের উন্মাদনায় বিপক্ষীয় গোত্রকে পরাভূত করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রচিত হতো হিজা এবং লড়াইয়ে জিততে পারলে কবিকে পুরস্কৃত করা হতো এই বিশ্বাসে যে. কবির কবিতায় রয়েছে অধিক মাত্রায় সারবস্তু। সুতরাং তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। ব্যঙ্গধর্মীতাও 'হিজার' অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রাজাজ : রণ-সঙ্গীত। রাজাজ ও হিজা প্রায় সমধর্মী। তবে তফাৎ এই যে, রাজাজ-এ প্রতিপক্ষীয় শৌর্য-বীর্য, সম্মান-খ্যাতি এমনভাবে কীর্তিত থাকতো যে, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা তাদের স্ব স্ব গৌরবের কথা স্মরণ রেখেই যুদ্ধ পরিচালনা করতো। যুদ্ধে জয়ের অর্থই হলো তাদের 'রাজাজ' অক্ষুণ্ন রাখা।

কাসাস : লোক-গীতি। কাহিনীনির্ভর গীতিকবিতাই 'কাসাস'-এর বিষয়বস্তু। 'কাসাস'-এর আভিধানিক অর্থ কেচ্ছা বা কাহিনী। আইয়্যামে জাহেলিয়ার লোক-গীতির মধ্যে 'হিরা ও গাস্যাম', 'জাজিম আল্-আবরাস ও জাব্বা', 'নুমান' প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে জাজিম আল-আবরাস ও জাব্বা' লোক-গীতিকেন্দ্রিক কাহিনীটি উল্লেখ করছি :

"জাজিমা আল-আবরাস ছিলেন হেরা-রাজ্যের রাজা। তাঁর ছিল এক পরমা সুন্দরী ভগ্নী এবং আদি নামে এক গৃহ-ভৃত্য। গৃহ-ভৃত্যের সঙ্গে রাজার ভগ্নি প্রেমাসক্ত হয় এবং সেই প্রেম নানারূপ বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বিয়েতে রূপলাভ করে।

বংশের মুখে কালিমা লেপনের অভিযোগে রাজা ক্ষুব্ধ হন এবং কৌশলে আদিকে হত্যা করেন। কিন্তু রাজার ভগ্নী তখন অন্তঃসত্ত্বা। সে এক পুত্রসন্তান প্রসব করলো। তার নাম রাখা হলো আমর। রাজা আল-আবরাস আমরকে নিজের পুত্রের মতোই লালনপালন করতে লাগলেন।

কয়েক বছর পর রাজা আল-আবরাস সিরিয়ার রাজাকে পরাজিত ও হত্যা করে সিরিয়া করায়ত্ত করলেন এবং সিরিয়ার রাজকন্যা জাব্বাকে বন্দী করলেন।

রাজার খেয়াল! তিনি জাব্বার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু জাব্বা এতে সম্মত হলো না। কিন্তু রাজা তার রূপলাবণ্যে উন্মত্ত। অতএব তাকে বিয়ে না করলেই নয়। শেষপর্যন্ত জাব্বা রাজী হলো—তবে এক শর্তে। হানিমুন করতে হবে সিরিয়ার এক নির্জন বাড়ীতে।

রাজা আল-আবরাস তাতেই রাজী হলেন। রাজার বন্ধু কাসির কিন্তু এতে জাব্বার অভিপ্রায়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন এবং আল-আবরাসকে নিষেধ করলেন সিরিয়ায় হানিমুন করতে যেতে। আল-আবরাস তখন জাব্বার প্রেমে সম্পূর্ণ উন্মত্ত। কারও উপদেশ শুনতে রাজী নন।

সিরিয়ার নির্জন বাড়ীতে আল-আবরাস উপস্থিত। জাব্বা এইবার পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সংকল্প। সে তার সহচরীদের আদেশ করলো, আল আবরাসকে এমনভাবে হত্যা করো যে, তার এক ফোঁটা রক্তও যেন মেজেতে না পড়ে।'

বলা আবশ্যক যে, আরবদের আদিম বিশ্বাসে রক্তের মধ্যেও রয়েছে সার-বস্তু, কেননা, রক্তই মনুষ্য-জন্মের আদি-রূপ। অতএব সেই রক্ত যেখানে-সেখানে পড়লে রক্তের পবিত্রতার অবমাননা ছাড়াও ক্ষতির সম্ভাবনা। তা'ছাড়া রাজকীয় রক্তের গুরুত্ব আরও বেশী।

আল-আবরাস এবার নিরুপায় এবং নিজের মৃত্যু নিশ্চিতভেবে কোষবদ্ধ তরবারি বের করে নিজেরই বুকে বসিয়ে দিলেন এই বিশ্বাসে যে, তাঁর রক্ত যেন ঘরের মেজে ও দেয়ালের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং রক্তের পবিত্রতার অবমাননায় জাব্বার সমূহ ক্ষতিসাধিত হয়।

আল-আবরাসের মৃত্যুসংবাদ বন্ধু কাসির এবং ভাগ্নে আমরের গোচরীভূত হলো। তারা সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফোরাতনদীর তীরবর্তী জাব্বার সেই নির্জন বাড়ী ঘিরে ফেললো। জাব্বা উপায়ান্তর না দেখে নিজের আংটির হীরা সম্বলিত বিষ চুষে আত্মহত্যা করলো এই আনন্দে যে, অন্তত: আমর

যেন বলতে না পারে যে, সে নিজে জাব্বাকে হত্যা করে আল-আবরাস হত্যার প্ররিশোধ গ্রহণ করেছে।

এই করুণ কাহিনীই 'জাজিমা আল-আবরাস ও জাব্বা' লোক-গীতিকার বিষয়বস্তু।

পঞ্চম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর হাতিম-আত্-তাঈ পর্যন্ত আরবী কবিতার গতি-প্রকৃতি গীতিধর্মীতায়ই অন্তরীণ ছিল। এই সীমাবদ্ধতার গণ্ডি বিচ্ছিন্ন হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির প্রতিভাদীপ্ত মসির তরবারিতে। এর মূলে অবশ্যি কয়েকটি কারণ ক্রিয়াশীল:

১. আরববাসীদের কবিতার প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগ।
২. কবি ও কবিতা উভয়ই অলৌকিক শক্তির নামান্তর।
৩. শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার।
৪. এমনকি কবির পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের উচচ-মর্যাদা দান এবং কবির জন্ম রীতিমত গর্বের বস্তু।
৫. কবিতা সংস্কৃতির রক্ষণাগার।
৬. কাব্য-প্রতিযোগিতা।
৭. ওকাজের মেলার ভূমিকা।

আরবী কবিতার বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির মূলে উপরে বর্ণিত কারণ সমূহের গুরুত্ব অত্যধিক। প্রসঙ্গতঃ ওকাজের মেলার উল্লেখ করা যায়। ওকাজের মেলা পবিত্র কা'বাগৃহকেন্দ্রিক বাৎসরিক উৎসব। এই উৎসবে শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার আসর বসত এবং কবিদেরকে পুরস্কৃত করা হতো।

পরবর্তী সময়ে এই ধারার পরিবর্তন ঘটে। ওকাজের মেলার কাব্যপাঠ আশ্রয়লাভ করে পবিত্র কা'বার দেয়ালে। কেননা, কবিতাপাঠের পরিবর্তে কা'বার দেয়ালে সেসব কবিতা ঝুলিয়ে দেয়া হতো এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিচারের মাপকাঠিতে কবিতার গুণাগুণ বিচার করা হতো। এই ঝুলানো কবিতার প্রতিযোগিতায় যে সাতজন কবি পর পর প্রথম স্থান লাভ করেন তাঁরাই 'সাব-আ-মু'আল্লাকার কবিগোষ্ঠী। [সাব-আ: সাবু-আ-মুআল্লাকা : ঝুলানো অর্থে]।

এই সাতজন কবির নাম ইমরাউল কায়েস, তরাফা, লোবাইদ, জুহায়ের বিন আবু সালমা, আমর বিন কুলসুম, আনতারা বিন শাদ্দাদ ও নাবিগা বিন জুবিয়ানী। সাতজন কবির শ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতার সংকলনই 'সাব-আ-মু-আল্লাকা' নামে খ্যাত। পরে অবশিষ্ট আরও তিনজন কবি, যেমন আল আশা, হারিস বিন হিলিজা ও আনতারা-এর কবিতা এতে সংকলিত হয় এবং তখন এর নামকরণ করা হয় 'আশরায়ে মু'আল্লাকা' বা দশটি কবিতার সংকলন। কিন্তু আরবী সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার কাছে 'সাব-আ-মু-আল্লাকার' খ্যাতিই অধিকমাত্রায়।

হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের পর উপ.র বর্ণিত কাব্য-প্রতি-যোগিতার অবসান ঘটে। তখন রাসুলুল্লাহ্‌র অমিয় বাণী, শুভদ শিক্ষা এবং পবিত্র কুরআনের মহান বাণী আরববাসীদের মনের আকাশে এক নবদিগন্ত চিহ্নিত করে। ফলে কবিসম্প্রদায় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও রাসুলুল্লাহ্‌র মতাদর্শ তাঁদের কাব্যকর্মে রূপায়িত করতে নিবিষ্ট-চিত্ত হলেন। রাসুলুল্লাহ্ নিজেও কবিতার সমঝদার হয়ে উঠলেন। এমনকি প্রতিভাবান কবিদের পুরস্কৃত করে তাঁদের কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি জানাতে শুরু করলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইয়্যামে জাহেলিয়ার কবিতার বিষয়বস্তু ছিল যাযাবর বেদুইন জীবনের হাসিকান্না, দুঃখ-দৈন্য ও প্রেম-বিরহ। 'সাব-আ মু'আল্লাকার' কবিগোষ্ঠীর কোন কোন কবি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-ঘটিত চিত্রও চিত্রিত করেছেন অকপটে। এ প্রসঙ্গে ইমরাউল কায়েস, জুহায়ের বিন আবু সাল মা ও নাবিগা বিন জুবিয়ানীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ দয়িতার দেহাবয়ব কাব্যের অলঙ্কারে এমনভাবে অলঙ্কৃত করেছেন যে, সেসব আজ পর্যন্ত কাব্যের জগতে অম্লান সূর্যের মতোই ভাস্বর হয়ে আছে।

'সাব-আ-মু'আল্লাকার অন্যতম কবি তরাফা ছিলেন স্যাটায়ার-এর রাজা। 'সাব-আ-মু'আল্লাকার' অন্তর্ভুক্ত স্যাটায়ারধর্মী 'মু-আল্লাকা' লিখে তিনি সম্রাট আমর বিন হিন্দ-এর সভাকবি নিযুক্ত হন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মেষের রাখাল। যাহোক, পরবর্তী সময়ে তিনি সম্রাটের ভগ্নীর প্রেমে

মত্ত হন এবং সম্রাটের আদেশে তাঁকে দেশত্যাগ করে বাহরাইনে চলে যেতে হয়। পালিয়েও তিনি নিষ্কৃতি পেলেন না। 'পরে তাঁকে বন্দী ও হত্যা করা হয়। তখনও তাঁর বয়স কুড়ি অতিক্রম করে নি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে রচিত তাঁর কবিতার কিয়দংশ আবেগধর্মীতার অনবদ্য আলেখ্য :

তোমরা অযথা কেন কলঙ্ক লেপন করো, আহা
আমার এ প্রেমের জগতে ?
তোমরা পারবে কভু আমাকে সে অমরত্ব দিতে ?
না। তোমরা তো নিষ্ফল জানি।
আমাকে দাও না মৃত্যু! আমি এই প্রেমের সম্পদ
উপহার দিয়ে তাকে অমরত্ব পাবো।- - -

আইয়্যামে জাহেলিয়ার কিছু কিছু কবিতা অশ্লীলতা দোষেও দুষ্ট। ইমরাউল কায়েসের মু' আল্লাকা তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য মদ, মাংস এবং নারী। এর পশ্চাতে অবশ্য কারণও আছে। বানু সা'আদ রাজবংশের এই সুদর্শন যুবককে 'ভবঘুরের রাজা' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। সারা আরবদেশে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তাঁর নেশা। এবং এজন্যেই তাঁর কবিতার চিত্রকল্পে পাহাড়, অরণ্য এবং মরুভূমির বৈচিত্র্য এতো প্রস্ফুটিত। বাইজানটাইন রাজকন্যার প্রেমে পড়ার অভিযোগে তাঁকেও দেশত্যাগ করতে হয় এবং সম্রাটের ইংগীতে উপহারসামগ্রীর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ইমরাউল কায়েসকে হত্যা করানো হয়, ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

ইমরাউল কায়েসের কবিতা অশ্লীলতামণ্ডিত, সন্দেহ নেই। কিন্তু আজও যা তাঁর সম্পর্কে চিরসত্য তা তাঁর অনবদ্য কাব্যপ্রতিভা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোনও ভারতীয় সমালোচক ইমরাউল কায়েসের কাব্যাদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন :

"Imra-ul-Qais is best known for his clever and ingenious images, insomuch so that he has won the surname of 'the Creator of Images'. He deserves the honour amply and justly, since it is he who showed the proper way to

use the power of imagination. His similes and images are his own, and are always, as a rule, quite apt and suitable. They are generally selected from objects of daily sight, so highly coloured by his imagination as to surprise by their bright novel appearance.' '[১]

উপরিউক্ত মন্তব্য ইমরাউল কায়েসের কাব্য-কর্মে যে কতটা সত্য তা নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি স্তবকে স্পষ্ট :

অনেক কুমারী নারী, মুরগীর ডিমের মতন
দাগহীন দেহের সৌষ্ঠব, আর কোনদিন ভুলে
যাদের তাঁবুতে অন্য পুরুষের পদক্ষেপ পড়েনি কখনো
নির্বিঘ্নে করেছি খেলা সেইসব রমনীর সাথে।

যখন উন্মত্ত আমি প্রেম-অভিপ্সায়
নিকুঞ্জের প্রহরী এবং তার শত্রুর শিবির
অনায়াসে পার হয়ে গেছি।
অথচ তাদের হাতে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা
ছিল, এতো জেনেও সঙ্গোপনে গিয়েছি সেখানে।

তখন আকাশে জ্বলে কৃত্তিকা নক্ষত্র;
পৃথিবী নিমগ্ন ঘুমে। জানালার শার্শিতে কেবল
দীপ্তিমান মুক্তা ছিল একাকিনী ইচ্ছার বিলাসে।

দরজার কাছে যাই, সে তখন সম্মুখে দাঁড়িয়ে
পর্দাটা আড়াল করে। নিছক আমার প্রতীক্ষায়
এতোক্ষণ জেগে ছিলো; শুধুমাত্র ঘুমের পোশাক
জড়িয়ে সোনার অঙ্গে। অবশিষ্ট আবরণ তার
খুলেছে পালঙ্কে যাবে বলে।

"খোদার কসম' বলে মহীয়সী সুন্দরী তখন
বাড়ালো নরম হাত। বললো : 'কী করে অস্বীকার

১. **Herbert Howarth and Ibrahim Shukrallah : *Images from the Arab World,* (London, 1944) P. VIII (Quoted).**

করবো তোমার প্রেম, কারণ জেনেছি আমি ঠিক
দুর্বার কামনা তব কিছুতেই এড়াবার নয়।' •

দু'জন উঠেছি আর নিশ্চুপে পালিয়ে যাবো বলে
নেমেছি পথের প্রান্তে, সে তখন মাথার ওড়না
বিছিয়ে দিয়েছে পথে, আমাদের পদচিহ্ন রেখা
ধুলোয় না পড়ে যেন কোনোক্রমে আর,
অথবা কাটে না দাগ লোকচক্ষু পথের সীমায়।

আত্মীয় স্বজন তার পার হলে পরে
আমরা মিলেছি দূর উপত্যকা ভূমির নির্জনে।
অজস্র বালির স্তূপ পাহাড়ের মতোন দাঁড়িয়ে
অন্তরাল দিয়েছিল আমাদের গোপন মিলনে।

কুঞ্চিত চুলের গুচ্ছ আস্তে রেখে মোলায়েম হাত
সান্নিধ্যে টেনেছি তাকে। কী আশ্চর্য আত্ম-সমর্পণ
আমার সত্তার কাছে। নরোম বুকের উষ্ণতায়
নিমগ্ন হয়েছি আমি। তার সেই নিতম্ব সুঠাম
আশ্চর্য চিকণ হয়ে মিলেছে মসৃণ কটিতটে,
হীরা মুক্তা অলঙ্কার দ্যুতিময় দেখেছি সেখানে।

ছন্দোময় তনুলতা। অপরূপ সুন্দরী সে নারী,
লোভনীয় দেহরেখা, আর তার যুগল স্তনের
মাঝখানে মনে হয় স্বচ্ছতম আয়না বসানো—
অথবা নিটোল উটপাখীর ডিমের প্রতিচ্ছবি,
কাঁচা হলুদের আভা বিচ্ছুরিত যেন তার থেকে
মধ্যভাগে প্রবাহিত বিচিত্র ঝর্ণার জলধারা।

ঈষৎ বাঁকায়ে গ্রীবা সেই বর-নারী
আমাকে দেখালো তার গালের নরম; অতঃপর
তাকালো আমার পানে। লাজনম্র চোখের চাহনি।
বনের হরিণী সেও হার মানে যেন মায়াময় সেই চাহনিতে।

তখন গ্রীবায় কাঁপে দুধের মতন সাদা তিতিরের শোভা
বাঁকালে মায়াবী গ্রীবা কী বা ছার বনের তিতির,
তুলনা হয় না তার অন্যকোন রমণীর সাথে।

মেঘের মতন কালো আজানুবিস্তৃত কেশরাশি
বিলম্বিত পৃষ্ঠদেশে; সে যেন খেজুর বৃক্ষ থেকে
ঝুলানো আনম্র শাখা সবুজ পাতার সমারোহে।

চুলের খোঁপাটা তার গুচ্ছবদ্ধ সবুজ খেজুর
মনে হতো। খসে যাওয়া সুবিন্যস্ত বেনীর বাঁধন
কিছুটা বিনুনিবদ্ধ, বাকীসব এলোমেলো, ওড়ে।

মুখের জৌলুস তার দীর্ণকরে রাত্রির আঁধার,
যেমন সন্ধ্যার গৃহে নিঃসঙ্গ সাধুব মোম জ্বলে'
আলোকিত প্রহর জানায়।

এমন রূপসী নারী, ষোল বছরের
মদির যৌবনে যার দেহ লীলায়িত
নিছক সুবোধ কোনো লাজুক পুরুষ
আত্মহারা হবে সেই সুন্দরীর রূপের বিলাসে।

'সাব-আ-মু'আল্লাকা' গোষ্ঠীর কবিদের সব কবিতাই কাসিদা ফর্মে রচিত। কাসিদা (قصيدة) শব্দটির উৎপত্তি কাসাদা (قصد) থেকে—যার আভিধানিক অর্থ 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। কাসিদার বৈশিষ্ট্য এই যে, কবিতা হতে হবে দীর্ঘ, কমপক্ষে পঞ্চাশ লাইন সম্বলিত এবং আগাগোড়া একই ছন্দ এবং আন্তঃমিল রক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে, কাসিদার রয়েছে তিনটি স্তরভেদ:

১. কবির দয়িতার বাসভূমির বর্ণনা। স্মৃতি-চারণের পরিপ্রেক্ষিতে দয়িতার জন্য আক্ষেপ।

২. প্রেমিকা কেন্দ্রিক দুঃখ-দুর্দশা, প্রেমিকার গোত্র-গোষ্ঠীর প্রসংশা ও অপ্রসংশা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রভৃতির বর্ণনা।

৩. ব্যর্থতার উচ্ছ্বাস এবং নীতিকথা।

কবিদের কাসিদার বিভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়। সে বিভিন্নতা শব্দ প্রয়োগ, বর্ণনা কৌশল ও বিষয়বস্তুতে নিবদ্ধ। The Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে 'কাসিদার' সংজ্ঞা দেওয়া আছে এইভাবে :

"An Arabic *Qasida* is a very artificial composition ; the same rhyme has to run through the whole of the verses, however long the poem be. In addition the composition is bound by a metre which the poet has to guard through the whole course of the poem. The result is that we cannot expect very much beautiful poetry ; the descriptions recur in endless poems expressed in the same manner, only with different words, the montony becomes nauseous.

The *Qasida,* by its references to persons and events, is also a source of historical information. This, however, must be handled with the utmost care, as false statements are frequent."

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, কাসিদার অর্থ 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (to b aimed at) এবং একারণেই 'সাব-আ-মু'আল্লাকার' গোষ্ঠীভুক্ত কবিরা যে-সব কাসিদা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তারা সবাই নিজস্ব ব্যক্তি-জীবনের ঘটনা সেইসব কাসিদায় ব্যক্ত করেছেন এবং প্রত্যেকটি ঘটনাই বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে সুললিত কাব্যঝংকারে মুখর এবং সেখানে আতিশয্য কিংবা মিথ্যার বাহুল্য নেই ('false statements are frequent).

'সাব-আ-মু'আল্লাকার কবিগোষ্ঠী থেকে শুরু করে আইয়্যামে ইসলামিয়া, আব্বাসীয়, এমন কি রেনেসাঁ-পূর্ব যুগের কবিদের কাব্যধারায় একই গতানুগতিকতা লক্ষ্য করা যায়। বিষয়বস্তু ও শব্দপ্রয়োগের বিভিন্নতা ছাড়া ছন্দপ্রকরণ ও আন্তঃমিলে একই নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা গেছে।

এই দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর কবিদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ওবায়েদ বিন আল আব্বাস, খানসা, আলী বিন আবু তালিব,

শানফারা, তা আব্বাতা শা'র, ইয়াজিদ বিন মু'আবিয়া, ওমর আবি রাবিয়াহ্, মাহবুবা, হাসান বিন সাবিত, কা'ব, মুতাম্মিম, আবু মিহজাল, আল হোতাইয়া, আল আখতাল, আল ফারাজদাক, জারির, ধু উর রোম্মা, মুতা ইবনে আয়াস, আবু নুবাস, আবুল আতাহিয়া, আল-মুতানাব্বী, আবুল আলা আল মা-আররী, আবু তাম্মাম, বুহতরী, ইবন আল মু'তাজ, ইবন আর-রুমী, তুগরাই, আল-বু'সিরী প্রমুখ।

কাব্যের আঙ্গিক গঠনে তাঁরা কাসিদা ও গজল ফর্মই ব্যবহার করেছেন এবং সর্বত্রই একই ধরনের ছন্দ ও অন্তঃমিলের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। তবে তাঁদের কবিতার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যময় দিক এই যে, সেসব সহজ সরল এবং প্রাণস্পর্শী। তাছাড়া কাব্য-শরীরে যে-সব উপমা ও রূপকল্পের আলঙ্কারিক বৈচিত্র্য বিধৃত তা রূপসী নারীদেহে স্বর্ণখচিত অলঙ্কারের মতোই সৌন্দর্যমণ্ডিত। অথচ কোথাও আলঙ্কারিক নক্সার আধিক্য কাব্য-সুন্দরীর মুখাবয়বে কুশ্রীতা লেপন করেনি, যে জন্যে সাধারণ পাঠকও কবিতার রস আস্বাদানে সমর্থ।

অধিকাংশ কবির কবিতাই 'দিওয়ান' বা কাব্য সংকলনে সংকলিত। বহুসংখ্যক কবির কবিতা সংগ্রহ করে একত্র সংকলিত করার নজিরও কম নয়। এ প্রসঙ্গে 'দিওয়ান-ই-হামাসা', 'দিওয়ান-ই-আবু তাম্মাম' এবং 'কিতাবুল আগানীর' নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা যায় যে, কিতাবুল আগানী (সঙ্গীত-গ্রন্থ) সংকলনগ্রন্থে আইয়্যামে জাহেলিয়া থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধের উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতা, আত্মজীবনী ও তৎকালীন আরবের সমাজচিত্র স্থান লাভ করেছে। এই গ্রন্থের সংকলক ও সম্পাদক আবুল ফারাজ' আলী ৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে গ্রন্থের কাজ সমাপ্ত করে তৎকালীন বাগদাদের সম্রাট সাইফুদ-দৌলার নিকট উপস্থিত করলে সম্রাট আনন্দিত হয়ে লেখককে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন এই বলে যে, পাণ্ডিত্য, ধৈর্য এবং পরিশ্রমের তুলনায় এই উপহার ও সম্মান খুবই নগণ্য। ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালের মধ্যে এ বিরাট গ্রন্থের প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত হয় এবং বিশখণ্ডে সমাপ্ত এই 'কিতাবুল-আগানী' আরবী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

প্রাচীন আরবী কবিতা যে সুদীর্ঘ আকৃতির এ সম্পর্কে আগেও বলা হয়েছে। খণ্ডকবিতা কিংবা কোনও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর নামকরণ করে কবিতা চিহ্নিত করার প্রয়াস প্রাচীন আরবী কাব্যে অনুপস্থিত। কবিতাসমূহ মু'আল্লাকা, কাসিদা, গজল, দিওয়ান ইত্যাদি নামে পরিচিত। কবিতা পড়তে গিয়ে যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধি জন্মে সেইটেই লক্ষ্য করার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ইসলাম-পূর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জুয়াহের বিন আবু-সালমার কাসিদাধর্মী কবিতা মু'আল্লাকার বিষয়বস্তু আবস ও জুবিয়ান গোত্রদ্বয়ের মাঝখানের কলহ নিষ্পত্তি করে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান। কিন্তু কবি কাসিদা লেখার প্রাক্কালে বিশ বছর আগের তাঁর প্রেয়সীর ঘরের ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্মৃতি-চারণ করেছেন:

ওয়া দারু লাহা বির রাকমাতায়নে কা আন্নাহা
মারাজিয়ো ওয়ালমিন ফি নাওয়াশেরে মি সামী,

[যেমন উল্কীর চিহ্ন সমুজ্জ্বল রমণীর হাতে,
তেমনি তোমার গৃহ সুবিস্তৃত বালির চত্বরে।]

কবির বর্ণনাকৌশল ও উপমাগ্রহণের রীতি সত্যি প্রশংসনীয়।

ইতিপূর্বে উল্লেখযোগ্য যেসব কবিদের নামোল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে উম্মাইদ যুগের ইয়াজিদ বিন মু'আবিয়া, আব্বাসীয় যুগের মাহবুবা, আল মুতানব্বী, আবুল আলা আল মা'আররী, আল বুসিরী প্রমুখ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে আরবী সাহিত্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো ভাস্বর।

'বিষাদ-সিন্ধু'-খ্যাত মীর মোশার্‌রফ হোসেন-চিত্রিত জঘন্য চরিত্রের নায়ক 'এজিদ'-ই উম্মাইদ যুগের সম্রাট-কবি ইয়াজিদ বিন মু'আবিয়া। মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াজিদই রাজ্যভার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসনকর্তা হিসাবে তিনি কতটা সফলতা অর্জন করেন তা আমাদের বিচার্য নয়— তাঁর কাব্যপাঠে মনে হয় তিনি একজন প্রতীভাদীপ্ত কবি। ইমরাউল কায়েসের মত মদ, মাংস ও নারীতে তাঁর আসক্তি ছিল তীব্রতর। এই কারণে তিনি প্রায়ই পিতা মু'আবিয়ার কঠোর সমালোচনার শিকার হতেন। কিন্তু ইয়াজিদ সেই সমালোচনার জবাব দিতেন কাব্যের কঠিন ভাষায়:

তোমার ক্রোধের শক্তি কিছু নয, কিছু নয়, জেনো
আমার নেশার কাছে; মদ তো করি না পান আমি—
মদের শক্তিকে পান করি,
যা দিয়ে নিভাতে পারি তোমার ক্রোধের অগ্নিশিখা।

একমাত্র শক্তিশালী ও বুদ্ধিদীপ্ত কবির পক্ষেই এমন শাণিত যুক্তির তরবারি পরিচালনা করা সম্ভব। তিনি যে কঠোর এবং নির্মম ছিলেন তাঁর কাব্যকর্মেও সে সবের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। যন্ত্রণার উপলব্ধিই জীবনের সার্থকতা ---এই বিশ্বাসই ইয়াজিদ বিন মু'আবিয়ার কাব্যে ঝংকৃত। তিনি তাঁর দিওয়ান'-এর এক জায়গায় তাঁর প্রেয়সীকে লক্ষ্য করে লিখেছেন:

বিরূপ কটাক্ষে যদি একবার সূর্যের নায়ক
তাকায় আমার এই প্রেয়সীর মুখের দর্পণে;
তাহলে সে-সূর্য আর সাহসী ইচছায় কোনোদিন
ভোরের জানালা খুলে দেখবেনা পৃথিবীর মুখ।

বলেছি প্রিয়াকে আমি: 'চলো আজ প্রেমের সাগরে
দু'জনে নিশ্চিহ্ন হই।' সে তখন বাঁকানো গ্রীবায়
তাচ্ছিল্যের ঝাঁঝ দিলো: 'প্রেমের পতঙ্গ কেন হও?

যে আমার প্রেমে অন্ধ সে কেবল পুড়েছে নীরবে,
কেননা আমার প্রেম বিষের যন্ত্রণা ছাড়া নয়।'

নিরস্ত হইনি তবু। আবার প্রেমের অভীপ্সায়
নিশ্চুপে গিয়েছি পাশে। সে কেবল জানতে চেয়েছে
কী আমার অভিলাষ, কোন্ পথ বেছে নেবো আমি?

তখন বলেছি তাকে: 'আমিতো জীবিত নেই আর।
তোমার নরম হাত একবার রাখো এই বুকে।'

আব্বাসীয় যুগের মহিলা কবিদের মধ্যে মাহবুবার নাম সর্বজনবিদিত। বাগদাদের খলিফা জাফরের সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, জাফরকে হত্যা করা হলে মাহবুবার জীবনে যন্ত্রণার পাথরচাপা পড়ে এবং

এই যন্ত্রণাই তাঁর কাব্যের ফলশ্রুতি। তিনি শুধু কবি ছিলেন না ; তিনি একজন সুগায়িকাও ছিলেন। জাফরের প্রতি যে তিনি কতটা অনুরক্ত ছিলেন তা তাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট :

রূপসী মেয়েটা তার গালের নরমে
মেশ্‌কের সুগন্ধী অক্ষরে
লিখেছে একটি প্রিয় নাম :
'প্রাণাধিক জাফর আমার।'

মেশ্‌কের সুঘ্রাণে ভরা মায়াবী নামের বিনিময়ে
আমার নগণ্য প্রাণ দিতে পারি মুহূর্তে বিলিয়ে।

কয়টা অক্ষরে শুধু গালে তার নামের স্বাক্ষর,
অথচ সুঘ্রাণে মনে হয়
সমস্ত প্রাণের রঙে আমার হৃদয়ে একাকিনী
লিখেছে নির্বিঘ্নে এক অম্লান প্রেমের ইতিহাস।

চেয়ে দ্যাখো, সমর্পিতা মেয়ের শরীর,
প্রকাশ্যে অথবা সঙ্গোপনে
সে ভাবে জাফর ছাড়া নেইকো দোসর আর কেউ
কেবল আল্লাহ জানে তার সেই মনের খবর।

চেয়ে দ্যাখো, রূপসীর চোখের প্রদীপ,
জাফরের চোখের আলোকে
মনে হয় সে প্রদীপ জ্বলে নিরবধি।

আব্বাসীয় যুগের অপর দুইজন প্রতিভাধর ও শক্তিশালী কবি—আল-মুতানাব্বী ও আবুল আলা আল মা'আরবী।

আল-মুতানাব্বী ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবু তায়্যিব আহমদ বিন হোসাইন আল-মুতানাব্বী। তাঁর কাব্যে সুফীবাদের স্পর্শ উজ্জীবিত এ জন্যে তাঁকে আল মুতানাব্বী বা 'ভবিষ্যৎ-নবী' আখ্যায় ভূষিত করা হয় এবং পরবর্তীকালে তিনি এই নামেই পরিচিতি লাভ করেন

৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাগদাদে চলে আসেন এবং আবুল ফারাজ' আলী সংকলিত কিতাবুল আগানী'র পৃষ্ঠপোষক সম্রাট সাইফুদ-দৌলার অনুরাগ-ভাজন হন। আল মুতানাব্বী সম্রাটের প্রশংসা কীর্তন করে কাসিদাও রচনা করেন।

কবির ছিল ভ্রমণের নেশা। আরব মুল্লুকের বিভিন্ন রাজদরবারে তিনি যথেষ্ট সমাদরলাভ করেন। ৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বেবিলনের পথে ভ্রমণের কালে একদল ডাকাতের হাতে তিনি নিহত হন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বৈচিত্র্যময়তার পক্ষপাতী এবং এজন্যে তাঁর কাব্যাদর্শেও বৈচিত্র্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট। আল-মুতানাব্বীর কাব্যে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা এই যে, কাব্যের আঙ্গিক নির্মাণ এবং প্রকাশ-কৌশলে তাঁর জুড়ি তৎকালে ছিল না। 'ইয়াতিমাতুদ-দাহর' গ্রন্থের লেখক এবং প্রখ্যাত কাব্যসমালোচক আত্-থা'লিবী আল-মুতানাব্বীর কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, 'মুক্তো এবং ইট, উভয়ের যথার্থ ব্যবহার তিনি করতে জানেন।'

একদিকে যেমন তিনি সুফী-দর্শন তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন অপরদিকে তেমনি বেদুইন নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অশ্লীলতার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। অশ্লীলতা (নাসিব) বর্ণনায় তিনি যে দক্ষ ছিলেন (Skill in handling the customary erotic prelude') তা তাঁর 'দিওয়ানে'র নিগ্রো ও বেদুইন রমণীদের রূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃতি-লালিত মানবজীবন যে প্রকৃতির সঙ্গে কতটা একাত্ম এই উপলব্ধি আল মুতানাব্বীর কবিতায় স্পষ্ট। তাঁর 'দিওয়ান' থেকে অনূদিত নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশে তাঁর জীবন-দর্শনের পরিচয় বিধৃত :

আমার গানের সুর অন্ধের দু'চোখ খুলে দেয়,
এবং বধির সে-ও নিজের দু'কানে তুলে নেয়।

অজস্র শ্রোতারা সব রাত্রির পাখীর মতো উড়ে
সুরের মাধুর্যে হয় কল্পলোকে উধাও, সুদূরে---
তখন নিশ্চুপ আমি সারারাত শয্যার আরামে।

৩—

আমার সম্মান দিও, যদি আমি তোমাদের নামে
স্তুতির কবিতা লিখি, এমনকি তোষামোদকারী
যে কবিতা গান নিয়ে নিত্য ফেরে তোমাদের বাড়ী।

আমিতো গানের পাখী। আমার এ গানের সিম্ফনী
আর সব কথা ঢেকে কেবলি শুনায় প্রতিধ্বনি--
প্রতিটি শব্দের মানে পৃথিবীর অম্লান খাতায়
লেখক-সময় সব লিখে রাখে আপন ইচ্ছায়।

খ্যাতির বন্দর থেকে সব নৌকো দেয় পাল তুলে
কেননা আমার গান সেইখানে পূর্ব-অধিকৃত,
সুমিষ্ট ঝংকার শুনে যে গলা উঠেনি কভু দুলে
আমার গানের সুর তার কাছে আনন্দ-অমৃত।

বিদায় নিয়েছে তারা রেখে গেছে প্রতীক্ষার রাত---
বাসর রাতের মতো এই রাত মধুময় নয়।
আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছে এক চাঁদের ঠিকানা
অকূল আকাশ পাবে; সে চাঁদ পাবো না কোনোদিন।

অথচ যে চাঁদ আমি পাবো বলে নিশ্চিত জেনেছি,
সেই যাত্রাপথে তারা বাধার প্রাচীর তুলে গেছে,
দু:খের হারেমে আজ একাকী আবদ্ধ হয়ে আছি---
যেখানে প্রেমিকা নেই। তাদের যাবার পর থেকে।

বাগান নিয়ত শোনে অতিথি-হাওয়ার কাছ থেকে
তাদের গুঞ্জন ধ্বনি; আমিও বৃক্ষের মত একা
দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করি স্থিরচিত্তে প্রেমিকা আসার।

হাতের পিয়ালা রেখে শ্বাসরুদ্ধ হয়েছি কখনো
কেননা বিহ্বল আমি গতিহীন পাথরের মতো।

তারার কাফেলা দূরে অন্ধকারে কোথায় চলেছে?
আমাকে নেয় না কোন আলোকিত দিনের প্রহরে?

রাত্রি কি দেখে না কভু তোমার চোখের দীপ্ত মণি—
এ যাত্রা পথের সীমা একান্ত উজ্জ্বল করে দিতে?

জানিনা কখন আমি পৌঁছে গেছি শেষের এ-ঘরে,
এখানে পেয়েছি যেন আকাঙ্ক্ষিত ভোরের আস্বাদ।

এখন রাত্রির শেষ, আমার সম্মুখে দীপ্ত দিন
অথচ তা ভেজা যেন জন্মের সৌরভ সঙ্গে নিয়ে,
পর্বতের সব দ্বার খুলে গেলো, সজীব রাস্তায়
সূর্যের অবাধ গতি তোমার আলোকদূত যেন।

আবুল আলা আল-মা'আররীর পুরো নাম আবুল আলা আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সুলায়মান আল-মা' আররী। সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের নিকটস্থ গ্রাম আল্‌মার্‌রাতুন নু'মানে তিনি ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর নাম সংক্ষিপ্ত করা হয় 'আবুল-আলা আল-মা'আররী ব'লে। দেড় বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং চার বছর বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়। কষ্টের চড়াই-উৎরাই ভেঙেই তাঁর জীবনের যাত্রা শুরু এবং কষ্টের আগুনে পুড়েই তিনি শেষ পর্যন্ত খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হতে সমর্থ হন।

তিনি শুধু কবি নন, একজন ধীসম্পন্ন দার্শনিক এবং মুক্তচিন্তার নায়ক। ১০০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বাগদাদে চলে আসেন এবং সেখানকার বিভিন্ন মসজিদ এবং শিক্ষায়তনে তাঁর দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রচার করতে শুরু করেন। ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। আগেই বলেছি যে, তিনি ছিলেন স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার অধিনায়ক। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে তাঁর আস্থা ছিল কিন্তু পবিত্র কুরআনকে তিনি আল্লাহ্‌র বাণী বলে স্বীকার করতেন না। মৃত্যু, মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থান, এসব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: 'এসব মানববোধের অগম্য।' ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রামের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই বছরই তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটে। জীবন সম্পর্কে তখন তাঁর এক নৈরাশ্যজনক উপলব্ধি ঘটে। তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবকে অনুরোধ করেন তাঁর কবরে এই দুটো লাইন লেখায়িত করতে:

আমার বাবার পাপ আমার জন্মের ইতিহাসে,
সে পাপ দিই নি আমি অন্য কারো জীবন প্রবাহে'।

এককথায় তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় নৈরাশ্যবাদী বা পেসিমিষ্ট। তাঁর জীবনবোধ ও জীবনদর্শন তাঁর নিজস্ব জগতের সম্পদ হলেও আমাদেরকে ভাবনা-তাড়িত করে রেখেছে। তাঁর কবিতার চারটি লাইনের দর্শনতত্ত্ব তাঁর বিশ্বাসেরই ধারালো নিদর্শন :

ইহুদি, খৃষ্টান কিম্বা মুসলিম আর ম্যাজিয়ান
সবাই চলেছে এক ভুল পথ ধরে।

সমগ্র মানবজাতি ভাগ হয়ে আবার একত্র হয় গিয়ে
বুদ্ধির জগতে
যে জগতে আস্থা নেই কোনো।

সমগ্র মানবজাতি ভাগ হয়ে আবার একত্র হয় গিয়ে
মূর্খের জগতে
সে জগতে সবাই বিশ্বাসী।

তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার অগ্নিফসল তাঁর কাব্য-মাঠের সর্বত্র বিরাজিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে 'সাখ্‌ত উল জান্দ' (অগ্নিকাঠির স্ফুলিঙ্গ), 'লুজুম মা লাম ইয়ালজাম', 'রিসালাত-উল গোফরান' এবং 'আল ফস্থুল ওয়াল গায়্যাত' প্রধান। এখানে 'সাখ্‌ত আল জান্দ' থেকে কিছু অংশের অনুবাদ পেশ করছি :

কান্নার বিচিত্র সুর
কিংবা পাখীর সুমিষ্ট গান
আমার স্থির সিদ্ধান্তের পাথর
একটুও নাড়াতে পারে না।

আজরাইলের উদাত্ত আহ্বান
এবং আনন্দ ঘোষণাকারীর কণ্ঠস্বর,
দুটোতে আসলে কোন তফাৎ নেই।

বৃক্ষের উচ্চ ডালে
যদি একটা পারাবত একটানা গান গায়
অথবা কান্নার সুর তোলে
আমার কাছে একক শব্দের মতোই মনে হয়।

হে বন্ধু, এখানকার সব কবরই ফাঁকা,
সেখানে অজস্র লোকের স্থান দিতে
কোনোই কার্পণ্য নেই।

হে বন্ধু, এখানে খুব সাবধানে পা ফেলবে
কেননা, এই পুরনো পৃথিবী
বহু মানুষের অস্থির সমন্বয়ে একাত্ম হয়ে আছে।

এখানকার আরও অনেক কবর
বংশানুক্রমিক মৃতদেহে ভর্তি,

এমনকি নতুন শবদেহের আকাঙ্ক্ষায়
অবারিত দ্বারে হাসছে।

১০৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে আবুল আলা আল্-মা'আররী মৃত্যুবরণ করেন। 'If not amongst the greatest Mohammadan poets, he is undoubtedly one of the most original and attractive. After Mutanabbi, even after Abul 'Atahiyah he must appear strangely modern to European readers.[২]

ইসলামের আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্য-স্বাজাত্যবোধ ব্যাখ্যা করে বহু কবি কাব্য রচনা করেছেন। এসবের মধ্যে আল-বুসিরীর 'কাসিদাতুল বোরদা' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 'কাসিদাতুল বোরদা' মূলতঃ না'ত-ই-রাসূল এবং এই না'ত রচনার ইতিহাস বড় চমৎকার। আর. এ. নিকলসন বর্ণিত নিম্নোক্ত মন্তব্যে এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে: 'আল-বুসিরীর 'কাসিদাতুল বোরদা'

২. R. A. Nicholson : *A Literary History of the Arabs*, (Cambridge University Press, 1930), P. 324.

রাসূলে করীম (দঃ)-এর উপর রচিত প্রশংসাগীতি। এর, রচয়িতা ১২১২ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। কবির জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে কবির মন্তব্যসাপেক্ষে তিনি যে পাণ্ডুলিপির অনুলিপি করে জীবিকানির্বাহ করতেন এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। আল-বুসিরী প্রখ্যাত সুফীসাধক আবুল আব্বাস আহমদ আল মারসীর শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে যে, পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রাক্কালে তিনি এই 'বোরদা' রচনা করেন। রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর শরীরের একাংশ বিকল হয়ে পড়ে। বোরদা রচনা শেষ করে তিনি আবৃত্তি শুরু করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন রোগমুক্তির জন্য। এভাবে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলে করীম (দ) তাঁর শরীরের বিকল অংশে হাত বুলিয়ে তাঁর নিজের 'বোরদা' (আলখেল্লা মতান্তরে চাদর) তাঁকে (বুসিরীকে) দিয়ে দিলেন। বুসিরী ঘুম থেকে জেগে দেখেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন।

'কাসিদাতুল বোরদার' প্রতি প্রত্যেকটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান শ্রদ্ধাশীল। অনেকে এই কাসিদা মুখস্থও করেন। এর অন্তরালে রয়েছে অলৌকিক শক্তি (magical power), এ কারণে এটা অশুভ শক্তি তাড়ানোর পক্ষে মন্ত্রস্বরূপ বলে অনেকেরই ধারণা। বোরদার কাব্য-সুষমাও সহজ, সরল এবং সাবলীল।" ৩

আইয়্যামে জাহেলিয়া থেকে শুরু করে রেনেসাঁ-পূর্ব যুগ পর্যন্ত আরবী কবিতার ছন্দ, আন্তঃমিল ও আঙ্গিক গঠন যে গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে এ সম্পর্কে আগেও সামান্য ইংগীত দেয়া হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ্‌ ও ব্যাকরণবিদ খলীল ইবনে আহমদ ছন্দঃপ্রকরণের উপর 'আল আরোদ' নামে যে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন তাতে আরবী ছন্দের প্রকারভেদ জানা যায়। বসরায় জন্মগ্রহণকারী এই পণ্ডিত ৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

খলীল ইবনে আহমদ ছাড়াও বসরার আবু আমর ইবনে আল আ'লা (মৃত্যু ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ), আল আসমা'ঈ, আবু ওবায়দা, 'আল কামিল' গ্রন্থ

৩. R. A. Nicholson : *A Literary History of the Arabs.* (Cambridge University Press, 1930), P. 326-327.

প্রণেতা আল-মুবার্‌রাদ, ইবনে দু'রাইদ (মৃত্যু ৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ), কুফার আল-মুফাদ্দাল আদ্‌দাববী, ইবনুস্‌ সিক্কীত, আত্‌-থা'লাবী (মৃত্যু ৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখ ভাষাবিদ্‌ ও ব্যাকবণবিদ্‌ আরবী ছন্দেব উপব গবেষণা-সমৃদ্ধ কাজ করেছেন। কিন্তু খলীল ইবনে আহমদ রচিত 'আল-আরোদ'ই অধিকতর নির্ভবযোগ্য এবং সর্বজনস্বীকৃত।

বেনেসাঁ-পূর্ব যুগ পর্যন্ত আরবী কবিতায় 'আল-আবোদ'-এব রীতিই অবলম্বন করতে দেখা যায়। আমবা এখানে খলীল ইবনে আহমদ বর্ণিত 'আল-আরোদ'-এর ছন্দ-বৈচিত্র্য সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করবার চেষ্টা করছি।

সমস্ত ক্লাসিকধর্মী আববী কবিতাই ষোল শ্রেণীর ছন্দেব (সাজ) আওতাভুক্ত। যেমন তাবিল, মাদিদ, বাসিত, কামিল, ওয়াফির, হাজাজ, রাজাজ, রামাল সারী', মুনসারিহ্‌, খাফিফ, মুদ' আরী, মুকতাদাব, মুজ্‌তাস, মুতাদা'রিস এবং মুতাকারিব।

মাত্রা, স্বর বা ধ্বনিব আইনসম্বলিত শেষের মিলসংযুক্ত একটি লাইনকে বলা হয় 'মিসরা' বা পদ এবং দুটো 'মিসরা' মিলে হয় যুগ্মপদ বা কবিতা (verse)। যুগ্মপদ হলেই তার উপর ছন্দের বিচাব সম্ভব হয়।

মিসরা-এব পর্ব ভাগেব মধ্যে হ্রস্ব মাত্রা ও দীর্ঘ মাত্রা উভয়ই থাকে এবং ছন্দের নামকরণভেদে মাত্রা ও পর্ব উভয়ই কম-বেশী হতে পারে। নজরুল ইসলামের কিছুসংখ্যক বাংলা কবিতা ছাড়া আরবী ছন্দের ব্যবহার বাংলা কবিতায় অনুপস্থিত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্যি কিছুসংখ্যক মসনবীর অনুবাদে আরবী ছন্দের রীতি রক্ষা করেছেন। বাংলার মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ইত্যাদির কিছু কিছু সন্ধান আরবী কবিতায় পাওয়া গেলেও অক্ষরবৃত্তের রীতি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বক্রলাইন (⁀)-কে হ্রস্ব মাত্রা, সরল লাইন (---)-কে দীর্ঘমাত্রা এবং খাড়া লাইন (।)-কে পর্বভাগ ধরে ষোলটি আরবী ছন্দের রীতি নিম্নরূপ:

১. তাবিল : —VV।V—VV।—VV।V—VV

২. মাদিদ : —VVV।—VV।—VVV

৩. বাসিত : VVVVI—VVIVVVVI—VV

৪. কামিল : VV—VVIVV—VVIVV—VV

৫. ওয়াফির : V—V—VIV—V—VIV—V

৬. হাজাজ : V—V V—V—V—V

৭. রাজাজ : VVVV,VVVV,VVVV

৮. রামাল : —V—VI—V—VI—VV

৯. সারী': VVVVIVVVVI—VV

১০. মুনসারিহ্ : VVVVI—V—VIVVVV

১১. খাফিফ : —V—VIVVVVI—V—V

১২. মুদ'আরী : V—VI—V—V

১৩. মুকতাদাব : —V—VIVVVV

১৪. মুজতাস : VVVV'—V—V

১৫. মুতাদা'রিক : VVI—VVI—VA'—VV

১৬. মুতাকারিব : V—VIV—V V—V V—V

আইয়্যামে জাহেলিয়ার আরবী কবিতায় তাবিল (দীর্ঘ), বাসিত (বিস্তৃত), কামিল (পূর্ণাঙ্গ), ওয়াফির (প্রশস্ত), খাফিফ (হালকা) প্রভৃতি ছন্দঃপ্রকরণ রীতি লক্ষ্যযোগ্য। গজল ও গানে সাধারণতঃ মুদ'আরী, মুকতাদাব, মুজতাস প্রভৃতি ছন্দরীতি মেনে চলা হয়।

ছন্দপ্রকরণ অনুসারে আন্তঃমিল পদ্ধতিও বিভিন্ন রকম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাসিদায় কমপক্ষে পঁচিশটি যুগ্ম 'মিসরা' বা পঞ্চাশটি লাইন থাকে। এই লাইনকেও আবার ভিন্ন ভিন্ন 'কিতআ' বা স্তবকে ভাগ করা হয়। স্তবকেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন, ৫ লাইনের স্তবককে আরবীতে বলা হয় মুখাম্মাস, ৬ লাইনের স্তবককে মুসাদ্দাস, ৮ লাইনের স্তবককে মুসাম্মান এবং ১২ লাইনের স্তবককে বলা হয় তারিফ কিংবা তারকিব।

'কিতআ' বা স্তবক অনুসারে ছন্দ বা আন্তঃমিল পদ্ধতি নিম্নরূপ :

৫ লাইনের কিত্আ :

—ক
—ক
—ক
—ক
—ক

—খ
—খ
—খ
—খ
—ক

—গ
—গ
—গ
—গ

—ক

উপরে বর্ণিত ৫ লাইনেব 'মুখাম্মাস.'-এ তিন রকমের আন্তঃমিল পদ্ধতি লক্ষ্য কবা যায়। অনুরূপ ৬ লাইনের 'মুসাদ্দাস' ছন্দরীতিতে বিভিন্ন ধবনের আন্তঃমিল দৃষ্টিগোচর হয়।

৬ লাইনেব কিত্আ

—ক
—ক
—ক
—ক
—ক
—ক

—খ
—খ
—খ
—খ
—ক
—ক

—গ

—গ

—গ

—গ

—ক

—ক

৮ লাইন, ১০ লাইন এবং ১২ লাইন সম্বলিত স্তবকে উপরে বর্ণিত ৫ ও ৬ লাইন সম্বলিত স্তবকের আন্তঃমিল বা ছন্দের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন,

৮ লাইনের কিত্আ :

—ক

—ক

—খ

—ক

—গ

—ক

—ঘ

—ঘ

১০ লাইনের কিত্আ :

—ক

—ক

—খ

—ক

—গ
—ক
—ঘ
—ক
—ঙ
—ঙ

১২ লাইনের কিত্আ :

—ক
—ক
—খ
—ক
—গ
—ক
—ঘ
—ক
—ঙ
—ক
—চ
—চ

ক্লাসিকধর্মী আরবী কবিতায় উপরোক্ত ছন্দ:প্রকরণ এবং আন্ত:মিল পদ্ধতি পুরোপুরি লক্ষ্য করা যায়। আন্ত:মিলের ক্ষেত্রে অবশ্যি কখনো কখনো ব্যতিক্রমও নজরে পড়ে। তবে তা খুবই সামান্য। আন্দালুসীয় এবং স্প্যানীয গজল ও গানে হ্রস্বমাত্রার এক ধরনের ছন্দরীতি লক্ষ্য করা যায় এবং তা 'জাজাল' নামে খ্যাত। গজল ও গানে সুর প্রয়োগের কাঠিন্য থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই এই 'জাজাল'-এর প্রচলন আবিষ্কৃত হয়েছে। আরবী লোকসাহিত্যের ছড়া এবং লোক-গীতিতেও 'জাজাল'-ছন্দ ব্যবহার করা হয়।

॥ দুই ॥

রেনেসাঁ যুগই আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত। ফরাসী বিপ্লবকে এই যুগের সূচনাকাল বলা চলে। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নেপোলিয়নের মিশর ও নিকটপ্রাচ্য আক্রমণের ফলশ্রুতি সমগ্র আরবজগতে এক চেতনাসঞ্চারী ক্রিয়া করে। তা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী শক্তি মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিদায় নেয়ার পর পশ্চিমী দেশসমূহের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের এক সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন পশ্চিমী প্রভাবের তেজোদীপ্ত আলোক মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাণবন্যা বইয়ে দেয়। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাসম্বলিত নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে মিশরীয় পণ্ডিত হাসান আল আরবাব (মৃত্যু : ১৮৩৪)-এর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'দারউল-উলুম'-এর নাম করা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ এখানে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতেন। লেবাননের প্রখ্যাত পণ্ডিত বুতরুস আল-বুসতানী (১৮৮১—১৮৮৩) প্রতিষ্ঠিত আরবী সাময়িক পত্রিকা 'আল জিনান'-এর ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

সাংস্কৃতিক বিনিময়ও আরবী সাহিত্যে ফলপ্রসূ ক্রিয়া সাধিত করার পক্ষে পরম সহায়ক হয়। মিশরের খেদিব মোহাম্মদ আলী সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি রীফা-আ-আল-তাহ্‌তাবী (১৮০০-১৮৭৩)-এর নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক দল ইউরোপে প্রেরণ করেন। পরবর্তী সময়ে এই পণ্ডিত ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন রচনা আরবীতে অনুবাদ করে মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করেন। খেদিব মোহাম্মদ আলী ভেষজ, কারিগরী ইত্যাদি শিক্ষাসংক্রান্ত অসংখ্য স্কুল-কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬৯ সালে সুয়েজখালের উন্মুক্তিকরণও মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক যোগাযোগে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই খাল উন্মুক্তের ফলে পশ্চিমী-দেশের সঙ্গে মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের সব অঞ্চলেই যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম

হয় এবং পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাববিস্তার করে তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তারলাভ করে।

সর্বোপরি গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরই মিশর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পীঠস্থানে উন্নীত হয়। মুসলমানদের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ও রেনেসাঁ-আন্দোলনের অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই আন্দোলনে আহমদ লুতফী আল-সায়্যীদ সম্পাদিত 'আল জারিদা' (গেজেট) এবং মাহমুদ হাসান হায়কল সম্পাদিত 'আল সিয়াসা' (রাজনীতি) নামক মিশরের পত্রিকা দুইটির ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা'ছাড়া ইরাক থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আল জাবরা' এবং তারও দুই দশক আগে রাজ্জাক গান্নাম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'আলইরাক' পত্রিকাদ্বয়ের ভূমিকাও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

আরবী কবিতায় আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই শুরু হয়। কবিতার আঙ্গিক গঠন, বর্ণনা-কৌশল, রূপকল্প, উপমা নির্বাচন সব কিছুতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আরোপিত হতে শুরু করলো। প্রাচীনপন্থী কাসিদা, গজল ও গানের স্থানে রূপলাভ করলো সনেট, ট্রিওলেট, ভিলানেল এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের খণ্ডকবিতা। এই প্রচেষ্টায় যাঁরা সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে মিশরের মাহমুদ সামী আল-বারোদী (১৮৩৯-১৯০৪), আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২), হাফিজ ইব্রাহিম (১৮৭১-১৯৩২), ইসমাঈল সাবরী (১৮৮৪-১৯২৩), খলীল মাতরান (১৮৭২-১৯৪৯), আবদুল মোহসীন কাজেমী (১৮৭০-১৯৩৫), আহমদ জাকী আবু শা'দী (১৮৯২-১৯৫৫), সিরিয়ার নাসিফ আল্-ইয়াজেজী (১৮০০-১৮৭১), ফ্রান্সিস মার্‌রাস (১৮৩৬-১৮৭৩), ইরাকের আল ফারুকী (১৭৮১-১৮৬১), আল-আখরাস (১৮০৫-১৮৭৩), ইবরাহীম আল-তাবা-তাবাঈ (১৮৩২-১৯০১), মারুফ আর-রুসাফী (১৮৭৩-১৯৪৫), জামিল সিদ্‌কী আল জাহাবী (১৮৬৩-১৯৩৬), নাজিব আল-হাদ্দাদ (১৮৬৬-১৮৯৯), লেবাননের জীবরান খলীল জীবরান (১৮৮৩-১৯৩১); আমিন আল রায়হানী (১৮৭৬-১৯৪০), তানিয়ুস আবদুহ্ (১৮৭৫—১৯২৬), হালিম দামুস (জন্ম: ১৮৮৮) প্রমুখের নাম সবিশেষ

উল্লেখযোগ্য। এঁদের কাব্য-কর্মের মূল পটভূমি স্বাধীনতা, স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশ-প্রেম, সামাজিক ও রাজনৈতিক যন্ত্রণা, নিসর্গপ্রীতি ইত্যাদি। তা'ছাড়া কাব্যের আঙ্গিক, ছন্দ, বর্ণনাভঙ্গী, চিত্রকল্প এবং উপমানির্বাচনেও কবিরা সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ উপরে বর্ণিত কবিদের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাব্যধারার সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

ইরাকের মা'রুফ আর-রুসাফীর কাব্য-প্রেরণার মূল উৎস নিসর্গপ্রীতি। প্রকৃতিকে তিনি জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন এবং শিল্প, প্রকৃতি এবং জীবন এই তিন বস্তুর একত্র সমাবেশ তাঁর কাব্য-কর্মে একীভূত। 'আল আ'লাম ওয়া শের' (পৃথিবী ও কবিতা) তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ:

প্রকৃতি করেছি পাঠ, জেনেছি অনেক তত্ত্বকথা,
সর্বত্র দেখেছি এক অপরূপ মিলের দক্ষতা।

মায়াময় ছন্দ ভরা পৃথিবীর সুদূর সীমানা,
যেমন সাজানো হয় বিচিত্র কবিতা একটানা।

সময়ের আবর্তন ঠিক যেন কবিতার মতো,
কালের পাতায় দেখি লাস্যময়, ছন্দ অবিরত।

মিলের মায়ায় বাঁধা অপরূপ মানবজীবন---
মধ্যখানে সুখ দুঃখ---অতঃপর কবরে শয়ন।

বাঁচার মুহূর্তগুলো আনে এক মিল অবদান---
মৃত্যুর কঠিন হাত ভেঙ্গে করে গদ্যের সমান।

সুদীর্ঘ সময় বেঁচে কেউ দেয় কবিতার মিল---
অসময়ে মৃত্যু যেন ছন্দহীন কাব্যের সামিল।

সে এক খুশির বার্তা জীবনের দীর্ঘ অন্বেষায়---
ক্ষণিক জীবনে শুধু বেদনার সুর মুরছায়।

জীবনযন্ত্রণা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেও মা'রুফ আর-রুসাফী কম সোচ্চার নন। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে কবির আহ্বান সার্বজনীন সাড়ায় মুখর। এ আহ্বান কেবল দুঃখ-যন্ত্রণা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে নয়, এ আহ্বান শোষকদের হাত থেকে মুক্তি পাবার আহ্বান। কোন আরববাসীই তাদের ঐতিহ্য, পূর্বগৌরব এবং জাতীয়তাবোধ বিস্মৃত হতে পারে না। কবির আহ্বান:

ঘুমন্ত নগরবাসী! আলাময়ী রাত্রির বিলাপ
কুয়াশার জলে ধুয়ে চেয়ে দ্যাখো সম্মুখে কেমন
সুন্দর সোনালী ভোর। শ্রম সে তো নয় অভিশাপ?

ঘামের সমুদ্রতটে সেই শ্রম মুক্তোর মতোন
আমার জীবন নিয়ে আমার সন্তান-সন্ততির
চোখের আশ্রয়ে ফোটে। তা না হলে, আমরা তবে কি
দুইটি ক্ষতের চিহ্নে রক্ত ও পুঁজের সমষ্টির
সমাহার? সত্য নয়। এই বাহু কি শক্তি ধরে নি?

যদিও আমরা বন্দী, আমাদের সক্রুদ্ধ গর্জন
ঝড়ের তাণ্ডব আর সমুদ্রের ক্ষুব্ধ কানাকানি;
কে তাকে করবে বন্দী? আমাদের দু'চোখে ক্রন্দন
কোনো কালে ছিলো বলে জানা নেই। একমাত্র জানি
শ্রমের স্বাক্ষর আঁকা আমাদের কঠিন ললাটে;
আর জানি তীক্ষ্ণ হীরা কি কৌশলে তীক্ষ্ণ হীরা কাটে।

মা'রুফ-আর-রুসাফীর সমগ্র কাব্য-কর্ম দুই খণ্ডে সমাপ্ত 'দীওয়ান আর-রুসাফী' নামে খ্যাত। প্রবন্ধ-সাহিত্যেও তাঁর অবদান অসামান্য। সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'মুহাদারাত উল্-আদিবিল আরাবিয়্যা' পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষরে ভাস্বর।

মা'রুফ আর-রুসাফী কেবল কবিই নন, তিনি একজন শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও রাজনীতিবিদও ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি কন্সটান্টিনোপলে

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তদুপরি, তুরস্কের ওসমানিয়া শাসন আমলে জাতীয় সংসদ-সদস্যও ছিলেন এবং ১৯২১ সালে ইরাক স্বাধীন হওয়ার পর তাঁকে শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

সিবিযাব নাসিফ আল-ইয়াজেজীই ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রথম কবি যিনি ক্লাসিকধর্মী আরবী কবিতার পরিবর্তনসাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নতুন ছন্দের আরবী কবিতার প্রচলন করেন। প্রেম ও নিসর্গই তাঁব কাব্যেব উপজীব্য। নিম্নোদ্ধৃত তাঁর 'মুহব্বত' (ভালোবাসা) শীর্ষক কবিতার অনুবাদ প্রাচীনপন্থী কাসিদাধর্মী কবিতার পাশে এক যুগান্তকারী প্রচেষ্টাব স্বাক্ষব :

ভালোবাসা, সে এক সমুদ্র,
সে সমুদ্রে সাঁতারু বিলীন।
ভালোবাসা সে এক মরুভূ,
সেইখানে পথিক অদৃশ্য।

নাসিফ আল-ইযাজেজীব কবিতায় প্রতীকধর্মী উপমা ও দর্শনতত্ত্বের আভাস থাকলেও নৈরাশ্যবাদের লক্ষণ স্পষ্ট। কিন্তু প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁব যে দক্ষতা সেই দক্ষতাই তাঁর সমগ্র কাব্যপ্রচেষ্টাকে কালোত্তীর্ণ করে বেখেছে।

কবিতা যে শুধু আঙ্গিক গঠন, চিত্রকল্প ও বর্ণনা কৌশলে সীমাবদ্ধ নয তাব প্রমাণ বিধৃত লেবাননের জীবরান খলীল জীবরানের কবিতায়। জীবনবোধের সঙ্গে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় জীবরানের কবিতাকে এমন স্তরে উন্নীত করেছে যাব উপলব্ধিতে দার্শনিক মনোভাবেরই প্রয়োজন। দর্শনতত্ত্ব ছাড়াও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যময় দিক এই যে, কাব্যের আঙ্গিক নির্মাণ এবং ছন্দঃপ্রকরণে সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবধারার পক্ষপাতী তিনি। নিম্নোদ্ধৃত 'নাশিদুল বাহার' (সমুদ্রের গান)-এর হুবহু অনুবাদ তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ :

এবং সৈকত সেই সমুদ্রের নিছক প্রেমিক।
ঢেউয়ের ভালোবাসাগুলোই
তাদের প্রেমের আত্মিক যোগসূত্র।

সেইসব দেখে
উজ্জ্বল আলোর চাঁদ সমুদ্রকে কাছে টানে।

সেই চঞ্চল ঢেউগুলো
গড়াতে গড়াতে
সৈকতের কাছে আসে
প্রশস্ত বুকের গভীরে ঠাঁই নেবার জন্যে।

গতি কী প্রবল!
বিদায় বড়ই করুণ, নীরব
কান্নার বুদ্বুদে সম্পন্ন।

সেই চঞ্চলতা
সুনীল দিগন্ত থেকে শুরু,
আচমকা তটের বালিতে এসে পড়ে।
মনে হয় রূপোর চাকতি
অজস্র ফেনার ঐতিহ্যে বর্তমান,
সূর্যের আলোকে গলিত সোনার চাকচিক্য।

এখন সেই সমুদ্র—তটের তৃষ্ণার নিবৃত্তি
এবং আত্মার পুণ্যস্নান।
সমুদ্রের আস্ফালন সেইখানে নীরব
সকল অহঙ্কার চূর্ণ।

প্রত্যূষে তাকালে দেখতে পাই:
সমুদ্র তার প্রেমিকের কানে
ভালোবাসার শ্লোক পাঠ করে;
বাহুর উৎশীর্ণে নিবিড় আলিঙ্গন।

৪—

উন্মত্ত জোয়ারে সমুদ্রের গান শুনি।
দু'হাতে ছিটিয়ে দেওয়া জলের প্রেম
এবং তটের মুখে অসংখ্য চুমোর দাগ-
সমুদ্র চঞ্চল,
সমুদ্র ভয়ঙ্কর,
সৈকত প্রশস্ত,
সৈকত গম্ভীর,
জীবনই তার যৌবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

তার সেই প্রশান্ত বুকের গভীরে
সমুদ্রের সকল অহঙ্কার চূর্ণ।

স্রোতের আবর্তে ঢেউগুলোর
স্পর্শকাতর হাসি, ঠাট্টা---
এখন সেই সৈকত,
যখন কাছে টানে
আলগোছে সমুদ্রের প্রেম-নিবেদন।

কখনো সেই সমুদ্র
মৎস্য-কন্যার সাথে
বৃত্তাকারে নাচে।

জলের নরম হাত ধরে গহীন অতল থেকে
উপরে উঠে আসে,
এবং আকাশে উড়ে যাবার আগে
ঢেউয়ের মস্তকে আশ্রয় নেয়;
তাবার দেয়ালিতে তাদের প্রেমের উচ্ছ্বাস,
ক্ষুদ্রত্বের বিলাপ;
সমুদ্রই তাদের সান্ত্বনা।

কখনো সেই সমুদ্রের কাছে
পর্বতের জ্বালাতন;

আবার সোহাগের হাসি---
পর্বতের কোনো দুঃখ নেই।

সেই সমুদ্র তার প্রেমিককে
নিমজ্জিত অচেতন দেহ
উপহার দেয়,
তটের হাতেই সেই সব দেহের জীবন প্রাপ্তি---
কেননা জীবন নিয়েই তটের সমস্ত ভাবনা।

কখনো সেই সমুদ্র
ঢেউয়ের হাতে তার প্রেমিককে
মণি-মুক্তা, মূল্যবান প্রেমের চিহ্নগুলোকে
নিরাপদে পৌঁছে দেয়।

উজ্জ্বল আলোকে তটের কী হাসি।
ভালোবাসার সেই ঢেউগুলোকে
কাছে পাবার
সাদর সম্ভাষণ।

ঠিক গভীর রাত্রে
যখন সমস্ত পৃথিবী
ঘুমের কোলে শায়িতা---
করুণ কান্নার মতো
সমুদ্রের গান শুনি।

এই একটানা
ঘুমহীন কাতরতা
তাকে বেশ নির্জীব করে রেখেছে।

প্রেমিকার কাছে
ঘুম কিছুই নয়;
প্রেমের আকাঙ্ক্ষাই সবচেয়ে প্রবল।
কেননা প্রেম অমর।

জীবরান জন্মগত খৃষ্টান এবং আমৃত্যুও খৃষ্টান ছিলেন কিন্তু মুসলিম দর্শন ও মতবাদ তাঁর রচনাব প্রতিপাদ্য। আবি সীনা, ইবনে খলদুন, আবুল ফারাজ, আবু তায়্যেব আল মুতান.ব্বী প্রমুখ মুসলিম জগতের চিন্তা-নাযকদেব সম্পর্কে জীববানেব ধাবণা খুব স্পষ্ট। এসব কারণেই তিনি তাঁর দর্শন ও চিন্তায় নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি কবতে সমর্থ হয়েছেন এবং সেই জগৎ এখন জীববানিজম বা জীববানবাদ নামে পবিচিত। মধ্যপ্রাচ্যেব দর্শনে জীবরান অবিস্মবণীয়।

জীববান একাধাবে কবি দার্শনিক শিল্পী এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধকার। তাঁব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহেব মধ্যে (১) আল বাদাযে ওয়াত্ তাবাযেফ (আত্মাব বহস্য)। (২) রুম্মাল ওযা জাবেদ (বালি ও ফেনা)। (৩) আল মাজনুন (পাগল)। (৪) আন-নাবী (পয়গম্বব)। (৫) ইযাসুয্যু ইবনেল ইনসান (হাসি ও কান্না)। (৬) আরায়েসেল মুরুজ। (৭) আল মু'আকেব। (৮) আল আরোযাহ্ আল মুহাম্মরদ। (৯) আল আজনেহাতুল মুতাক্কাসেব প্রভৃতি প্রধান।

মিশবেব হাফিজ ইবরাহীমও খলীল জীববানের সমসাময়িক কবি। খলীল জীববান যেখানে দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যায তদ্গত হাফিজ ইবরাহীম সেখানে যুগ-যন্ত্রণা বর্ণনায মুখব। তাছাড়া প্রকৃতিও তাঁব চিত্রে এমন জীবন্ত যে মিশববাসীব কাছে তিনি 'শাযেব উল নীল' নামে খ্যাত। বাংলার কবি নজরুল ইসলামেব মত তিনি প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। পববর্তী সময়ে মিশবের পাবলিক লাইব্রেরীতে চাকবী নিয়ে একাগ্রচিত্তে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। কবি হিসেবে নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম শ্রেণীর, তদুপরি তিনি ভিক্টর হোগোব 'লজ এঞ্জেলস্' অনুবাদ করে যথেষ্ট কৃতিত্বেব পবিচয় দেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবহুল বিষয়বস্তু তাঁব কবিতার উপজীব্য। তৎকালীন জাতীয় নেতা আলী আবুল ফুতুহ্-এব মৃত্যুতে বচিত 'মরসিয়তো' থেকে কিছু অংশ এখানে পেশ করছি হাফিজ ইবরাহীমের কাব্যাদর্শের নমুনাস্বরূপ :

বেদনা অনেক বড়ো, বেদনার চেয়েও সাহস
বড়ো জেনো। যদি তুমি অস্বীকার করো—

অস্বীকারে নীতি থাকা চাই। - - -
অতীতের ফুটন্ত হে ফুল
ভবিষ্যতের সুগন্ধী হে ফুল
তোমাকে রেখেছি আজ আমাদের স্মৃতির আধারে। - - - -

মিশরের আহমদ জাকী আবু শা'দী বৈষয়িক জগতে যতটা না আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তার চেয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন চিন্তার জগতে। সে চিন্তায় প্রেম এবং প্রেমের আধার জীবনবোধও প্রচ্ছন্ন। আধুনিক আরবী কবিতার নবরূপায়ণের উদ্গাতা হিসেবে শা'দীর অবদানও সর্বজনস্বীকৃত।

পেশাগত জীবনে শা'দী ছিলেন ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক। কাব্যের জগতেও যে তিনি আলোড়ন সৃষ্টিকারী তার প্রমাণ বিধৃত সামগ্রিক কাব্য-কর্মে। জাতীয়তাবোধ ও ঐতিহ্য সৃষ্টিতে শা'দী কতটা সার্থক তা প্রশ্ন-সাপেক্ষ হলেও কাব্যবিবর্তন ধারায় যে তিনি অনলস প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন কাব্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে তা স্পষ্ট। তাঁর 'চিরন্তনী' কবিতায় চিরন্তন সত্যেরই মূর্ত প্রকাশ। খলীল জীবরানের মন্তব্যে যেখানে 'সত্যের কোন খাদ নেই'; শা'দীর বক্তব্যে 'নিশ্চিহ্ন হবে না জানি আমার জীবন'। জীবন যেখানে শাশ্বত সত্য; সে জীবনের বিলয় নেই:

কী করে পৃথক হবো তোমার সত্তার মূল থেকে?
যেমন ইথারে সব একাকার সম্পন্ন একাত্ম
তেমনি তুমি ও আমি মিশে আছি একক সৌকর্যে।

এবং বাতাসে
তোমার ও মুখ থেকে শ্বাসের যে সুঘ্রাণ মিশানো
প্রতিটি নিশ্বাসে আমি যখনি সে হাওয়া নিতে যাই
তোমার ঠোঁটের সেই চুম্বনের মদির আরাম
আমাকে উন্মনা করে প্রহরে প্রহরে।

আমার আত্মার পাখী আকাঙক্ষার বিমূর্ত প্রতীক
কেবল তোমাকে ছাড়া কেউ নয় অভীষ্ট আমার।

যন্ত্রণার ধূলির কবরে
যদিও নিমগ্ন আছি, অথচ মরিনি একেবারে।
তোমার মায়ার জালে যে পৃথিবী জড়ানো রয়েছে
নিশ্চিহ্ন হবে না জানি আমার জীবন সেইখানে।

মিশরের খলীল মাতরানও আরবী কবিতার বিবর্তনের মূলধারায় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ক্লাসিকধর্মী আরবী কবিতার প্রতি অনীহার ক্ষেত্র রচনায় নতুন আঙ্গিকের গীতিকবিতাই তার জীবন্ত ফসল। সামাজিক অবক্ষয়, জীবন-যন্ত্রণা কিংবা স্বাধীনতার উদ্যোগ তাঁর কাব্যে যতটা না তথ্য-নির্ভর তার চেয়ে প্রাণনাসাপেক্ষ অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনই বেশী আবেগময়। খলীল মাতরান আবেগধর্মী কবি তবে তাঁর কাব্য-পবিক্রমায় জীবন-চেতনা আবর্তিত নয়। চিন্তা-ভাবনাহীন স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-প্রবাহে তিনি গতিমান এবং গতির সারল্যে অতীতও সংযুক্ত। কবির ভাষায়:

কখনো মনে কী পড়ে আমাদের সেই ছেলেবেলা ?
যখন দু'জনে মিলে মাযাবী গ্রামের আশীর্বাদে
এবং আঙুর ক্ষেতে লতানো আঙুরে নির্বিবাদে
পরস্পর ছায়া ফেলে হাসিতে করেছি কত খেলা ?

আমাদের চঞ্চলতা সুপক্ব আঙুর কুড়াবার
ইচ্ছায় নিমগ্ন ছিল, হৃদয়ের সকল বৈভব
আঙুরের রসে ঢেলে গড়েছি যে মায়ার উৎসব,
আকণ্ঠ করেছি পান অশেষ আনন্দে বারবার।

দু'জন মানব এসে আ-দেখা মহান উৎসুকে
আমাদের হাসিগান তাদের বগলদাবা করে
নিয়ে গেছে বহু উচ্চে প্রোজ্জ্বল স্বর্গের পথ ধরে
যে পর্যন্ত না বসেছি বৃত্তাকারে তাদের সম্মুখে।

এখনো বহে কী সেই আমাদের শৈশবের নদী
দু'কূল প্লাবিত করে নিছক আনন্দে নিরবধি ?
দু'পাশের বৃক্ষরাজি পবিত্র জলের স্পর্শ পেয়ে
এখনো ওঠে কি দুলে সহসা মুখর গান গেয়ে ?

লেবাননের তানিয়ুস আবদুহ্ একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার এবং কবি। সাহিত্যের সব শাখার যেমন তাঁর বিচরণ অবাধ তেমনি তাঁর রচনাবলীর সংখ্যাও অনেক---প্রায় সাত শত। সামাজিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন রচনার বিষয়বস্তু এবং সে বিষয়বস্তু সমাজের উচ্চ ও নীচু পর্যায়ের মাঝখানের দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে কবি আহত, মর্মাহত। অথচ তা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও অনিশ্চিত। তথাপি কি কবি নিশ্চুপ থাকবেন? না। নিশ্চুপ থাকা কবিধর্ম নয়। সত্যকে সত্যের মতো করে বলার সাহস সৎ কবির পক্ষেই সম্ভব। কেননা ' oetry is an interpretation of life ; and the interpretation must, like the thing interpreted, be organic and in continual progress, taking from point to point from moment to moment.' ৪ এ সত্যের আস্থায় আস্থাবান তানিয়ুস আবদুহ্ প্রতীকের মাধ্যমে সমাজের বিশেষ দিককে খোঁচা দিয়ে বক্তব্য সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি রূপকধর্মী 'কেত্তুল আবিয়াজ' (সাদা বিড়াল) সংগ্রহ করেছেন তাঁর বক্তব্যকে বিশ্লেষণাত্মক করতে। তিনি বলেন:

আমার প্রভুর সেই সাদা বিড়ালটা।
পেঁজা তুলোর মতো তার গায়ের রঙ
তুলতুলে পশমগুলো
সুডৌল একটা গাছের কচি কিশলয়ের বিস্ময়।

লেজের মখমলে হাত বুলাতে গিয়ে
মনে হয় নরম মাখন স্পর্শ করছি।

অথচ রান্নার টগবগের সময় সে কালা
কিংবা খাবার সময় ছাড়া সে বোবা।

সে সিংহের মতো বিনম্র হতে জানে,
কখনো তাকে হরিণের চেয়েও প্রশান্ত হতে দেখেছি।

৪. I. W. Mockail : *Lecture on Poetry*, P. 309.

সবচেয়ে আশ্চর্য তার চঞ্চল ছুটোছুটি---
ঘরের নির্জন প্রহরে
যখন সে শিকারের ইচ্ছায় ইঁদুরের অন্বেষণ করে।

ব্যর্থতার করুণ মুহূর্তে
তার চোখের মণিতে কুয়াশার গ্লানি খেলা করে
এবং হৃদয়টাকে মনে হয়
প্রাসাদের ধ্বসে যাওয়া দেয়াল।

আমার প্রভুর মেহমানদের আশেপাশে
কী এক অহঙ্কারে সে টো টো করে ঘোরে,
তখন তাকে ছোট্ট শিশু ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

অথচ সেইসব মেহমান যেন তার কাছে অতি তুচ্ছ।
সে যা পছন্দ করে
তা হলো অপর্যাপ্ত আর সুস্বাদু খাবার।

আমার প্রভু ঘরে ফিরে খানসামাকে হুকুম দিতেই
সে এক লাফে তার কোলে উঠে বসে,
কোলের সিংহাসনে তাকে মনে হয় মহান সম্রাট।

আমার প্রভু সোহাগের চাদরে
বুকে জড়িয়ে নেন সেই সাদা বিড়ালটাকে,
মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে
বলতে থাকেন, 'ওগো কন্যে - - - -ওগো কন্যে- - - - -'

সাদা বিড়ালটার যদি মুখে ভাষা থাকতো
তাহলে হয়তো বলতো, 'বাবা- - - - -বাবা- - - -'

উজ্জ্বল হাসিতে তিনি তাকে তিরস্কার করেন,
সুখের রাজকন্যা হয়ে
সেই সাদা বিড়ালটা
সেখানে গা এলিয়ে দেয়।

আর আমি ?
আর আমি যদি সেই সাদা বিড়ালটাকে
সামান্য বিবক্ত কবি
আমার প্রভুর উন্মত্ত গর্জনে
আমার আত্মা-পাখী
বুক দুরু ভয়ে আচমকা কেঁপে ওঠে।

আগেই বলা হয়েছে যে আবদুহ্ কাব্যেব উপকরণ সংগ্রহ করেছেন প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাব ফল থেকে। এ অভিজ্ঞতা তাব অন্তবস্পর্শী এবং এ জন্যেই সহজ সবল একটা পবিশীলিত মন স্বতস্ফূর্ত হয়ে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। কবি যখন নিজের চলার গতিতে সহায়তার হাওয়া পান তখন তাঁব পবিক্রমা সাবলীল গতিতেই নিযন্ত্রিত হয়। আবদুহ্-এর কবিতাও তাই সহজ সবল ; বক্রিম বেখাব স্রোতে আবর্তিত নয়।

প্রেম, প্রকৃতি ও নাবী---এই তিন অনুপ্রেবণাব হাত ধবে অগ্রসব হয়েছেন ইরাকের জামিল সিদকী আল-জাহাবী। ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষার্ধের কবিদের মূল লক্ষ্যবস্তু যদিও কাব্যেব বিবর্তন ধাবাব প্রযাস তথাপি কেউ সেই প্রযাসকে শুধু ক্লাসিকধর্মী কবিতাব বিবর্তন ধাবায় অন্যতম পন্থা আঙ্গিকে সীমাবদ্ধ না বেখে বিষযবস্তুব মাঠেও পদচাবণা করেছেন। জামিল সিদকী আল-জাহাবী তাব উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। তাঁর প্রেমের মুখাবয়বে যেমন কদর্যের কালিমা নেই ; তেমনি প্রকৃতিকেও তিনি আরোপিত দেখেছেন আত্মসচেতনতায় এবং নাবীর পবিত্র প্রেবণার উৎস তার গতিকে ত্ববান্বিত করে নিযে গেছে সম্মুখেব দিকে। কিন্তু 'দুর্যোগের অশুভ মুহূর্ত' কবিকে বাধা দিয়েছে বারবাব, তাই কবি নৈরাশ্যবাদীব ভূমিকায় আবার ফিরে এসেছেন নাবীব কাছে। সংবেদনশীল আর্তিতে মুখব হযেছেন কবি :

প্রিয়তমা, শত্রুর বুলেট
কিম্বা ঝকঝকে তরবাবী
যদি কভু আমার বিদায়
দ্রুততর করে
দ্রুততর করে
তখন অটল থেকো।।

দুর্যোগের অশুভ মুহূর্ত,
ও, তোমার কাছে কিছু নয়,
ও, তোমার কাছে কিছু নয়।
তোমার ঘুমের ভিতর আমি স্বপ্নে বেঁচে থাকবো,
স্বপ্নে বেঁচে থাকবো॥

বিপদে ধৈর্যের আবরণ
ও যেন তোমার রূপসী দেহের কারুকার্যে
অলঙ্কার, সম্পন্ন বৈভব॥

সব ভণ্ডামীর মৃত্যু চাই
ভণ্ডামী আমার মৃত্যু চায় ;
নির্জীবের প্রাণ দিতে চাই
তারা আমার এ প্রাণ নিতে চায়।
আমি আর তারা
মাঝখানে
তফাতের সুউচ্চ পাহাড়॥

কবির জীবন-চৈতন্যে প্রকৃতি কতটা অনড়, সত্য ; তারও ইংগীত সুস্পষ্ট আল-জাহাবীর রচনায় :

কী স্বচ্ছ দর্পণ তুমি আমার আকাশ!
তোমার তুলনা আছে এমন আশ্বাস
কে দেবে আমাকে
অকপট আস্থা যদি থাকে ?

আমার জন্মের লগ্ন থেকে
মনের ইজেলে তুমি কি ছবি রেখেছো দ্যাখো এঁকে।
রূপসী জলের মতো সে ছবি কেবলি যেন হাসে
এবং তোমাকে ভালবাসে॥

যখন ভোরের গাছে সুমিষ্ট গানের বুলবুল
কী মধুর সুরে মশগুল

তখন আলোর ফুল চার পাশে ফুটে—
সঙ্গোপনে মন নেয় লুটে ।।

বিশ্বের সমস্ত চিত্র একাকী তোমাতে আছে ধরা,
আমার মনের ঘরে সব ছবি রঙে রঙে ভরা ।।

উপরে বর্ণিত কবিদের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং সবাই মৃত্যু বরণ করেছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে। বেনেসাঁ যুগের কাব্য-আন্দোলনে এদের সক্রিয় ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এখানে তবুও একটু প্রশ্ন থেকে যায়। সে প্রশ্ন : বেনেসাঁ যুগের কাব্য-আন্দোলনটা কি ?

এ কাব্য-আন্দোলন আর কিছু নয়, ক্লাসিকধর্মী আরবী কবিতার পালা-বদলের প্রয়াস। পশ্চিমীপ্রভাবেপ্রভাবান্বিত হয়ে কি আঙ্গিক গঠন, কি ছন্দ-প্রকরণ, কি বর্ণনা কৌশল ইত্যাদির সম্পন্ন ধারালো শাবলে আরবী কবিতার প্রাচীন প্রাসাদ ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে আধুনিক প্যাটার্নের প্রাসাদ নির্মাণই ছিল পালাবদল বা আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আশার কথা তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল আশা-ব্যঞ্জক। বলা প্রয়োজন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কাসিদাধর্মী কবিতার বিরাটত্বকে ক্ষুণ্ন করে খণ্ড খণ্ড কবিতায় রূপ দেওয়া। উপরে বর্ণিত কাব্যধারায় এ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বর্তমান।

॥ তিন ॥

ইতিপূর্বে বর্ণিত কবিরা রেনেসাঁ যুগের পুরোধা হিসেবে চিহ্নিত এবং এঁদের ঠিক পরপরই আরেক দল কবির আবির্ভাব আরবী কাব্য-সাহিত্যকে আরও নতুনত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে চললো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের মধ্যেকার বিভিন্ন সময়ে এঁদের জন্ম এবং এঁরা কাব্যে প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করলেন বিংশ শতাব্দির প্রথম তিন দশকের মধ্যে। এঁদের অনেকে এখনও জীবিত এবং এঁদের কাব্য-প্রবাহ পূর্বসূরীদের থেকে উৎসারিত হলেও যেন ভিন্ন খাতে প্রবহমান। এই ধারার কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেবাননের মিখাইল নাঈমা (জন্ম ১৮৮৯), ইলিয়া আবু মাদী (জন্ম ১৮৮৯); সউদী আরবের ইলিয়াস ফরহাত (জন্ম ১৮৯৩); মিশরের আল্ আক্কাদ (জন্ম ১৮৮৯); আল্ মাজেনী (জন্ম ১৮৯০); আল্ রামী (জন্ম ১৮৯২); সিরিয়ার খালিল মারদাম (জন্ম ১৮৯৫); ওমর আবু রীশা (জন্ম ১৮৯৩); মরক্কোর হাল্লাল আল্ ফাসীহ্ (জন্ম ১৮৯৮); তিউনিসের বৈরাম আত্-তুনেসী (জন্ম ১৮৯৮) প্রমুখ। এঁরা সবাই রেনেসাঁ যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যিক ও কবি। দ্বিতীয় পর্যায় এই অর্থে যে, রেনেসাঁ যুগের প্রারম্ভিক কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কাব্যধারাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। ইতিপূর্বে বর্ণিত কাব্যপ্রচেষ্টা প্রথম পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিরা এখনো জীবিত এবং তাঁদের জন্মকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের মধ্যে। যাঁদের সম্পর্কে সামান্য আগে বলা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের কবিদের কাব্য-প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীর তিন দশক থেকে শুরু হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিদের কেন্দ্রবিন্দু পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উৎসরিত হলেও তাঁদের নিজস্ব বাক-চাতুর্য, রূপকল্প, ছন্দ বৈচিত্র্য, চিত্রগ্রহণ, বর্ণনা-কৌশল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যময়তায় উজ্জ্বল। এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টা যেন পূর্বসূরীদের ধারার পাশে আর একটি উজ্জ্বল ধারার গতিবেগ যা ক্রমশঃ মহাসাগরের পানে ছুটে চলেছে। এই ছুটে চলার অভিযানে বিষয় বৈচিত্র্যের সন্ধান ছাড়াও রয়েছে আত্মঅভিজ্ঞানের পরিচর্যা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিদের অন্যতম উদ্‌গাতা বৈরাম আত্ তুনেসীর কাব্য-কর্মে যে কতটা আধুনিকতার স্পর্শ মূর্ত তা তাঁর আঙ্গিক গঠনের বৈচিত্র্য, ছন্দের কলাকৌশল এবং বিষয়বস্তুর সৌকর্যের লক্ষ্যমুখিতায় স্পষ্ট। এও যেন প্রথম পর্যায়ের কবিদের সাবলীল ধারার পাশাপাশি আর একটি সমান্তরাল অথচ সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাণবন্ত ধারা। কবির 'একটি আত্মজীবনীর' নমুনা :

প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও

প্রথম মিশর—আমি দেশ থেকে তাড়িত এখন
দ্বিতীয় তু'নিস—এই দেশবাসী সম্মান করেনি অকারণ
তৃতীয় প্যারিস—তারা আমাকে একাকী ফেলে গেছে
জানি না এ রীতি বা কেমন

প্রথম মিশর—আমি দেশ থেকে তাড়িত এখন—
জানি না এ জীবনের মানে
দ্বিতীয় তু'নিস—এই দেশবাসী সম্মান করেনি অকারণ
আগন্তুক ছিলাম সেখানে
তৃতীয় প্যারিস—তারা আমাকে একাকী ফেলে গেছে
জানি না এ রীতি বা কেমন
প্রেম যদি ছিল এই প্রাণে

প্রথম মিশর—আমি দেশ থেকে তাড়িত এখন
জানি না এ জীবনের মানে
অথবা সে ভাষণের সার
দ্বিতীয় তু'নিস—এই দেশবাসী সম্মান করেনি অকারণ—
আগন্তুক ছিলাম সেখানে—
এটা নাকি আপত্তি সবার
তৃতীয় প্যারিস—তারা আমাকে একাকী ফেলে গেছে
জানি না এ রীতি বা কেমন—
প্রেম যদি ছিল এই প্রাণে
ডেকেছিল তারা পুনর্বার

প্রথম বিদায় ছিল দুঃখের পিয়ালা—
গলার অনল'
দ্বিতীয় বিষাদময় সৌন্দর্যের জ্বালা—
পায়ে দলা ফল
তৃতীয় আমার প্রেম আলোকের মালা—
কলঙ্ক কেবল

প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও

প্রথম আমিই আজ অভিযুক্ত নীলনদ প্রবাহিত করে
দ্বিতীয় কেঁদেছি আমি কারাগার নির্বিবাদে জলমগ্ন করে
তৃতীয় আমিও আজ নিয়োজিত রাস্তাঘাট তৈরীর প্রহরে

প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও

মূল আরবী কবিতার হুবহু আঙ্গিক ও ছন্দ বজায় রেখে উপরোক্ত অনুবাদটি এই কথাই প্রমাণ করে যে, কাব্যের সকল ধারাতেই নব-নির্মাণের কাজ সম্প্রসারিত। পাশ্চাত্যের আধুনিক প্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন দাড়ি কমা সেমিকোলন বিহীন অবয়বও এই কবিতায় উপস্থিত। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে যোগসাজস রেখে আরবী কবিরাও কাব্য অঙ্গের সৌষ্ঠবে সময়োপযোগী হতে চেয়েছেন।

চিন্তা জগতের অনগ্রসরতা কাটিয়ে কবিতাকে শিল্পসর্বস্ব করার প্রয়াসেও তাঁদের একাগ্রতা লক্ষ্য করার মতো। এ শিল্প-সর্বস্বতার মধ্যে কবির মৌলিকত্বও সংযুক্ত। চিন্তার মৌলিকত্ব শিল্পকে শুধু শ্রেষ্ঠত্বেই রূপ দেয় না স্বাতন্ত্র্যের মহিমায়ও উজ্জ্বল করে। এ প্রচেষ্টায় আরবী কবিরা যে কতটা সার্থক সিরিয়ার ওমর আবু রীশা তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। 'একটি নারী একটি মূর্তি' কবিতার শিল্প চাতুর্যে রীশার মৌলিকত্ব সার্বজনীন স্বীকৃত সত্য :

মার্বেল পাথরে আঁকা রূপসী নারীর প্রতিচ্ছবি।
পৃথিবীর সুন্দর চাতালে
উপবিষ্টা নির্বিকার নারী;
চেয়ে আছে একা
অনন্ত মায়ায়ভরা যাদুকরী দৃষ্টির সোহাগে।

শতাব্দীর কাঁধের উপরে
মনে হয় রূপবতী অম্লান থাকবে চিরদিন।

নগ্ন দেহে শায়িতা সে নারী।

আনগ্ন শরীর তার রূপের সমুদ্রে ডুবে আছে,
অনন্ত কালের ঘরে সে যেন সৌন্দর্য বিলাসিনী—
উদয়াস্ত কামনায় জ্বলে সর্বক্ষণ।

মার্বেল পাথরে আঁকা রূপবতী নারী।

আমাদের সকল যন্ত্রণা
সুডৌল কটির প্রান্তে স্বপ্নের আছাড়ে প্রতিহত;
দৃষ্টির চঞ্চল পাখী সারা দেহে নজর বুলিয়ে
কী আশ্চর্য, ধ্যানের নিমগ্নে বসে থাকে।

যে শিল্পী দিয়েছে তাকে এতরূপ, সৌন্দর্য বিলাস—
সে নেই; কালের তটে নিশ্চিহ্ন হয়েছে,
কিন্তু তার স্বপ্নের কুমারী
অনন্ত যৌবনা হয়ে দীপ্তি দেয় পৃথিবীর ঘরে।

রূপবতী, কী নিষ্ঠুর এই মহাকাল,
একদা তোমার রূপ, লোভনীয় দেহের জৌলুস—
অজান্তে পাথর হবে এবং সেখানে নিরিবিলি
ঘুমাবে আমার এই মৃতসব স্বপ্নের পৌরুষ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে মিশরের আব্বাস মুহম্মদ আল আক্কাদ-এর সুর আরও সোচ্চার এবং ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি কবিতার ফর্মের পরিবর্তনে যতোটা না উৎসাহী তার চেয়ে বেশী উৎসাহী কাব্য ভাবনার গতানুগতিকতা পরিবর্তন করতে। তাঁর মতে জীবন ও শিল্প পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অশ্লীলতা যেমন শিল্পের জগতে ক্লেদের ভূমিকা পালন করে, তেমনি অন্যায় অত্যাচার শোষণ জীবনকেও ক্লেদাক্ত করে ফেলে। জীবন তথা শিল্পকে ক্লেদমুক্ত না করতে পারলে শিল্পেরও

যেমন স্থায়িত্ব নেই, জীবনও তেমনি অর্থহীন। বলা আবশ্যক যে, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সমগ্র আরব জগতে এক ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়ার চিত্র সমাজ জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। কাব্য-জগতেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কবি-সাহিত্যিকগণও এতে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেন। মুহম্মদ আল-আক্কাদের প্রতিবাদ আরও তীব্র। তাঁর মতে, 'ক্ষতিকর পলায়নী মনোবৃত্তি এবং বিদ্রোহের দাবানল আমার সত্তার বিশ্বাসকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণা আমার মতাদর্শে নিপতিত। অতএব এই জীবনের কোন অর্থই নেই।' কবির এই আত্ম-অভিজ্ঞান তাঁর কাব্য-কর্মেও প্রতিফলিত। অন্যায় অত্যাচার ও শোষণরূপ শয়তানের নিপীড়নে তাঁর আত্মা প্রতিবাদ-মুখর এবং তাঁর বক্তব্য যেখানে সবাই শয়তান সেখানে শয়তানের ভূমিকা অপ্রয়োজনীয়। তাঁর ভাষায়:

নিজের চাতুরী বলে নিজেকে সবার সেরা ভেবে
শয়তান, তুমি কতো খুশি!

এমনকি ভেড়ার মতোন
অনুগত যারা
তাদের প্রভুত্ব করে প্রিয় শয়তান
নিজেকে সম্রাট ভেবে তুমি আত্মহারা।

লাম্পট্য এবং কুকীর্তির বেড়াজালে
যদি নিমগ্ন সবাই
তাহলে তোমাকে বলি প্রিয় শয়তান
কেন এই অপচেষ্টা মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দিতে?

ওগো শয়তান
পাপের অস্তিত্বে তুমি অবিশ্বাসী আজ?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-আক্কাদ কাব্য-আঙ্গিকের পরিবর্তনের চেয়ে কাব্য-ভাবনার পরিবর্তনের পক্ষপাতি অধিক মাত্রায়।

তাঁর 'শয়তানের আত্মজীবনী' কাব্য গ্রন্থে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত সাতাশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং আঙ্গিক-অনুসরণেও প্রাচীনধর্মী কাসিদার ফর্ম বর্তমান। কিন্তু বিষয়বস্তুতে নতুন কথা এবং নতুন ভাবনার অবতারণা করেছেন।

দ্বিতীয়-পর্যায়ভুক্ত লেবাননের মিখাইল নাঈমা-এর কণ্ঠেও আব্বাস মুহম্মদ আল-আক্কাদের সুর ধ্বনিত। কবিতার ধ্বংসস্তূপের উপর নিউ প্যাটার্নের প্রাসাদ রচনায় তিনি প্রয়াসী। এই শিল্প চেতনাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে নবরূপায়ণের লক্ষ্যে। কবি অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এর একমাত্র কারণ লেবাননে জন্মগ্রহণ করলেও কবির দীর্ঘজীবন কাটে রাশিয়ায় এবং আমেরিকায়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে ডক্টরেট লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি জীবরান খলীল জীবরানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। জীবরানের 'ইয়াসূয়্ ইবনে ইনসান' গ্রন্থে সংকলিত মিখাইল নাঈমার অনেকগুলো চিঠি তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

পাশ্চাত্যের প্রভাব বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের যেসব কবিদের উপর প্রকট মিখাইল নাঈমাও তার ব্যতিক্রম নন। এই প্রভাব তার চেতনার রাজ্যে যুগান্তকারী ক্রিয়া করে এবং তারই প্রতিফলন বিধৃত তার সমগ্র শিল্পকর্মে। কবি ধ্যানস্থ, আত্মস্থ এবং সর্বোপরি বিদ্রোহী। বিবর্তন প্রয়াসী কবির কাব্য-গ্রন্থ 'দীওয়ান' সেই ধারারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর। অন্যায় অত্যাচার ও শোষণ সম্পৃক্ত সমাজজীবনের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে কবির প্রশ্ন :

আমরা কোথায় আছি, কোথায়? কোথায়?

আত্মীয় স্বজন নেই আমাদের ; নেই প্রতিবেশী।
যখনি ঘুমাই কিম্বা জাগরণে চকিতে তাকাই—
দেখি এ সর্বাঙ্গ জুড়ে লজ্জার পোশাক।

এ পৃথিবী নষ্ট আজ আমাদের গলিত দেহের
রক্ত-পুঁজে। যেমন কবর
নষ্ট হয় অজস্র লাশের সমন্বয়ে।...

হে বন্ধু, তোমরা আসো নতুন বেলচা হাতে নিয়ে
কবর খোঁড়ার গানে মগ্ন হতে; যে কবরে শুধু
গোপনে লুকাবে সব জীবন্ত আত্মারা একে একে।

কবির বিদ্রোহ ক্লেদাক্ত সমাজজীবনের বিরুদ্ধে। কবির সমস্ত যন্ত্রণা দলিত মথিত হয়ে এমন কাব্য-কুসুমের জন্ম দিয়েছে যার ঘ্রাণ সমগ্র-বিশ্বের হাওয়ায় স্পন্দিত।

॥ চার ॥

বিংশ শতাব্দীর তিন দশকের পর থেকে শুরু হলো রেনেসাঁ যুগের তৃতীয় দলভুক্ত কবিদের কাব্য-পরিক্রমা। উপরে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয়-দল থেকে যেন এঁরা আরও একটু ভিন্ন এবং আরও একটু স্বাতন্ত্র্যের প্রয়াসী। এঁদের কাব্য-প্রচেষ্টা সম্মিলিত কাব্য-প্রচেষ্টা এবং তা যেন একটা মৌচাক ঘিরে মক্ষিকাদের মধু জমানোর সম্মিলিত কলগুঞ্জরণ। উপমাটি একজন আরবী সমালোচকের ভাষায়ই বলা যাক: 'ফা হুয়া ইয়ান্তাকালা বিল কারেয়ী বায়না আতায়েবেশ্ শে'রা কান্ নাহ্লাতা মুনবেতুজ্ জাহরা ওরাতুফু বেহী লেবানানা, ওয়াস সিরিয়াতা, ওয়াল ইরাকা, ওয়াল মিসরা, ওয়াস্ সুদানা, ওয়াত্ তুনেসা, ওয়াল ফেলিস্তিনা, ওয়াল মামলু-কাতিল্ সাউদিয়াতাল্ আরাবিয়্যাতা, ওয়াল কোয়েতা, ওয়াল লিবিয়া।'

[আরবী কাব্য-সাহিত্য একটা মৌচাক। বিভিন্ন ধরনের ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, সুদান, তিউনিস, ফিলিস্তিন, সাউদী আরব, কোয়েত এবং লিবিয়ার কবি-মক্ষিকারা সেই কাব্য-মৌচাকে মধু জমা করছেন।]

তৃতীয় দলভুক্ত তিরিশোত্তর কবিদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে খ্যাতিমান তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

১. লেবাননের—সায়ীদ আকল, সালাহ লাবকী, আহমদ আবু সায়ীদ, ইউসুফ গুসুব, মুস্তাফা মাহমুদ, ফাওয়াদ আল খেশান।

২. সিরিয়ার—নাজার কাব্বানী, শাওকী বাগদাদী, সোলায়মান আল ইসা।

৩. ইরাকের—আবদুল ওয়াহাব আল বাইয়্যাতী, বুলান্দ আল-হায়দারী, বাদার শাকের আস সাইয়্যাব, আবদুল মজিদ লুৎফী ও নাজিক আল-মালাইকা।

৪. মিশরের—আল্ ফায়তুরী, সালাহ উদ্দীন আবদুস সাবুর, মাহমুদ ফাওজী আল আনতীল, কামাল নেশাত, নাজীব সারোর, আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন, আজীজ আবাজা, জাকী মুবারক, মুহম্মদ সাবাঈ, ইদরীস মোহাম্মদ জামাল, ইব্রাহীম না'জী, ইলিয়াস আবু শাবকাহ্, জলী'লা রীদা, জয়নব হোসেইন এবং জামিলা আল-লায়ালী।

৫. সুদানের—জিলী আবদুর রাহমান, মহীউদ্দীন ফারেস এবং ইব্রাহীম তাউকান।

৬. তিউনিসের—আবুল কাসেম শা'বী।

৭. ফেলিস্তিনের—ফাদওয়া তাউকান।

৮. সউদী আরবের—হাসান আবদুল্লাহ্ আল-কোবেশী।

৯. কোয়েতের—আহমদ জায়েদ আস-সাকাফ।

১০. লিবিয়ার—আলী মোহাম্মদ বাকায়যী প্রমুখ।

এঁদের মধ্যে নাজিক আল-মালাইকা, ফাদওয়া তাউকান, জলীলা রীদা, জয়নব হোসাইন এবং জামিলা আল-লায়ালী মহিলা কবি।

এই তৃতীয় দলভুক্ত কবিদের পুরোধায় ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় দলভুক্ত কবিরা পশ্চাতভূমি হিসাবে থাকলেও তিরিশোত্তর এই তৃতীয় দলভুক্ত কবিরা কবিতার ষ্টাইল, জীবন ও জগৎ, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা, চৈতন্য ও মানসিকতা, রূপক ও প্রতীকধর্মীতা ইত্যাদি সম্পর্কে আরও সজাগ এবং সব মিলিয়ে তাঁদের কাব্য-কর্ম শিল্প সার্থকতায় বিশিষ্ট। এমনকি কোনো কোনো কবি শিল্পকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রূপসী নারী দেহে যেমন পোশাকের বাহার, অলঙ্কারের চাকচিক্য সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে পরম সহায়ক তেমনি কাব্য-দেহে ছন্দ, রূপক, প্রতীক, বর্ণনা কৌশল, আবেদন ইত্যাদি আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য শৈল্পিক উপাদান। এই শৈল্পিক উপাদান সংগ্রহ করে কবিতাকে কতটা সৌন্দর্য-মণ্ডিত ও সার্থক করা যায় নিম্নোধৃত সউদী আরবের হাসান আবদুল্লাহ্

আল-কোরেশীর 'ফি ওয়াকতিল্ জুবাব' বা 'কুয়াশার মুহূর্তে' কবিতায় তার প্রমাণ মিলবে :

আকাশে বিদ্যুৎ-ডানা ; অবিশ্রান্ত মুখর বর্ষণ
অশ্রুর সাগর বেয়ে হৃদয়ের গহীন অতলে
গোপন সত্তার কাছে জাগ্রত এখন :
কোথায় আমার সেই সুমধুর গানের বুলবুল ?

আর কি মধুর গানে এই শূন্য হৃদয় এলাকা
মুখরিত হবে না ? অথবা ঝাপটানো তার পাখা
আকাশের নিঃশব্দ নগরে কোনোও সকালে যার
গানের রেশমী সুর ফুরফুরে হাওয়ার উল্লাসে
মনের শাখায় এক আত্মতৃপ্ত প্রশংসার মতো
রোদের ময়ূর পুচ্ছ আনন্দে নাচতো অবিরত।

এখন গোধুলী লগ্নে দিবসের মৃত্যু হলে পর
করুণ আশ্রয় তার অন্ধকার রাত্রির কবর।

একদা গানের বৃষ্টি গোলাপের নিরুক্ত আতর
সমাচ্ছন্ন ছিল এই অন্তরে সম্পন্ন সুখ দিতে ;
আত্মস্থ ধ্যানের গলি উজ্জ্বল আনন্দ অধিবাসী
যেখানে শীতের শেষে প্রতিষ্ঠিত বসন্তের ঘর—
এবং প্রেমের সখা অভিসারী চারণ ভূমিতে।

এখন কোথায় সেই সুমধুর গানের বুলবুল ?
দিনের ক্রমশঃ গতি অন্ধকার রাত্রির গহ্বরে
উটের গ্রীবায় কাঁপে পিপাসার শূন্য কাতরতা
শুকনো খেজুর পাতা নমনীয় মৃত্যুর শিয়রে।

উপরোক্ত কবিতায় রূপকধর্মী যেসব শব্দ যেমন 'বিদ্যুৎ-ডানা,' 'আত্মতৃপ্ত প্রশংসা,' 'গানের বৃষ্টি,' 'রোদের ময়ুর পুচ্ছ,' 'ধ্যানের গলি,'

'আনন্দ-অধিবাসী' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে কাব্যের জগতে 'গোলাবের নিরুক্ত আতর'।

আধুনিক কাব্য-ভাবনায় এই শিল্পরীতি যে কবিতাকে সর্বজনগ্রাহ্য ও সুদূরপ্রসারী করে তুলছে তা বলাই বাহুল্য। বলা প্রয়োজন, আরবী কবিতার ইতিহাসে এই ধরনের শব্দালঙ্কার ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনুপস্থিত।

কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও কবিরা সজাগ। বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে তাঁরা পূর্ববর্তী কবিদের রীতি বর্জন করেছেন এমন উক্তি করা অনুচিত। কেননা, পূর্ববর্তী কাব্যের বিষযবস্তুও আধুনিক কবিদের ভাবনায় বিস্তৃত। তবে তা প্রকাশভঙ্গীর দক্ষতায কতটা সংবেদনশীল ও সর্বজনগ্রাহ্য তাই আমাদের বিচার্য।

আধুনিক আরবী কবিদের কাব্য রচনাব ক্ষেত্রেও জীবন-জগৎ, প্রেম-প্রকৃতি, হাসি-কান্না, দুঃখ-দুর্দশা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, দেশ-রাষ্ট্র, সমাজ-রাজনীতি, স্বাধীনতা-পরাধীনতা ইত্যাদিতে বিস্তৃত। এইসব বিষয়বস্তুর ভাবাবেগ কবি-চিত্তলোকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবির্ভাব ঘটিয়ে কি আশ্চর্য সম্পদ আবিষ্কৃত হচ্ছে তাই আমাদের প্রতিপাদ্য। আশার কথা, আধুনিক আরবী কবিতায় যেমন রয়েছে হৃদয়ানুভূতি তেমনি রয়েছে সার্থকতা ও সাফল্যের স্ফূরণ।

আত্ম-সচেতনতা, আত্ম-অভিজ্ঞান এবং আত্ম-উপলব্ধি এই তিন বস্তুর সংমিশ্রণ জীবনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট। আধুনিক আরবী কবিরাও এই সৎসাহস থেকে নিবৃত্ত নয়।

তিরিশোত্তর কবিদের অন্যতম আবুল কাশেম শা'বী (যিনি পঁচিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন) জীবনকে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'কায়ফা তায়িশ' বা 'বাঁচার মুহূর্তে' এই ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ :

ঠিক ডাক দেবে জেনো একদা তোমার
ভবিষ্যৎ ; বাঁচার মুহূর্তে যদি তুমি
নিশ্চল না হয়ে পড়।

রাত্রির আঁধার
বিনষ্ট হবেই আর আলোর মৌসুমী
ফুটবে।
শৃঙ্খল ছিঁড়ে জাগবে মানুষ।

অতীত বিলীন হবে বলে
নতুন জীবন এসে লুব্ধ আলিঙ্গনে
হাসবে হৃদয়ে। তা' না হলে
যেখানে দাঁড়িয়ে তুমি মৃত্যুর আস্বাদ
নাও ;

প্রকৃতির মুখে নিত্য সংগোপনে
একই কথা। আত্মা, তার কাছেও এ সংবাদ।

আমার শিরায় ক্ষুব্ধ রক্তের গর্জন
আর আত্মার গভীরে লুক্কায়িত সাপ।

সশব্দে বলেছি আমি : 'হে আমার দেশ
তুমি কি দাওনি অভিশাপ
আমাকে ?
অথবা ঘৃণা করনি কখন ?'
'না, তোমাকে ভালবাসি ; আর ভালবাসি
উন্মত্ত জোয়ারে যারা সাহসী নাবিক।
সম্মুখ যুদ্ধের ক্ষণে যেই পদাতিক
পিছে হটে, সে আমার ঘৃণার প্রতীক।'

জীবন শাশ্বত সত্য—সত্যের ছায়াকে
ভালবাসে ;

ঘৃণা করে মৃত্যুর শরীর
এবং নিশ্চল যেই দেহ, তাকে।

তরুণ কবি শাওকী বাগদাদী জীবনকে দেখেছেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আবুল কাসেম শা'বীর সঙ্গে শাওকী বাগদাদীর কিছুটা তফাৎ থাকলেও এতেও যে আত্মোপলব্ধির বিকাশ রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শাওকী বাগদাদী প্রকৃতিকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে সেখানে উজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন—সৎ চিন্তার এও এক শুভ লক্ষণ।

রেনেসাঁ যুগের প্রথম পর্বায়ভুক্ত কবি মা'রুফ আর রুসাফীর প্রকৃতি প্রীতির লক্ষণ শাওকী বাগদাদীর কবিতায় অন্তরীণ থাকলেও কাব্য-গঠন, ছন্দ এবং উপমা নির্বাচনে যেন শাওকী বাগদাদী আরও একটু সতর্ক এবং অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন। মা'রুফ আর রুসাফী জীবনের চড়াই উৎরাইয়ের আন্তঃমিলের সন্ধান পেয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে, আর শাওকী বাগদাদী অনাবিল প্রেমের মধ্যে প্রকৃতি আরোপ করে সেখানে সুন্দর স্বচ্ছ এবং অর্থপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন। মা'রুফ আর রুসাফীর কাছে প্রকৃতি শিক্ষণীয় গ্রন্থ এবং শাওকী বাগদাদীর কাছে প্রকৃতি জন্মের আধার অর্থাৎ জীবন।

শাওকী বাগদাদী তাঁর 'আহলামু' বা 'আমাদের স্বপ্ন' কবিতায় উপরোক্ত মন্তব্যের স্বাক্ষর এঁকেছেন এই ভাবে :

আমাদের স্বপ্ন : এই সৈকত যেন এক প্রেমিক—
হৃদয়ে আনন্দ আছে, আকাঙক্ষাও আছে।

আমাদের স্বপ্ন : এই সমুদ্র যেন প্রেমিকার
কলোচ্ছ্বাস।

আমাদের স্বপ্ন : অজস্র আলোর শিশু বালির ঔজ্জ্বল্যে
অন্ধকার মৃত দিনকে আশ্চর্য মুখর করে তোলে।
তাদের সম্মুখে দুধ শারাব জলের প্রেরণা।

আমাদের স্বপ্ন : এই আকাশ যেন নীলপূর্ণ
শারাবের পেয়ালা।

এবং সেই ইচ্ছায়
অজস্র পাখীরা উড়ে যায়,
তাদের ঘর্মাক্ত দেহের পালকের আড়ালেও
আকাঙ্ক্ষিত নীল।

আমাদের স্বপ্ন : এই সবে প্রাণময় এক
উজ্জ্বল জীবন।
জীবনই আমাদের স্বপ্ন।

প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছে আরবী কবিদের কাব্য-ভাবনায়। কেউ কেউ আবার প্রকৃতিকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম ছাড়াও প্রকৃতিতে নারীরূপিনী সত্তা উপলব্ধি করেছেন। মানব সমাজের আদিম চিন্তাপ্রসূত সংজ্ঞায় প্রকৃতি ও নারীতে কোন তফাৎ নেই। কেননা, প্রকৃতির যেমন রয়েছে ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা, তেমনি নারীর রয়েছে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা। অতএব উভয়ের আকাঙ্ক্ষা ও নিবৃত্তি মূলতঃ একই ধরনের।

মিশরের তরুণ কবি আল-ফায়তুরীর 'তাহতাল আমতার' বা 'বৃষ্টির নীচে' শীর্ষক কবিতায় এই আদিম ধারণাসঞ্জাত বিশ্বাসের পরিচয় বিধৃত। এমনকি হিন্দু-দর্শনের অন্যতম ব্যাখ্যা পুরুষ আকাশ দেবতার সঙ্গে স্ত্রী ধরণীর সঙ্গমক্রিয়ার ফলশ্রুতি বৃষ্টি রূপ বীর্যপাতও এই কবিতার অন্যতম অর্থবহ ইংগীত বলে ধরে নেওয়া যায়। 'তাহতাল আমতার' বা 'বৃষ্টির নীচে' কবিতার বক্তব্য :

বৃষ্টি, নামো, নামো।

বৃষ্টি, থামো থামো।
মৃত্যুর অপর পারে ধনবান নতুন জীবন

ভূমিষ্ঠ বৃষ্টির হাতে। পৃথিবী সজীব, প্রাণময়।
এবং আকাশ যেন আশ্চর্য কৌশলে
বিশুষ্ক পৃথিবী টেনে বুকের গভীরে
আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ-কথা বলে।

বিজলী-চমক খুশী ফুটে ওঠে পৃথিবীর মুখে;
অপার কৌতুকে
একটি রমণী যেন তার
গর্ভে পায় পরিপ্লুত রসের সম্ভার।

বৃষ্টি সম্পর্কিত চিত্র-কল্প প্রাচীন কবি ইমরাউল কায়েসের কাব্যেও রয়েছে বহুল পরিমাণে। বৃষ্টির পর মুহূর্তে প্রকৃতির রূপলাবণ্য ইমরাউল কায়েস লক্ষ্য করেছেন এইভাবে:

মরুর মাটিতে জাগে অপরূপ স্ফূর্তির আবেগ—
যেমন অজস্র দিরহামে
খুশী হয় ইমনী বণিক।

আধুনিক আরবী কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লেবাননের তরুণ কবি আহমদ আবু সায়ীদ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু শব্দ চয়ন ও রূপচিত্রণই নয়, কল্পনা এবং বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্যেও তাঁর কবিতা অভিনব ও যুগোপযোগী। তাছাড়া তাঁর কাব্যের ষ্টাইল-নির্মাণ পূর্ববর্তী কবিদের থেকে তাঁকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। বক্তব্যের সারল্যে চিরন্তন সত্য যেন আরও নতুনতর সত্যে পরিণত হয়েছে। এখানেই কবির সাফল্য। তাঁর 'আওদাতির রাবি' বা 'বসন্ত-গান' শীর্ষক কবিতাটি আধুনিক কাব্য-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাণবন্ত ফসল:

চলো, দ্যাখো পরিশেষে ভূমিষ্ঠ আনন্দ।

স্বচ্ছন্দ জীবনে না-পছন্দ
ইচ্ছা বৃত্তি গতায়ু এখন
চলো, দ্যাখো আয়োজিত সুন্দর জীবন।

আলোর প্রশংসা ঝোলে গোলাব শাখায়
সকালে তোমার মুখ হাসিতে চঞ্চল;
দুধ-বাসে অমৃত এখন
পরিপ্লুত, অন্তরে খুশীর শ্লোক সেই বার্তা জানায়।

চলো, দ্যাখো আয়োজিত অনিন্দ্য-জীবন।

কালের মহৎ-লগ্নে উন্মোচিত গোলাব যৌবন,
বসন্ত, অনন্য তুমি আনন্দ, উজ্জ্বল।

গদ্য-কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তরুণ আরবী কবিরা উত্তীর্ণ। ছন্দ ও আন্তঃমিলের সৌকর্য ছাড়াও যে কবিতা মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে এমন নজির আধুনিক আরবী কবিতায় বিরল নয়। এসব কবিতার বৈশিষ্ট্যময় দিক এই যে, সাবলীল গতিবেগ যেমন কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না তেমনি কবির আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা এবং সারল্য পাঠকচিত্তকে বিমোহিত করে। এসব কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, বর্ণনা কৌশল ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য কাব্য-কর্মকে মহিমান্বিত করে তোলে। সুদানের ইবরাহীম তাউকান এবং লেবাননের মুস্তাফা মাহমুদ গদ্য কবিতা রচনায় কৃতিত্বের পরিচায়ক। হুবহু আরবীর সঙ্গে মিল রেখে ইবরাহীম তাউকানের 'হামামাতু' (পারাবত) এবং মুস্তাফা মাহমুদের 'মেনদিলুল আবিয়াজ' (সাদা রুমাল) কবিতা দুইটির অনুবাদ পেশ করছি:

॥ ১ ॥

শ্বেত পারাবতগুলোর পাখনা নাড়ার শব্দ
স্পষ্ট হয়ে কানে আসে;
শান্তি ও শুভেচ্ছার মুক্তিদূত তারা
সেই সৃষ্টির আদি থেকে।

স্নিগ্ধ-মৃদু হাওয়া বয়,
গাছের শাখা দোলে
তারাও কেমন দোল খায়।

যখন দুপুরের রোদ্দুর ঝলসায় তারা উড়ে যায় জলাশয়ে-
কেমন বৃত্ত এঁকে নামে।
আমাদের দুর্বার ইচ্ছার মতোন।

দু'ধারে দু'টো কাফেলা—ইতস্তত, যখন নেমেছিল।
যখন তারা জল খায়, মনে হয় নিজের ছায়াকে টেনে
চুমু দেয়।

যখন তারা মাথা ঝাড়ে জলবিন্দু মুক্তোর মতোন
গলায় চমকায়।

শান্ত হয়ে ফের উড়ে যায় গাছের শাখায়
স্বচ্ছন্দ আরামে।

পাখার আন্দোলন পরিতৃপ্তির বার্তা ঘোষণা করে।

সন্ধ্যে হ'লে দেখা যায় তারা সব মস্তকবিহীন,
কেননা, নরম পালকে মাথা ঢেকে বেশ নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে থাকে।

॥ ২ ॥

তোমার সাদা রুমালে বিদ্যুতের কারুকাজ
আমার হৃদয়ে তার সবটুকু আলো প্রতিফলিত।

প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো মৃত্যুদণ্ডের মতো
আমাকে উদ্বিগ্ন করে।

তোমাকে পাবার বাসনা—ও যেন গুচ্ছবদ্ধ আপেল
মাংসল শরীর, সুঘ্রাণ ; এবং গিলবার এক দুর্বার আগ্রহ
আমাকে মত্ত করে,
আমাকে মত্ত করে।

রাত্রির মতো অনিষ্ট তোমাকে পাবার বাসনা।
চঞ্চল দিনের ঘুরাফেরা, কিন্তু কোথায় রাত্রি ?
ছেড়ে আসা ট্রেন, ষ্টেশন বহুদূর,
বহুদূর ॥

চোখের পাতার কাছে আমি মূর্খ সাব্যস্ত,
কেননা ধ্যানের এই অবকাশের মধ্যে তুমি অশরিরী।
কেবল আমার হৃদয়ের চার পায়ায়
তোমার সাদা রুমাল,
সাদা রুমাল।।

পুরুষ-হৃদয়ের অন্যতম আকর্ষণ নারীর রূপ-যৌবন কেন্দ্রিক প্রেমের কবিতার প্রাচুর্যও আধুনিক আরবী কবিতায় রয়েছে। কিন্তু প্রেম যেখানে আত্মকেন্দ্রিক এবং কামলিপ্সার নামান্তর তা সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না বা হওয়া উচিত নয়। সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে, এমন বিষয়বস্তু কাব্য-ভাবনার অন্তর্ভুক্ত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন আনির সাফারাল কাসেমীর 'চুম্বনের স্মৃতির' কিছু অংশ:

অনেক দিনেব আকাঙ্ক্ষিত সেই মেয়েটিকে
পাবার আগ্রহ,
তিলে তিলে আমার হৃদয়ে,
কী সুন্দর ফুল ফুটালো।

সে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই
আবেগের বোঁটা থেকে

ফুলটা ছিঁড়ে এনে
মেয়েটার গালের নরমে
চুমোর আঘাতে
অজস্র রেণু মেখে দিলাম।

আমার এতদিনের লালিত যন্ত্রণা
তার সেই গালে ফুটে উঠলো।

মেয়েটা রাগ করলো।

এ 'রাগ' কেবল মেয়েটার নয়; এ রাগ আমাদেরও। প্রেম যেখানে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক লিপ্সায় কদর্যময় সে প্রেম কাব্যশরীরে কুষ্ঠরোগ ছাড়া কিছু নয়।

নাজার কাববানীর কাব্যের উৎস নারীর যৌবন চিত্রিত হয়েছে চিরন্তনগুণের মহিমায়। তিনি যেসব শৈল্পিক উপাদানে তাঁর কবিতারূপিনী যৌবনবতী নারীকে অলঙ্কৃত করেছেন তা শুধু তাঁর নিজের কাছে নয়, আমাদের কাছেও আকর্ষণীয়। এতে আবেগের অতিরেক আছে কিন্তু অশ্লীলতা নেই। 'ইনদা ইমবাতিন' বা 'নারীর পাশে' কবিতায় নাজার কাববানী বলেন:

সৌখীন মহলে তার শরীরের বিচ্ছুরিত আলো
এবং সুঘ্রাণে পুষ্ট স্বাস্থ্যবতী সুঠাম যৌবন,
যখন সম্মুখে এসে আয়নার প্রতিবিম্বে জ্বলে—
হৃদয়ে একান্ত তাকে নির্বিঘ্নে পাবার অভিলাষে;
নিজেকে গোপনে বলি: 'এখানে আসন পাতা আছে।'

হৃদয় গোলাব তার ছিঁড়ে নিতে আকাঙক্ষা আমার,
শীতের মৌসুম গত, চুলের আতরে কী যে ঘ্রাণ;
শারাবের পান পাত্র আনন্দ মুখের মিষ্টি হাসি
দুর্লভ অম্লান তাকে দুর্নিবার পাবার আগ্রহে
মনের এ প্রেত হাওয়া মাথা কুটে মরে।

কানের ঝুমকো দুটি লতাশ্রিত প্রেমের কুসুম
এবং নীলামে উঠি বিগলিত চোখের আহ্বানে—
অথচ বুঝিনা কেন স্বখাত কবরে ডুবে মরি।

আর্তির পিপাসা জ্বলে শূন্যতার হা-করা ইচ্ছায়,
তৃপ্তির মহৎ লগ্নে শ্বেতাভ বরফ-জল চাই।

রেনেসাঁ যুগের এই তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত কবিদের মধ্যে সম্ভবতঃ বয়সে সবচেয়ে তরুণ ইরাকের বুলান্দ আল-হায়দরী। এখনো তিনি তিরিশের কোঠা অতিক্রম করেন নি। অথচ তাঁর কাব্য-কর্মে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ স্পষ্ট।

শুধু আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং বর্ণনা-চাতুর্যেও তিনি বিশিষ্ট। প্রেম-প্রকৃতি, ঐতিহ্য-চেতনা প্রভৃতি সংবেদনশীল মনের আর্তিতে তাঁর কবিতা নিবদ্ধ। তাছাড়া শৈল্পিক উপাদানে তাঁর সামগ্রিক কাব্যকর্ম নকসী কাঁথার ভাস্বরে বৈশিষ্ট্যময়। তাঁর 'আ'মাক' (ধ্যানের নায়ক), 'ইলা ইমরাতিন আকমাতা' (বন্ধ্যা নারীর প্রতি), 'কিবরী' (আমার অহঙ্কার) প্রভৃতি কবিতা আরবী কাব্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। 'ধ্যানের নায়ক' কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

না, আর ডেকো না তুমি ; ডেকো না আমাকে।
মনের বিক্ষুব্ধ হাওয়া দ্বার থেকে দ্বারে
এবং নিশ্চল ওই না-পাওয়া দিগন্ত দূর পারে
মাথা কুটে মরে।

নিমগ্ন ধ্যানের ছোটো ঘরে
যৌবনের স্বপ্ন-মোম ওই আলো শরীরের টানে
ক্রমশঃ নরম হয়, গলে।
আমাকে ডেকো না আর রূপের অনলে
পুড়ে মারবার।
পুরনো দিনের সব স্মৃতির পাথর
হৃদয়ের প্রশান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে।

চঞ্চল চড়ুই নাচে ছায়াচ্ছন্ন বনের শাখায়,
অজস্র স্বপ্নের শিশু সমুদ্রের বালুকা বেলায়
মাটির মায়াবী প্রেমে রচে খেলাঘর।

তোমার উজ্জ্বল হাসি ফুটন্ত ফুলের অবকাশে
নির্বিঘ্নে শুঁকেছি কতবার ;
শিশিরে সূর্যের আলো তোমার চোখের দীপ্ত মণি
সে ছিল আমার ভালবাসা—
হৃদয়ের গভীরে এখন
কেবলি সমৃতির যাওয়া আসা।

আমাকে ডেকো না তুমি আর ;
মনের বিক্ষুব্ধ হাওয়া দ্বার থেকে দ্বারে
কখনো না যদি যেতো আর !
অথবা দিগন্ত যদি না হতো এ অনন্ত বাধার
ওই রুদ্ধ দ্বার !

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাব্যের জগতে আধুনিক কবিরা বিচিত্র গতিতে সঞ্চরণশীল। তাই তাঁদের কাব্যের ক্ষেত্রও যেমন প্রশস্ত তেমনি তাদের চিন্তার পরিধিও বিস্তৃত। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনেক কবিই সচেতন ; তাই, ইতিপূর্বে আবুল কাসেম শা'বীকে জীবন সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেও দেখেছি। শিল্প সচেতনতা এবং আত্ম-অভিজ্ঞান সম্পৃক্ত কবির পক্ষেই এমন সোচ্চার হওয়া সম্ভব ; অন্যথায় নয়। সৃজনশীল শিল্পসম্পদ কবির পক্ষে কতটা গর্বের বস্তু আল-ফায়তুরীর 'ইলা নাফসি' (সত্তার প্রতি) কবিতায় তা মূর্ত। আত্মোপলব্ধির এও এক চরম পরাকাষ্ঠা :

পৃথিবী আমার কাছে চির পদানত ;
আমি কিন্তু পদানত হইনি জীবনে।

যন্ত্রণার কঠিন পাথর
মর্মীর বিস্ময়ে
আমার সর্বাঙ্গে শিলীভূত।

বিজয়ের দিনগুলো আমার কাফন।

না,' দৈত্য-দানব
আমার রক্তের অনুষঙ্গে
জীবন্ত বিস্ময় ;
শিরার ঘর্ষণে শিরা জীবনের চিত্রার্পিত ছবি।
বিপন্ন দেবতা আর লোকোত্তর প্রস্তর-প্রতিমা
সমস্ত শক্তির সমন্বয়ে
নিশ্চিত নোয়াবে শির আমার সত্তার সন্নিধানে।

আল-ফায়তুরীর সমবয়সী মিশরের আর একজন কবি বদর শাকের আস্-সাইয়্যাব-এর জীবন-কেন্দ্রিক ধারণাও সুস্পষ্ট। জীবরান-দর্শনে 'এক কণা বালিই মরুভূমি' যদি সর্বজনগ্রাহ্য হয় তবে কবির সামান্য জীবন কাল 'অনন্ত কালের গতিধারা' বলেও বদর শাকের আস্-সাইয়্যাব গর্ব অনুভব করেন। এই গর্ববোধের মূলে তাঁর সার্থক শিল্পচেতনা বা জীবনবোধ। মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, যদি সেই জীবন শিল্প-সমৃদ্ধ থাকে। আসলে, শিল্পহীন জীবনই মৃত্যু বরণ করে। কবির মতে শিল্পসমৃদ্ধ জীবনের উপর মৃত্যু অনন্তকাল বিজয়পতাকা তুলে ধরে রাখে। এই শিল্পদর্শনই আধুনিক আরবী কবিতাকে কালোত্তীর্ণ করতে প্রয়াসী। বদর শাকের আস্-সাইয়্যাবের 'বাহর ওয়াল মাউত' (নদী ও মৃত্যু) এমনি শিল্পচেতনার জ্বলন্ত স্বাক্ষর:

আমার এ জীবনের কুড়িটি বছর
অনন্ত কালের গতিধারা।

একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার:
মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারি পেতে পারি আমি
যোদ্ধার সম্মান।

আমার এ উদ্যত বাহুর
নির্মম বুলেট
নির্বিঘ্নে ছুঁড়তে পারি ভাগ্যের মুখের
স্থির দৃষ্টি পটে।

একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার:
ডুবে যেতে পারি
অন্তহীন রক্তের সাগরে
মানবীয় বোঝা নিয়ে মনুষত্বে একাকার হয়ে।

জীবনের দ্বার উন্মোচনে
বিজয়পতাকা দেখি আমার মৃত্যুর
উপরে উড্ডীন।

স্বাজাত্যবোধ ও ঐতিহ্য-চেতনাও আরবী কবিতায় সংগুপ্ত। এই চেতনার পশ্চাৎভূমি দেশ-জাতি-রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত। তাই কবিরা যখন সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ওঠেন তখনই তাঁদের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করে যন্ত্রণার কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। এ মুক্তি তাঁদের অন্তরাত্মার মুক্তি নয়—এ মুক্তি তাঁদের শিল্প-স্বাধীনতার জয়গান। এই গানকে জীবন্ত রাখার পক্ষে কবির চেতনার শিকড় ক্রিয়াশীল এবং নৈরাশ্যের প্রাচীরও সে গানের বিরুদ্ধে উপেক্ষণীয়। কবি যেন নৈরাশ্যের অন্তরালে আশার স্বপ্নে মগ্ন হন। এমনি চেতনাবোধই কালের কণ্ঠে 'আননিদা' (ডাক) শোনায়। ফেলিস্তিনের মহিলা কবি ফাদওয়া তাউকান্-এর উচ্চকণ্ঠ সবাইকে 'আন্নিদা' (ডাক) দিয়ে যায়:

আমার আত্মার বুলবুল
যন্ত্রণার কারাগারে বন্দী হয়ে আছে।
তার সে পাখার ঝাপটানি
নিশ্চিত ইচ্ছার ডিম গুঁড়ো করে নিজের অজান্তে।

অজানাকে জানার আকৃতি
ভেঙ্গে ফেলে ক্রোধে—
চারপাশে ঘেরা সেই নিঃসঙ্গ দেয়াল।

এবং সে নির্জনতা ছিন্ন করে শুধু
ডাক আসে, ডাক
সুদূরের বিজয়ের ডাক।

ইরাকের মহিলা কবি নাজিক আল্-মালাইকা স্বাজাত্যবোধে আরও সচেতন। তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে মিথ্যার উপরে কৃত্রিম সত্যের খোলস আরোপ করার বিরুদ্ধে। তিনি আসল সত্যের মুখ দেখার প্রত্যাশী—সত্যের নামে কুচক্রী মিথ্যা তাঁর রুচিবিরুদ্ধ। তাই তাঁর বক্তব্যে ও মেজাজে একটা সংবেদনশীল আর্তি বিরাজিত। নিজের দেশে থেকে যদি নিজের কথা বলা না যায় তবে তা প্রবাসীর

ভূমিকা পালন করে। নাজিক আল্-মালাইকাহ্-এর 'ওয়াতানাস্ সেরর' (অজ্ঞাত বাসভূমে) কবিতায় এক কঠিন প্রশ্ন :

॥ ১ ॥

সৌন্দর্যের স্বর্গবলে একদা ভেবেছি এই দেশ :
যেখানে অমৃত শুধু বৃষ্টির জলের সমন্বয়ে—
এবং সর্বাঙ্গে যার গোলাবের জাজিম বিছানো
সমস্ত শরীর জুড়ে নিটোল যৌবন সোনামোড়া।

এমন যে দেশ আহা! যা নাকি সকল মানুষের
বিদগ্ধ ক্ষতের লগ্নে নিরাময়ী আশ্চর্য মলম—
আমার ইচ্ছার বৃত্তি। অথচ পেয়েছি কতটুকু?
তা হলে কোথায় আছি, এ কোন্ অজ্ঞাত বাসভূমে?

॥ ২ ॥

কোথায় সে দেশ? বলো, কোথায় কোথায়?
দু'চোখে কি দেখবো তা? লেফাফার অন্তরালে তা কি
কোনোও গোপন চিঠি? ভিতরে নীরব যত কথা?
অথবা অনড় ঠোঁটে শব্দহীন নির্জন প্রার্থনা?

কোটি কোটি জনতার বাত্যাক্ষুব্ধ ইচ্ছার আগুন
লেলিহান শিখা হয়ে নিরবধি জ্বলে আর জ্বলে।
দ্বার খোলো, ওগো তুমি দ্বার খোলো আজ ;
না হলে কোথায় আছি? এ কোন্ অজ্ঞাত বাসভূমে?

আধুনিক আরবী কবিরা কাব্য তথা শিল্পকে দেখেন দেহের অনুষঙ্গে। দেহের সঙ্গে এই যোগসাজসই তাঁদের চৈতন্যকে আরও তীব্রতর করে। তাই কোন দলননীতি বা বিরুদ্ধ পরিবেশ যখন তাঁদের পারিপার্শ্বিকতাকে বিষিয়ে তোলে তখন কবি হন বিদ্রোহী, যুদ্ধং দেহী। যেহেতু কবিতা

সুকুমার শিল্প সেহেতু এর লালনেও সুকুমার বৃত্তির প্রয়োজন। তাই দলন-নীতির বিরুদ্ধে কবির চ্যালেঞ্জ এবং কোন বাধাই সে মানতে রাজী নয়। প্যালেষ্টাইনের 'লোটাস পুরস্কারপ্রাপ্ত' কবি মাহমুদ দারবীশ (১৯৭০ সালে কবিকে 'লোটাস' পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত করা হয়) এমনি এক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন 'আখির আল্-লায়াল' (রাত্রিশেষ)-এর কবিতায় :

আমাকে বাঁধতে পারো, পারো যা যা খুশি
কেড়ে নিতে পারো এই কবিতার খাতা
এবং মুখের সিগারেট
এমন কি মুখের বিবরে
দিতে পারো কর্দমাক্ত দুর্গন্ধ সে জল।

কবিতা আমার এই হৃদয়ের রক্তের কণিকা
রুটির লবণ আর দু'চোখের অশ্রুসিক্ত জল।

আমার সমস্ত নখ, দু'চোখের মণি
ধারালো হাতের তরবারি
নির্ভয়ে কবিতা লেখে কালের খাতায়।

বুকের ভিতরে আমি নির্বিঘ্নে লালন করি এক।
সহস্র গানের বুলবুল—

তাদের সে গান
আমার দু'কানে যেন যুদ্ধের সঙ্গীত।

মিশরের ইব্রাহীম নাজীর মন্তব্যে কবিতার সংজ্ঞা আরও অর্থবহ। তিনি বলেন : 'কবিতা আমার কাছে জানালা স্বরূপ। এই জানালায় দৃষ্টিনিবদ্ধ করে আমি জীবনকে দেখি, অনন্তর আমার সম্মুখে যা প্রতিভাত হয় সব কিছু দেখার মূলেই এই কবিতা। কবিতা এমন বায়ু যা থেকে আমি নিঃশ্বাস নিই, কবিতা এমন প্রলেপ যা ক্ষতস্থানকে নিরাময় করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মতাদর্শ কাব্য-কর্মকে যে বিস্তৃতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় তাতে সন্দেহ নেই। কাব্যকলাকে সমৃদ্ধ করার পক্ষে এমন নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও আত্ম-অভিজ্ঞান খুবই কার্যকরী।

ইবরাহীম নাজী তাঁর 'লায়ালিল কাহিরা' কাব্যগ্রন্থের 'ইলাল মুজমার' (বাঁশির প্রতি) কবিতায় যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতেও কবিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। উপরের মন্তব্যে তিনি 'জানালার' রূপকে কবিতাকে চিত্রিত করেছেন এবং 'ইলাল মুজমার' কবিতায় 'বাঁশিকে তিনি কবিতার রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রূপকে তফাৎ থাকলেও মূল বক্তব্য একই এবং উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনবোধ বা শিল্প-চেতনা প্রকট। 'বাঁশির প্রতি' কবিতার কিছু অংশ:

কবিতা বাঁশির প্রতিনিধি।

সেই বাঁশির মধুর সুরে
জীবনের গান বেজে ওঠে।

এবং সে গানে ওঠে নামে
আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিরবধি।

কবিতা জীবনের স্রোত
এই স্রোতাবেগের আবর্তে
শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

কবিতা কবির দীর্ঘশ্বাস
যে দীর্ঘশ্বাস মানুষের
অনন্ত প্রেম ও বিরহের সাক্ষী।

আরবী কবিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আধুনিক আরবী কবিতা শুধু সমৃদ্ধ নয়, বৈশিষ্ট্যময়। আরবী কবিতার বিস্তৃতি ও সাফল্যে আধুনিক আরবী কবিদের শৈল্পিক উপাদান সংগ্রহ ও সেসবের যথাযথ প্রয়োগ সত্যি প্রশংসনীয়।

প্রখ্যাত সমালোচক জন বার্তন আধুনিক আরবী ভাষার নবরূপায়ণ এবং কাব্যশাখার সমৃদ্ধির দিক লক্ষ্য করে যথার্থই বলেছেন :

'The language, 'like a faithful wife, following the mind and giving birth to its offspring' and free from that 'language of particles' which dogs our modern tongues, leaves a mysterious vagueness, between the relation of word to word, which materially assists the sentiments, not sense, of the poem. When verbs and nouns have—each one—many different significations, only the radical or general idea suggests itself. Rich and varied synonyms, illustrating the finest shades of meaning, are artfully used ; now scattered to strike us by distinctness ; now to form, as it were, a star, about which dimly seen satellites revolve.'

গবেষণা ও প্রবন্ধ সাহিত্য

আরবী মননশীল রচনা, গবেষণা ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎসকেন্দ্র এবং পটভূমি যে পবিত্র কুরআন ও হাদিস এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। কেননা পবিত্র কুরআন ও হাদিসকে কেন্দ্র করেই দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমালোচনা, আইন, ব্যাকরণ, সাহিত্য ইত্যাদি উৎসারিত। মুসলিম পণ্ডিত ও ইতিহাস-বেত্তাদের মতে পবিত্র কুরআনে রয়েছে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়সমূহের পূর্ণ সমাবেশ :

১. বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (ইলমুল তফসির)
২. সমালোচনা রীতি (ইলমুল কিরা'ত)
৩. ধর্ম ও ইতিহাস-বিজ্ঞান (ইলমুল হাদিস)
৪. আইনশাস্ত্র (ইলমুল ফিক্‌হ)
৫. ধর্মসম্পর্কিত তত্ত্ববিজ্ঞান (ইলমুল কালাম)
৬. ব্যাকরণ (ইলমুল নাহ্‌ব)
৭. অভিধান সংকলন রীতি (ইলমুল লুগা)
৮. অলঙ্কার শাস্ত্র (ইলমুল বয়ান) এবং
৯. সাহিত্য (ইলমুল আদাব)।

উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনভিত্তিক বিষয়সমূহ ছাড়া মুসলমানগণ বহিঃ-বিশ্ব থেকে যে-সব বিষয় আয়ত্ত করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১. দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত তর্কবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি, (আল ফালাসাফা)
২. জ্যামিতি, বীজগণিত, কারিগরী বিদ্যা, ইত্যাদি (আল-হানদাসা)
৩. জ্যোতিষশাস্ত্র (ইলমুন্‌ নুজুম)
৪. সঙ্গীতবিদ্যা (ইলমুল্‌-মুসিকী)
৫. চিকিৎসাবিজ্ঞান (আত্‌ তিব্‌ব)

৬. যাদুবিদ্যা (আস-সিহ্‌র)
৭. রসায়নবিদ্যা (আল্‌-কিমিয়া) ইত্যাদি।

আরবী মননশীল রচনা ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের রূপকারগণ প্রাথমিক অবস্থায় তাঁদের রচনার পরিসর বিস্তৃত করেন পবিত্র কুরআন ও হাদিস-কেন্দ্রিক গবেষণা-সমৃদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় রাসূলে করীমের চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আর কেউ অগ্রসর হন নি। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের গবেষণায় প্রভাবান্বিত হয়ে নবম শতাব্দীতে পবিত্র কুরআনের ব্যাখায় তৎপর হন আল্‌-তাবারী (মৃত্যু: ৯২২ খ্রীষ্টাব্দ)। পরবর্তী সময়ে যাঁরা এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের সবাই আল্‌-তাবারীর গবেষণার উপর নির্ভরশীল ছিলেন অতিমাত্রায়। প্রসঙ্গতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে জারুল্লাহ জামাখ্‌শারী (মৃত্যুঃ ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত 'আল্‌-কাশ্‌শাফ', ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আল্‌-বায়দাবী (মৃত্যুঃ ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত 'আনওয়ার উত্‌ তানজিল ওয়া আসরারুত্‌ তাবিল' এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে আস্‌-সুয়ূতী (মৃত্যুঃ ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত 'আল্‌-ইতকান' গ্রন্থের নাম করা যায়। বিশ্ববিখ্যাত এই তিনটি গ্রন্থই পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ গবেষণার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

পবিত্র হাদিসের সংকলক, ব্যাখ্যাকার ও টীকাকার হিসেবে আল-বুখারী (মৃত্যুঃ ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ), মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ (মৃত্যুঃ ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ), আবু দাউদ (মৃত্যুঃ ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ), আবু ইসা মুহম্মদ ইবন আত তিরমিজী (মৃত্যুঃ ৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ), আন্‌-নাসায়ী (মৃত্যুঃ ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ), এবং ইবন আল্‌-মাজা (মৃত্যুঃ ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়। এই ছয়জন পণ্ডিতব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল 'আল্‌-কুতুব-উস্‌-সিত্তা' বা 'সিহা সিত্তা' নামে পরিচিত।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, প্রাথমিক অবস্থায় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের রূপকারদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র কুরআন ও

হাদিসের শিক্ষা এবং ইসলামের অমিয় শান্তির বাণী বহিঃবিশ্বে পৌঁছে দেওয়া। ফলে, তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র কুরআন ও হাদিস-কেন্দ্রিক।

রাসূলে করীমের মৃত্যুর পর পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে রাসুলে করীমের জীবনাদর্শ সম্বলিত আত্মচরিত রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন কিছুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ ইবন ইসহাক আবু আবদুল্লাহ্ (মৃত্যু: ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ), ইবন হিশাম (মৃত্যু: ৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ), আল্-ওয়াকিদী (মৃত্যু: ৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ইবন আস সা'দ (মৃত্যু: ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইবনে ইসহাকের অমর গ্রন্থ 'অল্ হায়াতু রাসূল আল্লাহ্' (আল্লার রাসূলের জীবনচরিত) আরবী সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনার প্রথম পদক্ষেপ। গ্রন্থটিতে রাসূলে করিমের সামগ্রিক জীবন-আলেখ্য এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, মুসলমানদের জাতীয় সম্পদ হিসেবে তা সমগ্র বিশ্বে আলোড়নের সৃষ্টি করে। অনুরূপ ভাবে আল-ওয়াকিদীর 'কিতাবুল মাগাজী' (যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস) এবং ইবন অস্-সা'দের 'কিতাবুল তাবাকাত-উল-কাবির' গ্রন্থদ্বয়ে রাসূলে করিমের জীবন-আলেখ্য ছাড়াও আরবের সমাজচিত্র, রাসূলে করীমের সাহাবীদের জীবন-আদর্শ এবং মুসলিম ঐতিহ্য রক্ষার্থে যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুবৃহৎ পনেরো খণ্ডে সমাপ্ত 'কিতাবুল-তাবাকাত-উল-কাবির' গ্রন্থটিতে রাসূলে করীমের ভবিষ্যৎ অনুসারী বা 'তাবেঈন'দের প্রতিও নীতিবাক্য রয়েছে।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী আল-তাবারীও রাসূলে করীমের জীবনপ্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসম্বলিত অনেক ঐতিহাসিক রচনার অবতারণা করেন। সেইসব রচনায় রাসূলে করীমের ধর্মীয় জীবন ছাড়াও ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা আমাদেরকে বিমুগ্ধ করে। তদুপরি আল-তাবারীর রচনা-বৈশিষ্ট্যেও তাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে নমুনা হিসেবে আল-তাবারীর রচনার কিয়দংশের অনুবাদ পেশ করছি :

"আল্লার রাসূল এবং তাঁর অনুচরবর্গ আদেশ দিয়েছিলেন যে, সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত আক্রমণ শুরু করা উচিত নয়, এবং শত্রুপক্ষ যে পর্যন্ত না তীর-ধনুক-সজ্জিত হয়ে অগ্রসর হয় তাব পূর্বেও আক্রমণ পরিচালনা করা নিষিদ্ধ।

রাসূলে করীম রণক্ষেত্রে অবস্থান করলেন। তাঁর পাশে কাঠের চৌকিতে রইলেন আবুবকব, যাতে তাঁরা যুদ্ধ-দৃশ্য অবলোকন করতে পারেন।

আবু গা'ফার-এব মতে বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবাবে, রমজান মাসের সাতাশ তারিখে। রাসূল আল্লাহ্ তাঁর অনুগামীদের সম্মুখে সামরিক দণ্ড হাতে নিয়ে সামনে পিছনে পায়চারী কবতে থাকলেন আদেশ দেওয়ার প্রতীক্ষায়। যখন তিনি সাবাদ ইব্‌ন গাজীয়্যার নিকটবর্তী হলেন, দেখতে পেলেন যে, সাবাদ ইব্‌ন গাজীয়্যা লাইনচ্যুত হয়ে আছেন। তাঁর পেটে সামরিক দণ্ডেব খোচা দিয়ে রাসূলে করীম বললেন, 'সাবাদ, লাইনবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও।'

সাবাদ উত্তব দিলেন, 'হে আল্লাহ্‌ব বাসূল, আপনি আমাকে আঘাত কবেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে পাঠিয়েছেন সত্য প্রচারেব জন্য; আপনি ববঞ্চ আমাকে চালিত করতে পারেন।'

আল্লার বাসূল তাঁর বক্ষ উন্মোচন কবে বললেন, 'সাবাদ প্রতিশোধ নাও'।

আর সাবাদ হাতেব অস্ত্র ফেলে দিযে আল্লার রাসূলকে চুমো খেলেন।

আল্লার রাসূল বললেন, 'সাবাদ, তুমি কেন এমন করতে গেলে?'

সাবাদ উত্তর দিলেন, 'হে আল্লার রাসূল, আমার আঘাত যদি গভীব হতো এবং আমি যদি সত্যই মারা যেতাম তবে আমার শরীরের গোস্ত আপনাকে স্পর্শ করে যাক এই আমার কাম্য।'

আল্লার রাসূল সাবাদের মঙ্গল কামনা করলেন এবং মঞ্চে ফিরে গেলেন। আবুবকর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

রাসূলে করীম অনেক-ঈশ্বরবাদীদের অস্ত্রের শক্তি নিজেদের শক্তির সঙ্গে তুলনা করলেন এবং সৈন্যসংখ্যা তিন শতের অধিক দেখতে পেলেন না। তিনি সত্যের পথে স্থির রইলেন এবং আল্লার কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার প্রার্থনা করলেন। তিনি আল্লার কাছে এই বলে ফরিয়াদ জানালেন যে, বিশ্বাসীরা যদি এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে তাঁকে উপাসনা করার জন্যে এ পৃথিবীতে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি তাঁর আলখেল্লা মাটিতে না পড়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রার্থনায় রত রইলেন এবং আবুবকর তাঁর আলখেল্লা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'হে আল্লার রাসূল, আপনি যথেষ্ট প্রার্থনা করেছেন, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করবেন।'

আল্লাহ্ তাঁর দূতের মাধ্যমে তখন এই অংশ পাঠালেন: 'তুমি যদি তোমার প্রভুকে ডাকো, নিশ্চয়ই তিনি সাড়া দেবেন। আমি তোমার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ঘোড়ায় চালিত করে হাজার হাজার ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করবো।'

ধ্যান শেষ হলে তিনি আবুবকরকে বললেন, 'আল্লার বিজয় আমাদের হাতে। আমাদের মাঝে জিবরাইলকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি ঘোড়ায় চড়ে জিন ধরে পরিখা বেষ্টন করে আছেন।'

সেই মুহূর্তে শত্রুপক্ষের তীর এসে ওমর ইবনে খাত্তাবের ক্রীতদাস আল্-মাহজীর বুকে বিদ্ধ হলে সে মারা গেল। আল্-মাহজীই মুসলিম জগতের প্রথম শহীদ।

বানু আদি ইবনে নাজার গোত্রের হারিস ইবন সুরাকা তাকে অনুসরণ করলে সেও কুয়োয় ডুবে মারা গেল। আল্লাহ্‌র রাসূল সাহস ও শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সৈন্যদের সম্মুখে হাজির হলেন। তিনি বললেন, 'যাঁর হাতে আমার আত্মা নিহিত সেই আল্লাহ্‌র শপথ। তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করে মৃত্যু বরণ করবে আল্লাহ্ তাদের জন্য বেহেশ্‌ত নির্ধারিত করে রেখেছেন।'

উমর ইব্‌ন আল্‌ হামাম এই সময়ে খেজুর খাচ্ছিলেন, তিনি মস্তক উন্নত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ও বেহেশতের মধ্যে কি মৃত্যুর হাতই ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে?' তিনি হাতের খেজুর ফেলে দিয়ে অস্ত্র তুলে নিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই গান গেয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন :

তীর ছাড়া কেউ যেওনা আল্লার কাছে
এবং যেওনা প্রেম ছাড়া কোনোদিন;
তীর নিয়ে গেলে আল্লাহ্‌ নীরবে হাসে
এবং দেখায় সত্যে রাঙানো পথ।

এবং ইবনে আফরা রাসূলে করীমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌ তাঁর দাসদের মুখে কি দেখলে হেসে ফেলেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'শত্রু পরাজিত করে তার রক্তে হাত ডুবালে আল্লাহ্‌ অধিক খুশী হন এবং সেই খুশীই তার হাসি।'

এইকথা শুনে ইবন আফরা গায়ে লোহার বর্ম জড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন।

আল্লাহ্‌র রাসূল এক মুঠি বালি হাতে নিয়ে বিরোধীদলীয় কোরাইশদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, 'তাদের মুখ বিকৃত করা হলো।' অতঃপর তিনি অনুচরদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে বাধা দিতে উৎসাহিত করলেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিরোধীদলীয়রা নিশ্চিহ্ন হতে থাকলো বহুল পরিমাণে এবং এই অভিযান কোরাইশদের পরাজয় টেনে আনলো।

আল্লাহ্‌র রাসূলকে যাঁরা পাহারা দিতেছিলেন এবং শত্রুপক্ষদের মঞ্চের দিকে আসা প্রতিহত করছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সা'দ ইবন মা'আজ। এবং আল্লাহ্‌র রাসূল লক্ষ্য করলেন যে, মঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে এবং সৈন্যদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে সা'দের মুখে ভাঁজ পড়ছে।

'মনে হচ্ছে আমাদের সৈন্যদের কাজ তুমি ঘৃণা করছো', তিনি বললেন।

'হ্যাঁ', সা'দ উত্তর দিলেন।

'হ্যাঁ, আল্লার রাসূল, এই প্রথমবারের মত আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং যুদ্ধে আঘাতের মাত্রা এত প্রবল যে, শত্রুদের বন্দী করার চেয়ে এটা অনেক ভালো।'

সেইদিন আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁর সাহাবীদের বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে বানু হিশাম অনিচ্ছাকৃতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। আমাদের সৈন্যরা যেন কাউকে নিষ্কৃতি না দেয়। তবে আবু আল্ বুখতুরী ইব্‌ন হিসাম এবং অনুরূপ আমার চাচা আবদুল মোত্তালিবকে রেহাই দেওয়া উচিত।'

এবারে মুগাদার বানু জায়াদ উপলব্ধি করলেন যে, আল বুখতুরীর সম্মুখীন হতে হবে এবং সম্মুখীন হতে হবে মক্কার তার এক বন্ধু গানাদা ইব্‌ন তাববার সঙ্গে। বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র রাসূল তোমার হত্যা নিষেধ করে দিয়েছেন।'

আল্ বুখতুরী মুগাদারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সম্পর্কে কি খবর?'

মুগাদার উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তাকে রেহাই দেওয়া হবে না। আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের আদেশ করেছেন কেবল আপনাকে রক্ষা করতে।'

আল্ বুখতুরী বললেন, 'তা'হলে আমরা দু'জন একত্রেই মরবো। কোন কোরাইশ রমণী যেন আমাকে বলতে না পারে যে, জীবনের মায়ায় সে তার বন্ধুকে রেখে গেছে।'

এবারে তিনি যুদ্ধের তরবারি হাতে তুলে নিয়ে গানের সুরে বলতে থাকলেন :

সৎ ছেলে পরে মাথায় খ্যাতির তাজ
নিজে মরে তবু মরতে দেয় না নাম।

মুদাগার তাঁকে হত্যা না করা পর্যন্ত যুদ্ধচালিয়ে গেলেন।"

আল্‌-তাবারীর রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রত্যেকটি ঘটনাকে সাজিয়েছেন কালানুক্রমিক ভাবে। ফলে, লেখা পড়তে গেলে মনে হয়, পাঠক-পাঠিকা যেন তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করছেন।

আল-তাবারীর ঐতিহাসিক রচনার অন্যতম অংশ আব্বাসীয় বংশের ত্রয়োদশ খলীফা আল্‌-মুতওয়াক্কিল-এর জীবনকাহিনী; যা শুধু চিত্তাকর্ষক নয়, বড়ই করুণ।

আল্‌-মুতওয়াক্কিল ছিলেন অতিমাত্রায় জাঁকজমকপ্রিয় এবং সঙ্গীতশিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজকোষ শূন্য করে ফেলেন। রাজদরবারের একদল বিরুদ্ধবাদী লোক তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ করার জন্যে সচেষ্ট হয়। তারা আল-মুতওয়াক্কিলের বড় ছেলে আল্‌-মুনতাসিরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

আল্‌-মুতওয়াক্কিল কিন্তু তাঁর অন্যতম প্রিয়তমা স্ত্রী কাবিহা ও তাঁর গর্ভজাত সন্তান আল্‌-মু'তাজকে বেশী ভালবাসতেন। আল্‌-মুতওয়াকিকল যখন আল্‌-মু'তাজকে খলীফার পদ প্রদান করতে যাবেন তার পূর্ব মুহূর্তে আল্‌-মুনতাসির তুর্কি নাবীদের সহযোগিতায় বাবাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন।

আল্‌-তাবারীর শক্ত লেখনীতে এই ঐতিহাসিক সত্য জীবন্ত হয়ে রূপলাভ করেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিক অবস্থায় আরবী সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ ও মননশীল রচনায় ধর্মীয় প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায় অধিক মাত্রায়। নবম শতাব্দীর প্রতিভাবান লেখক আল্‌-জাহিজ (মৃত্যু: ৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)-এর রচনায় ভিন্ন সুর লক্ষিত হলেও উপদেশাবলী এবং নীতি কথায় আকীর্ণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'কিতাবুল হাউয়ান' (জন্তুর কাহিনী), 'কিতাবুল-বয়ান ওয়াত তাবীন' (সং ব্যবহার ও সংচরিত্র) এবং 'কিতাবুল বাখিল' (কৃপণদের কাহিনী) প্রভৃতি প্রধান।

বলা যায় যে, 'কিতাবুল হাউয়ান' গ্রন্থে তিনি আসল জীব-জন্তুর কাহিনী যতটা অবতারণা করেছেন তার চেয়ে বেশী চিত্রিত করেছেন জন্তু-জানো-

য়ারের রূপ ধর্মী মানবচরিত্রের ব্যাখ্যা। বসরার বিচারক ইবন সাব্বার-এর বিচারপদ্ধতিতে নীতির চেয়ে যে দুর্নীতিরই প্রাধান্য ছিল এই তত্ত্বকথাই ব্যক্ত হয়েছে 'কিতাবুল হাউয়ান' গ্রন্থে।

অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ 'কিতাবুল বয়ান ওয়াত্ তাবীন' গ্রন্থ। 'কিতাবুল বাখিল' গ্রন্থে তিনি কৃপণদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যময় চরিত্র অঙ্কন করেছেন। কৃপণগণ দান-খয়রাতকে মনে করে বাহুল্য; কষ্টই তাদের জীবনের প্রধান সম্বল; প্রশংসা বা সমালোচনা তাদের নীতিবিরুদ্ধ। এমনিতর ব্যাখ্যায় গ্রন্থটি ভারাক্রান্ত।

আল-জাহিজ মুতাজিলা মতবাদভুক্ত। এ কারণে তাঁর রচনায় মুতাজিলা দর্শনেরও পরিচয় বিধৃত। চেহারাগত বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিত ও কদাকার। খলীফা আল্-মুতাওয়াক্কিল একবার তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করার অভিপ্রায়ে আল্-জাহিজকে ডেকে পাঠান কিন্তু চেহারাগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই আঘাতই আল্-জাহিজকে প্রতিভাবান লেখক হতে সাহায্য করে।

তাঁর অমর গ্রন্থ 'কিতাবুল হোসন্' (সৌন্দর্যের রূপরেখা)-তে তিনি মানুষের আসল সৌন্দর্য যে চেহারাগত বৈশিষ্ট্য নয়—এই কথাই ব্যক্ত করেছেন। 'কিতাবুল হোসন' অনবদ্য রচনা হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত।

নবম ও দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আর একজন প্রতিভাবান লেখক ইব্‌ন আব্দ রাব্বিহী (৮৬০-৯৪০)। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ইক্‌দ-উল-ফরীদ' (মূল্যবান হার)। পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থে তিনি ইসলামের ইতিহাস, খলীফাদের জীবনী এবং আরবী কবিতার সংকলন ইত্যাদির সমন্বয়সাধন করেছেন। প্রত্যেকটি অধ্যায় তাঁর মতে এক-একটি হীরকখণ্ড এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় সেই হীরকখণ্ডশোভিত মালার মধ্যমণি বা 'লকেট'। এখানেই তাঁর অমর গ্রন্থ 'ইক্‌দ উল ফরীদ' নামকরণের সার্থকতা।

দশম শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী ইতিহাসবেত্তা এবং মননশীল রচনার রূপকার আল-মাসুদী (মৃত্যু: ৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর জ্ঞান শুধু পুথিপুস্তকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকেও তাঁর জ্ঞান ছিল পরিশীলিত। তিনি ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইরান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করেই ক্ষান্ত হননি; বরঞ্চ সেইসব দেশে ব্যক্তিগতভাবে ভ্রমণ করেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ফলে তাঁর রচনা শুধু সমৃদ্ধই হয় নি, হয়েছে সুপাঠ্য। তাঁর অনবদ্যগ্রন্থ 'মুরুজ উদ্ দাহাব' (স্বর্ণের ক্ষেত), 'আখবার উজ-জামান' (কালের ইতিহাস), 'কিতাবুল আউসাত' (সংক্ষেপকারী ও উপদেষ্টার গ্রন্থ), 'কিতাবুত্ তানবিহ্ ওয়াল ইশরাফ' (উপদেশ ও সমালোচনা গ্রন্থ) প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের গৌরবের বস্তু।

'মুরুজ-আদ্-দাহাব' গ্রন্থে আল মাসুদী পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস থেকে ইসলামের ইতিহাস সহ উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলীফাদের জীবনবৃত্তান্ত অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন তাঁর শক্ত লেখনীতে। সৃষ্টিতত্ত্ব রহস্য সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা এইরূপ:

'মহান আল্লাহ্‌র প্রথম সৃষ্টি পানি। সেই পানির উপরে ছিল আল্লাহ্‌র আসন। যখন তিনি মানব সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, সেই পানিতে তিনি ধূম্রের আবির্ভাব ঘটালেন। পানির উপরে ধূম্র কুণ্ডলী পাকাতে থাকলো এবং সেই ধূম্র থেকে তিনি আকাশ সৃষ্টি করলেন। পানি শুকিয়ে গেলে মাটি সৃষ্টি হলো। অতঃপর তিনি তা সাত স্তবকে বিভক্ত করলেন। এই কাজ সমাধা করতে আল্লাহ্‌র দুইদিন লাগলো—রবিবার এবং সোমবার।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যে চারদিকে কেবল পানি আর পানি ছিল পৃথিবীর সব ধর্মেই এ কথার স্বীকৃতি রয়েছে। পবিত্র কুরআনেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। আল-মাসুদীর রচনাও পবিত্র গ্রন্থে সমর্থিত।

আল্-মাসুদীর সবগুলো রচনাই পরিচ্ছন্ন এবং ঐতিহাসিক সত্যে সমৃদ্ধ। এ কারণে তাঁকে 'আরবের হেরোডটাস' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক ইবন খলদুন কিন্তু আল্-মাসুদীকে বলতেন 'ইমামুল মুয়ারিখীন' অর্থাৎ ঐতিহাসিকদের নেতা।

আব্বাসীয় যুগের অন্যান্য মননশীল রচনার রূপকারদের মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য হলেন আল-উত্বী (মৃত্যু: ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), আল খাতিব (মৃত্যু: ১০৭১), ইমাদউর্-দীন ইসফাহানী (মৃত্যু: ১২০১), ইবনুল কিফ্তী (মৃত্যু: ১২৪৮), ইবনুল জাওজী (মৃত্যু: ১২০০), ইবন আল আত্হীর (মৃত্যু: ১২৩৪), ইবন আবি উসায়বিয়া (মৃত্যু: ১২৭০) প্রমুখ।

এঁদের মধ্যে আল উত্বীর 'কিতাবুল ইয়ামিনী' (ইয়ামেনের ইতিহাস); ইবন আবি উসায়বিয়ায 'উয়ূন উল্ আনবা' (সময়ের দর্পণ); ইবন আল্ আতহিরের 'কিতাবুল কামিল ফিত্ তারিখ' (ইতিহাসের আলোকে সাফল্য), 'ওসুদুল গাবা' (জঙ্গলের সিংহ)', 'কিতাবুল আনসাব' (নীতির গ্রন্থ) প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, আইয়্যামে ইসলামিয়া, উমাইয়া কিংবা আব্বাসীয় যুগের সব আরবী লেখকদের রচনার বিষয়বস্তুই হয় ইতিহাস-ভিত্তিক কিংবা ধর্মীয় আলোকে উদ্ভাসিত। উপরে উল্লেখিত ইবন আল আতহিরের 'ওসুদুল গাবা' গ্রন্থের নামকরণেই বোঝা যায় এতে ভিন্ন স্বাদের উপলব্ধি রয়েছে। আসলে 'জঙ্গলের সিংহ' সম্পর্কে কোন আলোকপাতই তিনি করেন নি উক্ত গ্রন্থে। তাঁর রচনা প্রতীক-আশ্রিত এবং তিনি উক্ত গ্রন্থে রাসূলে করীমের সাত হাজার পাঁচ শত সাহাবীর জীবন-আলেখ্য এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে, তাঁরা যেন প্রত্যেকে এক-একজন জীবন্ত সিংহ।

আব্বাসীয় যুগ যে আরবী সাহিত্যের গৌরবময় যুগ এ সম্পর্কে আগেও ইংগীত দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক রচনা ছাড়াও বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, ভূতত্ত্ব বা ভূগোল সম্পর্কিত রচনার অপূর্ব সমাবেশও এই যুগে বিদ্যমান।

ভূগোলশাস্ত্রে যাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে নবম শতাব্দীর ইবন আল খুরদাদবিহ্, দশম শতাব্দীর আল ইস্তাখরী, ইবন আল হায়কল এবং আল মুকাদ্দাসী এবং দ্বাদশ শতাব্দীর ইয়াকুত ইবন আবদুল্লাহ্

প্রমুখের নাম অবিস্মরণীয়। ইয়াকুত ইবন আবদুল্লাহ্-এর ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 'আল মুজামুল বুলদান', 'মুসতারিখ' এবং 'আল মুজামুল উদাবা' ভূগোলশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান গবেষণায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে আল-কিন্দী (মৃত্যু; ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ), আল-ফারাবী (মৃত্যু; ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ), ইবন সীনা (মৃত্যু; ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দ), ইবন বাজ, ইবন তোফাইল, ইবন রুশদ, আবুবকর আর্ রাজী (মৃত্যু; ৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ), আবু মা'শার (মৃত্যু; ৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ), আলবেরুনী (মৃত্যু; ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দ), ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু; ১১১১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখ প্রধান। এঁদের মধ্যে আল্-কিনদীর 'ফায়লাসুফুল আরব' মুসলিম দর্শন তত্ত্বের গবেষণাসমৃদ্ধ গ্রন্থ; ইবনে সীনাব 'আস্ সীফা' এরিস্টটল, প্লেটো প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাব আলোকে প্রভাবান্বিত পদার্থবিজ্ঞানের তথ্যবহুল আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ এবং আলবেরুনীর 'আসারুল বাকিয়া' এবং 'তারিখউল হিন্দ' গ্রন্থদ্বয় শিল্প ও ঐতিহাসিক তত্ত্বে পূর্ণ।

ধর্মতত্ত্বে নিজস্ব মত প্রচারে আলগাজ্জালীর খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত। একারণে তাঁকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' (ইসলামের সাক্ষ্য) আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ছিলেন সূফী মতাদর্শে বিশ্বাসী। ফলে তাঁর রচনা সূফী-তত্ত্বেই সমৃদ্ধ। তাঁর অমর গ্রন্থ 'ইহ্য়া উলুম ইদ্-দীন' বিশ্বাস, উপাসনা, উপবাস, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অপূর্ব নিদর্শন। ধর্মীয় সংস্কারের আলেখ্য হিসেবেও গ্রন্থটিকে অভিহিত করা যায়।

আল গাজ্জালীর অপর একটি অনবদ্য গ্রন্থ 'মুনকিদ মিনাদ্ দালাল' (ভ্রান্তির প্রচারক) দর্শন-তত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যাকারীদের প্রতি সাবধানবাণীতে সোচ্চার। অনুরূপভাবে তাঁর 'তাহাফুতুল ফালাসীফা' (দার্শনিকদের অকৃত-কার্যতা) গ্রন্থও দর্শনতত্ত্বের সমালোচনাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ।

আব্বাসীয় যুগের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাগদাদের পতন ঘটলে আরবী সাহিত্যেও স্থিতিশীলতা দেখা দেয়। তবুও কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং পরিব্রাজক তাঁদের মননশীল রচনার মাধ্যমে আরবী

সাহিত্যের পূর্ব-খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। এঁদের মধ্যে খাল্লিকান (মৃত্যু : ১২৮২ খৃ:), সম্রাট আবুল ফীদা (মৃত্যু: ১৩৩১ খৃ:), ইবনে খালদুন (১৩৩২—১৪০৬), ইবন আল্ খাতিব (১৩১৩—১৩৭৪), ইবন আল্ বতুতা (১৩০৪—১৩৭৭), আল মাকরিজী (১৩৬৪—১৪৪২), আল দাহাবী (মৃত্যু: ১৩৪৮), আবুস মাহাসীন (মৃত্যু: ১৪৬৯), আল মাক্কারী (মৃত্যু: ১৬৩২), জালাল উদ্দীন আস্-সুয়ূতী (১৪৪৫—১৫০৫), ইবন আল তায়মিয়্যা (১২৬৩—১৩২৮), আশ্‌শারানী (মৃত্যু : ১৫৬৫ খৃ:) প্রমুখ নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের রচনা সমৃদ্ধ। এসবের মধ্যে ইবন খাল্লিকনের 'কিতাবুল ওফায়াত উল্ আয়ান' (বিখ্যাত মানবদের মৃত্যুকাহিনী) মুসলিম ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের জীবনী গ্রন্থ। এতে আরব ঐতিহাসিক ও কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ধারাবাহিক ও কালানুক্রমিক হিসাবে সাজানো হয়েছে। বলা আবশ্যক যে, রাসূলে করীম, চার খলীফা ও সাহাবীদের জীবনবৃত্তান্ত এতে ইচ্ছাকৃতভাবেই সংযোগ করা হয় নি। এই ধরনের গ্রন্থ আরবী সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নি।

ইবন খালদুনের 'কিতাবুল ইবার ওয়া দীওয়ান ইল মুবতাদা ওয়াল খাবার ফি আইয়্যাম ইল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বারবার' গ্রন্থটির নাম যেমন সুদীর্ঘ তেমনি এর বিষয়বৃত্তান্তও বৈচিত্র্যময়। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং বিষয়বস্তুতে মানবজীবনে সভ্যতার প্রভাব, আরব জাতির ইতিহাস, উত্তর আফ্রিকার বারবার জাতির উদ্ভব ও বিস্তার ছাড়াও নিজের ও তাঁর পরিবারের লোকদের জীবনকাহিনী এতে ব্যক্ত হয়েছে। স্বরচিত গ্রন্থে আত্মজীবনী প্রকাশের রীতি আরবী সাহিত্যে এই প্রথম।

ইতিপূর্বে পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আস্-সুয়ূতীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যতটুকু জানা যায় তাতে পাঁচ বছর সাত মাস বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআনের সুরা তাহরিম পর্যন্ত পড়ে ফেলেন এবং আট বছর বয়স পূর্ণ না হতেই তিনি সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে হাফিজ খ্যাতি লাভ করেন।

পবিত্র কুর-আন ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা—যেমন হাদিস, আইন, দর্শন, ইতিহাস, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ শতের উপর। তন্মধ্যে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত 'ইতকান' এবং 'তফসিরুল জালালাইন' গবেষণা-পুষ্ট গ্রন্থ। তফসিরুল জালালাইন (দুইজন জালালের ব্যাখ্যা) গ্রন্থটি জালাল উদ্‌দীন আল মাল্লালী শুরু করেন এবং জালাল উদ্‌দীন আস্‌ সূয়ূতী সমাপ্ত করেন বলেই এই গ্রন্থটিকে 'দুই জালালের ব্যাখ্যা' নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'আল মুজ্‌হির' (ভাষাবিজ্ঞান), 'হোসনুল মুহাদারা' (কায়রোর সৌন্দর্য) এবং 'তারিখুল খোলাফা' (খলীফাদের ইতিহাস) প্রভৃতির নাম অবিস্মরণীয়।

ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অভিধান সম্পর্কিত গবেষণায় যাঁদের রচনা সমৃদ্ধ তাঁদের মধ্যে আন্‌ নুবায়রী (মৃত্যু: ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দ)-এর 'নিহায়াত উল আরব'; আস সাফাদীর (মৃত্যু: ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) সুবৃহৎ ছাব্বিশ খণ্ডে সমাপ্ত জীবনীমূলক অভিধান 'ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত; ইবন হজর আল্‌ আসকালানী (মৃত্যু: ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)-এর সাহাবীদের জীবনীসংক্রান্ত অভিধান 'ইসাবা ফি তামিজিস্‌ সাহাবা', ইবন আল মালীক (মৃত্যু: ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)-এর ব্যাকরণ গ্রন্থ 'আল ফিয়্যা'; জামাল উদ্‌দীন ইবন মুকাররাম (মৃত্যু: ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দ)-এর আরবী অভিধান 'লিসান উল্‌ আরব'; হাজী খলীফা (মৃত্যু: ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)-এর আরবী সাহিত্যের গ্রন্থ বিষয়ক অভিধান 'কাশ্‌ফুজ জুনুন'; আস্‌শারানীর (মৃত্যু: ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'লাতাইফ উল মিনান' প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

উপরোক্ত আলোচনায় সপ্তম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ আন্‌-নাহদা বা রেনেসাঁযুগের পূর্ব পর্যন্ত আরবী সাহিত্যের প্রবন্ধ, গবেষণা ও মননশীল রচনার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মীয়, দর্শন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা ইত্যাদি সব কিছু সম্পর্কেই এই সময়কালীন লেখকগণ আলোকপাত করেছেন এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ আরবী লেখকদের রচনার পটভূমি হিসাবেই কাজ করেছে। এই সুদীর্ঘ কালের আরবী মননশীল রচনায় যা সবচেয়ে লক্ষ্য তা এই যে, লেখকগণ সব সময় দৃঢ়

প্রতিজ্ঞ ছিলেন ইসলামের মাহাত্ম এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করা। যে কারণে ইসলামের শান্তির বাণী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সারা বিশ্বে বিস্তৃতিলাভ করে সেই কারণসমূহ আরও যুক্তির আলোকে আরবী লেখকগণ বহিঃবিশ্বে পৌঁছে দেন। বিশ্ববাসী শুধু ইসলামের শিক্ষায়ই বিমোহিত হয়নি, আরবী মননশীল রচনার রূপকারদের রচনাবৈশিষ্ট্যে স্তম্ভিত হয়েছে। এখানেই আরবী লেখকদের রচনার সার্থকতা।

॥ দুই ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আন্-নাহ্দা বা রেনেসাঁ আন্দোলন আরবী সাহিত্যের কাব্য, কথাসাহিত্য, নাটক প্রভৃতি শাখায় যে চেতনা-সঞ্চারী ক্রিয়া করে, একই ক্রিয়ার লক্ষণ আরবী গবেষণা, প্রবন্ধ কিংবা মননশীল রচনায়ও দৃষ্টিগোচর হয়। রেনেসাঁ আন্দোলনের সাহিত্যিকরা প্রধানতঃ দুটো ধারায় কাজ করতে থাকেন। প্রথমতঃ, নতুন চিন্তা ও নতুন পদ্ধতি সাহিত্যে রূপ দেবার চেষ্টায় ব্রতী হন এবং দ্বিতীয়তঃ, অতীতের রচনা এমনকি বিষয়বস্তুরও সংস্কারসাধন করে সম্পূর্ণ আধুনিক মনোভঙ্গীসঞ্জাত করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবও অবশ্যি এই মতাদর্শে অনেকটা সহায়তা করেছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা সে প্রভাব কাটিয়ে সাহিত্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেন।

আধুনিক আরবী প্রবন্ধ ও মননশীল রচনার উল্লেখে প্রথমেই নাম করতে হয় সিরিয়ার বুতরুস আল-বোস্তানীর (১৮১৯—১৮৮৩)। তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ছয় খণ্ড বিশিষ্ট 'দায়েরাতুল মা'রেফ' (বিশ্বকোষ) রচনা করেন। এতে মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম ছাড়াও ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনাও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

'বিশ্বকোষ' ছাড়াও তিনি আব্বাসীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আল-মুতানাব্বীর সামগ্রিক কাব্য-কর্ম 'দীওয়ান আল মুতানাব্বীর' উপর গবেষণা-সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যের উপর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ এই প্রথম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরবী সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণাসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচিত হলেও সাহিত্যের উপর সমালোচনাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। রেনেসাঁ যুগে এসে আরবী সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-সমালোচনার দিকেই মনোনিবেশ করলেন অতিমাত্রায় এবং আধুনিক আরবী মননশীল রচনার এইটেই বৈশিষ্ট্যময় দিক।

লেবাননের লুই শাইখো (১৮৫৯-১৯২৮) ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ছাড়াও সাহিত্য-সমালোচনাধর্মী বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের আরবী সাহিত্যের সমালোচনা ও কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্বলিত 'আদাবুল আরাবিয়্যাত।'

তিনি নিজে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ফলে, আরবী সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত যেসব খৃস্টান সাহিত্যিকদের অবদানে আরবী সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ তাঁদের সাহিত্যকর্ম, জীবনী ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এক অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে লেবাননের জীবরান খলীল জীবরানের (১৮৮৩-১৯৩১) নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধু মননশীল রচনা নয়, আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লুই শাইকো এবং জীবরান খলীল জীবরানের অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

সিরিয়ার ঐতিহাসিক এবং সমালোচক কুস্তাকী আল্-হোমসী (১৮৫৪—১৯৪১)-এর অবদানেও আধুনিক আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে উনিশ শতকের আলেপ্পোর কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্যকর্মের ফিরিস্তি নিয়ে। অনুরূপ-ভাবে সিরিয়ার মুহম্মদ কুরদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৩)-ও একজন খ্যাতিমান ইতিহাসবেত্তা এবং সাহিত্য-সমালোচক। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম সভ্যতা, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়-কেন্দ্রিক; তবে তা আধুনিক মনোভঙ্গীসঞ্জাত। তাঁর 'আল ইসলামু ওয়াল হাজারাতাল আরাবিয়্যাতা' আরবী সাহিত্যে ধর্মসম্পর্কিত অনবদ্য গ্রন্থ।

মিশরের ডক্টর তাহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩)-এর অবদান আধুনিক আরবী মননশীল রচনায় যে এক নবদিগন্তের সূচনা করে তা বলাই বাহুল্য। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হন। তাঁর ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ 'ফিল আদাবিজ জাহেলী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা আরব-জাহানে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থটিতে তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও

স্বাধীনচিন্তার পরিচয় বিধৃত। 'সাজ' ছন্দে রচিত কিছুসংখ্যক কবিতার সঙ্গে পবিত্র কুরআনের ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে বের করায় ধর্মান্ধ মহল ক্ষিপ্ত হন এবং আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরপদ থেকে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন। কিন্তু পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিচারে তিনি উত্তীর্ণ হন এবং ঘোষণা করা হয় যে, কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা ধর্মবিরোধী নয়, এমন কি তাতে আল্লার বাণী পবিত্র কুরআনেরও কোন অবমাননা করা হয় নি।

তাঁর অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে 'আদিব,' 'মা-আল মুতানাব্বী' 'ফসুল ফিল আদাব ওয়ান নাকাদ' খুবই উল্লেখযোগ্য। 'মা-আল মুতানাব্বী' গ্রন্থে তিনি আব্বাসীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আল-মুতানাব্বীর কবিতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার অবতারণা করেছেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত বুতরুস-আল বোসতানীর 'দীওয়ান আল মুতানাব্বী'র সমালোচনা গ্রন্থের সঙ্গে তাহা হোসাইনের 'মা আল-মুতানাব্বী' গ্রন্থের তফাৎ এই যে, বোস্তানী যেখানে কল্পনার ফানুস উড়িয়েছেন হোসাইন সেখানে অকাট্য যুক্তির পাথরের আঘাতে মনের ক্লেদ অপসারণ করেছেন।

জন্ম ও মৃত্যুর তারিখদৃষ্টে উপরোল্লিখিত প্রাবন্ধিক ও মননশীল রচনার রচয়িতারা সবাই সৃষ্টিশীল সাহিত্য-জগৎ থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। আধুনিক আরবী গবেষণা ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে এঁরা পথপ্রদর্শক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এঁদের পর পর যাঁদের জন্ম এবং যাঁরা এখনও জীবিত অবস্থায় অনলসভাবে সাহিত্যচর্চা করছেন তাঁদের রচনাবৈশিষ্ট্য বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই এঁরা সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন এবং বর্তমানেও তাঁদের রচনাধারা অব্যাহত রয়েছে। এঁদের রচনাপদ্ধতি ভাগ করে এঁদের সম্পর্কে আলোকপাত করলে আশা করি সবার পক্ষেই সুবিধাজনক হবে। এঁদের রচনাগুলিকে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়:

১. ধর্মীয় সাহিত্য। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ ইসলামের বিভিন্নমুখী আলোচনা এই ধর্মীয় সাহিত্যের অন্তর্গত।

২. বিজ্ঞানধর্মী সাহিত্য। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির নানা ব্যাখ্যা সহ নৃবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. সমালোচনা সাহিত্য। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, লোকগীতি, শিশু-সাহিত্য প্রভৃতির উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা।

৪. ঐতিহাসিক সাহিত্য। দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, রাজা, বাদশাহ, সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের জীবনকাহিনী সম্বলিত নির্ভরযোগ্য তথ্য।

৫. দর্শনতত্ত্বকেন্দ্রিক সাহিত্য। মুসলিম দর্শন ও বিশ্বের অন্যান্য দর্শনতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা।

আরবী সাহিত্যে ধর্মীয় সাহিত্যের সূচনাকাল সপ্তম শতাব্দী থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্তও সাহিত্যের সব শাখার অন্তরালেই কিছু না কিছু ধর্মীয় স্পর্শ সংগুপ্ত ছিল। আধুনিককালের সাহিত্যিকগণ ধর্মীয় সাহিত্যে যে পশ্চাৎপদ এ কথা বলা যায় না; বরঞ্চ তাঁদের ধর্মীয় সাহিত্যের প্রচেষ্টায় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের স্পর্শ এতই প্রকট যে, তা শুধু ধর্মীয় নয়, সার্বজনীন সাহিত্য হিসেবে টিকে আছে এখানেই ধর্মীয় সাহিত্যের সার্থকতা।

প্রাচীনপন্থী আরবী সাহিত্যিকগণ যে শুধু ধর্মীয় সাহিত্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এমন কথা বলা যায় না। আধুনিককালের সাহিত্যিকগণও ধর্মীয় সাহিত্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর এঁকেছেন এবং তার প্রমাণ বিধৃত হয়ে আছে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিদের পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ গ্রন্থে। পবিত্র কুর-আনকে তাঁরা শুধু ধর্মগ্রন্থ হিসেবে চিত্রিত করেন নি; বরঞ্চ মুসলমানদের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শনের কেন্দ্র যে পবিত্র কুরআন এই তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেই তাঁদের ধর্মীয় সাহিত্যের পরিধি বিস্তারিত হয়েছে। তা'ছাড়া তাঁদের রচনায় পবিত্র কুরআনের

ব্যাখ্যা, অবতীর্ণ হওয়ার সার্থকতা, আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (শানে-নজুল), আধ্যাত্মিক অর্থ উদ্ঘাটন ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে তৎকালীন আরবের সমাজচিত্রের পূর্ণরূপ ।

পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যাঁরা সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ আবুল ফজল ইবরাহীমের 'আল বুরহান ফি ওলুম উল-কুরআন'; আস্ সায়ীদ রশীদ রীদার 'তাফসিরুল কুরআনেল হাকিম'; মুহাম্মদ মহীউদ্দীন আবদুল হামিদের 'তাফসির মুযাআ আ-মীম'; মুহাম্মদ জামালউদ্দীন আল কাশেমীর 'তাফসিরুল কাশেমী'; মুসতাফা জায়েদের 'সুরাতুল আনফাল', আহমদ মুহম্মদ শাকেরের 'উমদাতুত্ তাফসির,' সায়্যীদ কুতুবের 'ফি জেলালুল কুরআন'; শেখ হুসাইন মুহম্মদ মাখলুকের 'কালেমাতুল কুরআন'; ডক্টর আবদুল হালিম নাজ্জারের 'মুজাহেব উল তাফসিরুল ইসলামী'; মুহম্মদ ফরিদ ওয়াজাদীর 'আল মাসহাফ আল মুফাচেছরু কাসাশ' প্রভৃতি খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ।

এসব ছাড়াও দশম শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত যথাক্রমে আল তাবারী ও আল বায়দাবীর কুরআনের ব্যাখ্যার উপর সমালোচনা-মূলক গ্রন্থও বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কাজী নাসীর উদদীন আল্ বায়দাবীর 'তাফসিরুল বায়দাবী' এবং আবি জা'ফর মুহম্মদ বিন জারির আত্তাবারীর 'তাফসিরুল তাবারী'-এর নাম করা যায়। আল্ তাবারী এবং আল্ বায়দাবীর অধস্তন বংশধরেরাই এই কাজ সম্পাদন করে তাঁদের পূর্বপুরুষের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

আল-হাদিস যে শুধু পবিত্র কুরআন-সমর্থিত রাসূল আল্লার বাণী এবং মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-ইতিহাস ইত্যাদির আধার নয়—বরঞ্চ আরবী সাহিত্যের উৎসকেন্দ্র—এ তত্ত্ব আবিষ্কারেও আধুনিক আরবী সাহিত্যিকগণ তৎপর এবং তাঁদের সমবেত এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আল-হাদিসও সাহিত্য হয়ে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়েছে। হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাসূলে করীমের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ, আচার-বিচার প্রভৃতির এমন সুললিত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যা ধর্মীয় সাহিত্যে রূপলাভ করেছে।

এই ধরনের গ্রন্থের মধ্যে মুহম্মদ আবদুল আজীজ আল খোলীর 'আল আদা ন নবোবী'; শেখ মনসুর আলী নাসেফের 'আত তাজুল জামেয়ুল অসুল ফি আহাদিস্ উর রাসূল'; শেখ আবুল হাসান আল বাক্রীর 'আদ্ দুররাতুল মাকালাত ফি ফাত্হে মাক্কা'; আল ইমাম শামসউদ্দীন আস্ সাখারীর 'আল মুকাসেদ উল হাসনাত'; আবদুর রহমান আস্ সাফেয়ীর 'নাজহাতুল মাজালেস'; আল ইমাম ইবনে জাফর আল্ মাক্কী আল হিশামীর 'আজ জাওয়াজের আল আফতারা ওফেতুল কাবায়ের' প্রভৃতি আরবী ধর্মীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান।

ইসলামের শিক্ষা, সার্বজনীনতা, মহত্ত্ব, উদারতা ইত্যাদির ব্যাখ্যায় আরবী সাহিত্যিকগণ সচেষ্ট। ইসলাম মানবসমাজের জন্য বয়ে এনেছে শান্তিব বাণী। তাই ইসলামে যেমন নেই অন্যধর্মের উপর জোর-জুলুম তেমনি ইসলাম সহ্য কবে না অপরের অন্যায় আচরণ। ইসলাম শান্তির ধর্ম বলেই এত অল্প সময়েব মধ্যে সারা বিশ্বে ইহা বিস্তারলাভ করে—একটি মাত্র শতাব্দীই ছিল ইসলামবিস্তারের জন্য যথেষ্ট।

ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে আরবী সাহিত্যের পণ্ডিতবর্গ ইসলামের ব্যাখ্যায় এইজন্যই তৎপর হয়েছিলেন যাতে সমগ্র বিশ্ব ইসলামধর্মের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। বর্তমানকালের সাহিত্যিকগণও পূর্ব-সূরীদের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় আরও ব্যগ্র, আরও উৎসাহী। এঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য পূর্ব-সূরীদের রচনার চেয়ে আরও উন্নত এবং আধুনিক ধ্যান-ধারণাসঞ্জাত। ইসলামের বহুমুখী আলোচনার সাপেক্ষে আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনার বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যময়। তাই বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গ বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে ইসলামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শুধু ইসলামেরই উন্নতিসাধন করছেন না, ধর্মীয় সাহিত্যেরও পরিধি বিস্তৃত করছেন। ইসলামের বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যায় যে-সব আধুনিক গবেষকরা অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হামেদ আব ল কাদেরের 'আল-ইসলামু জহুরাহ্ ওয়ান্ তাশারাহ্ ফিল আলম' (ইসলামের প্রকাশ ও বহিঃবিশ্বে তার প্রচার); মুহম্মদ আবদ আল্লাহ আস্ সাহানের 'আরকানুর্ দাওয়াতুল ইসলামিয়া' (ইসলামের ভিত্তির কাঠিন্য); মুহম্মদ আল-গাজজালীর 'খুলকুল মুসলিম' (মুসলমানদের চরিত্র); মওলানা

মুহম্মদ আসীর 'আল ইসলাম ওয়ান্ নেজামী আল-আ'লামিল জাদিদ' (বর্তমান বিশ্বে ইসলামের গুরুত্ব); জাকারিয়া আলী ইউসুফের 'ইজতামা-আল জুয়ূশ উল্-ইসলামিয়া' (ইসলামের শক্তির সংগঠন); আহমদ আমীনের 'জাহারাল ইসলাম' (ইসলামের প্রকাশ); 'ফাজরুল ইসলাম' (ইসলামের উত্থান); আহমদ আশ্ শুরবালীর 'আল কাসাসু ফিল ইসলাম' (ইসলামের কাহিনী); আবদুল মুত্আল আস সায়িদীর 'লেমাজা আনা মুসলিম' (আমরা কিজন্য মুসলমান); আলী রাফায়ীর 'মহাসেনুল ইসলাম' (ইসলামের সৌন্দর্য); আবদুল আজিজ আতিয়াহ্-এর 'আল আকিদাতাল ইসলামিয়্যাত ফিল মা'রাত' (ইসলামে নারী-চরিত্রের মাহাত্ম্য), ডক্টর মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ দারাজের 'নাজারাতা ফিল ইসলাম' (ইসলামের দৃষ্টিকোণ), মুহম্মদ আবু জাহরাতার 'আল ওয়াহ্দাতাল ইসলামিয়্যাত' (ইসলামে একত্ববাদ), আবদুল মুত্আল আস্ সায়িদীর 'আল হুরিরয়াতু দীনিয়াতু ফিল ইসলাম' (ইসলামে ধর্মের স্বাধীনতা) ইত্যাদি।

বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ও আধুনিক আরবী সাহিত্যের রূপকারগণ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন মুসলমানদের অবদান অপরিসীম তেমনি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনারও অন্ত নেই আরবী সাহিত্যে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আব্বাসীয় যুগের ইব্‌ন সীনা, আবুবকর আর্-রাজী, জাবির ইবন হাইয়্যান, আল ফায়গানী, আবু মা'শার, আল বাত্তানী প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ শুধু আবিষ্কারের মাধ্যমেই বিশ্ব-বিখ্যাত হতে সমর্থ হন নি, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ও তাঁদের প্রতিভার পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও সামান্য ইংগীত দেয়া হয়েছে। আধুনিককালের আরব-পণ্ডিতবর্গ তাঁদের পূর্বসূরীদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারেই শুধু ব্যাপৃত নন, তাঁদের আবিষ্কারের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময় রচনার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেছেন। এরিস্টটলীয় কিংবা নিও-প্লেটোনিক সংজ্ঞার ব্যাখ্যা আধুনিক সাহিত্যিকদের হাতেও রূপলাভ করছে, কিন্তু সেখানে প্রযোজিত হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণার বিষয়-বৈচিত্র্য।

বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের প্রতি যেমন আধুনিক আরব জগৎ উৎসাহী তেমনি তাঁদের রচনা-বৈশিষ্ট্যও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র করে বিস্তারিত। আধুনিক লেখকদের প্রচেষ্টায় আণবিক শক্তির উপকারিতা-অপকারিতা যেমন বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকায় রূপ পাচ্ছে তেমনি চন্দ্রাভিযানের ব্যাখ্যাও তাঁদের রচনা থেকে বাদ পড়ছে না। এখানেই এর পরিসমাপ্তি নয়--বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারসমূহ পবিত্র কুরআন-সমর্থিত কি-না এ ব্যাপারেও তাঁদের উৎকণ্ঠার অবধি নেই। ফলে, পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি আবিষ্কারের উৎস পবিত্র কুরআন থেকে উদ্‌ঘাটন করে আধুনিক লেখকবর্গ লোকসম্মুখে হাজির করেছেন। এই ধরনের গ্রন্থের মধ্যে মুস্তাফা সাদেক আর্ রাফায়ীর 'আ'জাজুল কুরআন', মুহম্মদ হাফনী শারফ-এর 'বাদিউল কুরআন', তাহা আবদুল বাকী সারোরের 'দাওলাতুল কুরআন', আহমদ বাদুরীর 'মিন বালাগাতুল কুরআন', মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ আস্-সাহানের 'আন্ মাসালাল আ'লীয়া ফিল কুরআন', মুহম্মদ আল্ গাজ্জালীর 'নাজারাতু ফিল কুরআন' খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের ইতিহাস, উৎস এবং ব্যাখ্যা-কেন্দ্রিক গবেষণা-পুস্তকের সংখ্যাও আধুনিক আরবী সাহিত্যে একেবারে উপেক্ষার নয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গ্রন্থসমূহের মধ্যে ডক্টর ওসমান আমিনের 'আহ্সাউল ওলুম', আলী আবদুল জলীল রাজীর 'আল এজায়াতু ওয়াল আসলাকী', ডক্টর আহম্মদ জাকীর 'শা-আতুস্ সাহার', আব্বাস মাহমুদ আল্ ওক্কাদের 'আলাল আসির', মুসতাফা কামেল আল কিন্দীর 'আল ইলমু ওয়াল হায়াতুল ইনসানিয়াত' প্রভৃতি ছাড়াও বেশ সংখ্যক ভিন্ন ভাষার গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত রয়েছে। অনূদিত গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু সৌরজগৎ, সমুদ্রের রহস্য, টেলিফোনের আত্মকথা, চন্দ্রে আরোহণ, লৌহের আত্মকথা, আকাশ-যানের ইতিকথা ইত্যাদি-কেন্দ্রিক আলোচনায় মুখর। অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে আবদুল ফাত্তাহ্ আল-মুনিয়াবীর 'আল আদায়াত্ ওয়া কায়ফা তাতুরাত'; ডক্টর আহমদ জাকীর 'বাওয়ানেক ওয়া আনাবিক'; ডক্টর আহমদ বাদরানের 'আত্ তিফুস্ ওয়াত্‌তারিখ', আহমদ মুসতাফার 'তাবসিতুল ওলুম : আত্-তালাফোন ওয়ার রাদেয়ু ওয়াল আসলাকী ওয়াস সায়্যেরাতু ওয়াত্ তায়েরাতু ওয়াল জাররাতু ওয়া

গায়রুহা'; ডক্টর মুহম্মদ আশ্ শাহাতের 'আল্ জাররাতুল ইয়াওমা ওয়া গাদাম'; ইসমাইল হাক্কীর 'আস সাফারা ইলাল কাওয়াঁকেবু', মু'আহমদ নাজিরের 'আস সাখার ওয়ান্ নাহার ওয়া নাকালিয়াতুল বারের ওয়াল বাহারে' প্রভৃতি বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের পূর্ণ বিবরণ নিয়ে আধুনিক আরব-জগৎকে চমৎকৃত করে দিয়েছে।

নৃতত্ত্ব বা মানববিজ্ঞানের গবেষণায়ও আধুনিক আরবী সাহিত্যিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। নৃবিজ্ঞান বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় এবং জনপ্রিয় বিষয়। প্রস্তরযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানব ইতিহাসের বিবর্তন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা এবং আদিম ধারণাসঞ্জাত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে যেমন প্রত্যেক দেশেই গবেষণার কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে, আরবজগৎও তেমনি এই গবেষণার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন বিশেষ একাগ্রতার সঙ্গে। আধুনিককালে মিশরের প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর আহমদ আল বাতরাবী সর্বপ্রথম নৃবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অমর গ্রন্থ 'আল-জিন্সুল বাশারিয়্যা' (মানববংশের ইতিহাস) আরবী নৃবিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ। বিশ্ববিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ — যেমন ফ্রেজার, টাইলর, ওয়েষ্টারমারক, ম্যারেট, ম্যালিনৌস্কী প্রমুখদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অনূদিত নৃতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ আস্-সায়্যেদ গুলাবের 'আল-আরদু ওয়ান নাতুরাল বাশারিয়্যা' (পৃথিবীর ইতিহাস ও মানবসভ্যতার ক্রমঃবিকাশ); ডক্টর আহম্মদ ফখরীর 'আল হাজারাতুল মিসরিয়্যাতা' (প্রস্তরযুগের মিশর); মুহম্মদ আহমদ হামেদাহ্-এর 'সাওরাতু আসি-আ' (প্রশান্ত বিপ্লব) প্রভৃতি নিঃসন্দেহে আরবী সমাজবিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করেছে।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের মননশীল রচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বৈশিষ্ট্যময় দিক সমালোচনা সাহিত্য। সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উপর গবেষণা ও সমালোচনাধর্মী গ্রন্থ যে ছিল না একথা বলা যায় না। তবে সেক্ষেত্রে আলোচনা ছিল সীমিত এবং বিষয়বস্তুও মাত্র কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত ছিল। কিন্তু বতমানে আধুনিক সাহিত্যিকগণ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সাহিত্য-সমালোচনার রীতি অনুসরণ

করছেন এবং তাঁদের সমালোচনার ধারাও যেমন আধুনিক মনোভঙ্গীসঞ্জাত তেমনি বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যময়। তাঁদের সমালোচনাধর্মী রচনা কেবল আরবী সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ভিন্ন সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁদের সমালোচন.রীতি সমানভাবেই লক্ষ্যযোগ্য। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় মুহম্মদ হোসাইন হায়কলের 'সাওরাতুল আদাব' (সাহিত্যে বিপ্লব) গ্রন্থের। রাজনৈতিক বিপ্লব যে শুধু দেশের উত্থান-পতনেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাই নয়---সাহিত্যের অঙ্গনেও এর প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমগ্র আরব-জগৎকে এক নব উন্মাদনায় উন্নীত করে এবং তার ফলশ্রুতিতে আরবী সাহিত্যেও যে এক বিপ্লবাত্মক ভূমিকার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায় এই তথ্য ও তত্ত্বই 'সাওরাতুল আদাব' গ্রন্থে উক্ত হয়েছে।

জামালুদ্দীন আল রামাদীর রচনায় সম্পূর্ণ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'আদাবুল বাশারিয়্যা' (মানুষের সাহিত্য) আধুনিক আববী সাহিত্যে মননশীল রচনার এক নতুন দিক-চিহ্ন সূচিত করলো। মানুষের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ কতটুকু এবং সত্যিকার সাহিত্য বা সৎ-সাহিত্য মানুষের সঙ্গে একাত্ম কি-না এই তাৎপর্য ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্-রামাদী নিবিষ্টচিত্ত।

আল-রামাদীর সমসাময়িক এবং প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক সালামাহ্ মূসা আল-রামাদীর অনুকরণে রচনা করলেন 'আল-আদাব ওয়াল হায়াত' (সাহিত্য ও জীবন)। সাহিত্য ও জীবন সমার্থক এবং পরস্পর অঙ্গা-অঙ্গীভাবে জড়িত। এই তত্ত্বই ব্যক্ত হয়েছে 'আল্-আদাব ওয়াল হায়াত' গ্রন্থে।'

প্রায় একই ধরনের রচনার অবতারণা করলেন ডক্টর মুহম্মদ মনদুর তাঁব 'আল্ আদাব ওয়া মুজাহিয়াহ্' (সাহিত্য ও সমাজ) গ্রন্থে। সমাজ-জীবনের সঙ্গেও সাহিত্যের যোগ অতি নিবিড় এবং যে সাহিত্যে সমাজের স্পর্শ নেই ডক্টর মুহম্মদ মনদুরের মতে সেই সাহিত্য অচল।

সমাজ, জীবন ও নিজস্ব পরিমণ্ডল ছাড়াও আধুনিক সাহিত্যিকগণ নিমগ্ন হলেন নিছক সাহিত্যের সমালোচনাধর্মী আলোচনায়। এই প্রসঙ্গে

ডক্টর তাহা হোসাইনের 'হাফেজ ওয়া শাওকী' গ্রন্থের নাম করা যায়। হাফিজ ফার্সী সাহিত্যের বিশ্বখ্যাতি সম্পন্ন কবি আর শাওকী উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবি। উভয়ের কবি-কর্মের তুলনামূলক আলোচনাই 'হাফেজ ওয়া শাওকী' গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। বলা আবশ্যক যে, হাফিজ মিস্টিক কবি আর শাওকী মিস্টিক ও রোমান্টিসিজম-এর অপূর্ব সমন্বয়। ডক্টর তাহা হোসাইনের শক্ত লেখনীতে হাফিজ ও শাওকীর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

ডক্টর আহমদ মুহম্মদ আল-হাওফীর রচনায় ভিন্ন স্বাদ উপভোগ করা যায়। তিনি অন্ধযুগের সাহিত্যের জীবন-চেতনার রূপ দিলেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'আল-হাযাতুল আরবিয়্যাতা মিনাল শে'রেল জাহেলী' (অন্ধ-যুগের কাব্য-সাহিত্যে জীবনচেতনা)-এর মধ্যে। আল-হাওফী মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনচিন্তার নায়ক। ফলে ইসলাম-পূর্ব যুগের কাব্য-চেতনায় যে জীবন তদগত তা যেন আমাদেরই জীবন-চৈতন্যের পটভূমি। ধর্মের অন্ধ-গোঁড়ামি সেখানে রেখাপাত করতে পারেনি।

আবি ইসহাক কিরওয়ানী প্রতিভাদীপ্ত কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কর্মের তুলানামূলক আলোচনা নিয়ে রচনা করলেন 'জাহ্‌ব উল্ আদাব' (সাহিত্যের পুষ্প)। 'জাহর উল আদাবে' উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবিদের তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা স্থান পেয়েছে এবং কিরওয়ানীর পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা 'সাহিত্যের পুষ্প' হিসেবে টিকে আছেন।

মুহম্মদ সায়ীদ কিলানী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে অগ্রসর হলেন সমালোচনা-সাহিত্যের অঙ্গনে। বিপ্লব কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ সাহিত্যে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে সেই ইংগিত দিলেন তাঁর রচনায়। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল্ হুরুবুস্ সালাবিয়্যাতা ওয়া আসারুহা ফিল আদাবুল আ'রাবী ফি মিস্‌র ওয়া শাম'---প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মিশর ও ইরাকের আরবী সাহিত্যে যুদ্ধের ফলাফল কি ধরনের চেতনাসঞ্চারী ক্রিয়া করেছে তারই পূর্ণ বিবরণ বহন করে। সায়ীদ কিলানী বিপ্লবাত্মক ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর

রচনার মাধ্যমে। তিনি নিজেও একজন বিপ্লবী নেতা। কাজেই তাঁর রচনায় হৃদয়ের স্পর্শ বর্তমান।

ডক্টর আবদুর রাজ্জাক হামিদাহ্-এর সমালোচনা প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির। তিনি অশ্লীল কবিতা ও কবিদের কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করে তাদের কাব্যকর্মের উপর এক গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখলেন এবং এই গ্রন্থের নামকরণ করলেন একটু কটূক্তিব্যঞ্জক: 'শায়াতিনুশ্ শোয়ারা' (শয়তান-কবি)। আরবরাসীদের মতো ডক্টর আবদুর রাজ্জাক হামিদাহ্ও বিশ্বাস পোষণ করেন যে, কবি ও কবিতা উভয়ই ঐশ্বরিক দান। তাই কবিদের কবিতা যদি সৎ কবিতা না হয়ে অশ্লীলতার নামান্তর হয় তবে তা 'আমালিশ্ শায়তান' বা শয়তানের কর্ম বলে বিবেচিত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আইয়্যামে জাহেলিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইমরাউল কায়েসের কবিতার অশ্লীলতার দিক লক্ষ্য করে কবি সম্পর্কে রাসূলে করীম মন্তব্য করেছিলেন, 'ওয়া হুয়া মালিকুশ্ শোয়ারায়ি ফিন্ নার'---দোজখগামী কবিদের সর্দার হবে সেই অশ্লীল কবি। যাহোক, 'শায়াতিনুশ্ শোয়ারা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবজগতে সাড়া পড়ে যায় এবং ডক্টর আবদুর রাজ্জাক হামিদাহ্ অভিনন্দিত হন।

কি ধরনের বিষয়বস্তু সাহিত্যকে সৎসাহিত্যে উন্নীত করে এবং তা সর্বজনগ্রাহ্য হয় এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন মুহম্মদ মহীউদ্দীন আবদুল হামিদ তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ 'আল উমদাতাল আদাব' (শ্রেষ্ঠ সাহিত্য)-এ। এই গ্রন্থে তিনি বিদেশী সাহিত্যের পটভূমি এবং রচনা-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা করেন। মুহম্মদ মহী উদ্দীন আবদুল হামিদের অপর একটি সমালোচনা গ্রন্থ 'মাগানি উল-লাবীব' (বুদ্ধিজীবীর গান) আধুনিক আরবী সমালোচনা সাহিত্যের দিগ্দর্শনস্বরূপ।

আবদুহ্ ইসমাইল আত্-তাহতাবী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কথা-সাহিত্যের স্টাইল, টেকনিক এবং বিষয়বস্তুর নানা প্রসঙ্গ সম্বলিত 'কাসাস্ মিনাল শারক ওয়াল গারব' (পূর্ব ও পশ্চিমের গল্প) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করে আধুনিক আরবী সমালোচনা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। এই গ্রন্থে

মাহমুদ তাইমুরের রচনারীতির যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে তাতে তিনি যে মোপাসাঁর উত্তরসাধক এই দিকটির প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে অতিমাত্রায়।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়া আধুনিক আরবী সমালোচনা-সাহিত্যে যে সব গ্রন্থ খুব উল্লেখযোগ্য তন্মধ্যে সায়্যীদ আহমদ আল হাশমীর 'জওয়াহেরুল বালাগাত', ডক্টর আলী আবদুল ওয়াহেদ ওয়াফীর 'ফেকহুল লুগাত'; ইবরাহীম আবদুল কাদের আল-মাজানীর 'কাবজের রিহ্', আবদুল্লাহ্ আবদুল জাব্বারের 'তেস্‌সাতুল আদাব ফিল হেজাজ' এবং 'ফিল আসরেল জাহেলী'; মুসতাফা সাদেক আর্ রাফায়ীর 'কিতাবুল মাসাকীন', ডক্টর আবদুল লতীফ হামজার 'মুসতাকবালাস সাহাফাতা ফি মেসর'; মুহম্মদ আবদুল গনী হাসানের 'আ'লামু মিনাল শারক ওয়াল গারব', মাহমুদ আল্-খাফীফের 'আব্রাহাম লিংকলন', আব্বাস মাহমুদ আল্ ওকাদের 'ইবন আর্ রুমী হায়াতুহু ওয়া শে'রুহু', আহমদ আল্-সাবী মুহম্মদের 'বালজাক' প্রভৃতির নাম করা যায়।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনায়ও আধুনিক আরবী সাহিত্যিকদের অবদান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। অষ্টম শতাব্দী থেকে আন-নাহদা বা রেনেসঁ যুগের পূর্বপর্যন্ত আরবী সাহিত্যের মননশীল রচনার জরিপ করলে ঐতিহাসিক রচনার প্রাচুর্যই লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক আরবী সাহিত্যিকগণও তাঁদের পূর্বসূরীদের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং তাঁদের ঐতিহাসিক রচনার ব্যাপ্তি অপরিসীম।

ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, দেশ, জাতি, রাষ্ট্র এবং রাজা-বাদশাহ প্রভৃতি সব কিছুই আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস-বেত্তাদের রচনার বিষয়বস্তু। রাজা-বাদশাহ্ বা প্রধান ব্যক্তিদের জীবনী সম্বলিত অভিযান কাহিনী বা জয়-পরাজয়ই আধুনিক ঐতিহাসিকদের রচনাকে সমৃদ্ধ করেনি বরঞ্চ সাংস্কৃতিক জীবনধারার সত্য-নির্ভর তথ্যও তাঁদের রচনায় রূপলাভ করেছে। কাজেই আধুনিক আরবী সাহিত্যে ইতিহাসবেত্তাদের সংখ্যাও যেমন অগণন তেমনি তাঁদের রচনারীতিও নানা প্রসঙ্গকেন্দ্রিক।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের ঐতিহাসিক রচনার উল্লেখে সর্বপ্রথমেই নাম করতে হয় মুহম্মদ আহমদ যাদাল মওলা, আলী মুহম্মদ আল বাজাবী এবং আবুল ফজল ইবরাহীম—এই তিন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মিলিত রচনা 'আয্যামেল আরব ফিল ইসলাম' (ইসলামযুগের আরবের ইতিহাস) এবং 'আয্যামেল আরব ফিজ্ জাহেলিয়াত' (অন্ধযুগের আরবের ইতিহাস)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে রাসূলে করীমের সময়কালীন আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আলেখ্য চিত্রিত এবং শেষোক্ত গ্রন্থে ইসলামপূর্ব-যুগের আরবের সমাজ-জীবনের জীবন্ত চিত্র পরিস্ফুট।

স্বাজাত্যবোধ ও নিজস্ব ঐতিহ্য চেতনায় গর্বিত আব্বাস মাহ্মুদ আল-ওকাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর রচনারীতি বিস্তারিত করলেন। তিনি 'আসাকুল আরব ফিল হাজারাতুল ওকুবিযাতা' (ইউরোপীয় সভ্যতায় আরবের প্রভাব) গ্রন্থ রচনা করে বিশ্ববাসীকে অবগত করলেন মুসলিম সভ্যতার গৌরবের কথা। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থ আধুনিক আরবী ঐতিহাসিক রচনার এক অপূর্ব বিস্ময়।

মুহম্মদ কামাল ও মুহম্মদ ইসমাইল ইবরাহীম রচিত 'আল বালাদুল মুকাদ্দাসাতা' (পবিত্র শহর) মুসলমানদের গৌরবসূচক পবিত্র মক্কা ও মদীনার তথ্য-নির্ভর ইতিহাস মুসলিম বিশ্বে পবিত্র শহর দুটিকে আরও বিখ্যাত করতে সহায়তা করলো।

মুহম্মদ মহীউদ্দীন আবদুল হামিদ 'তারিখুল খুলাফায়ু' (খলীফাদের ইতিহাস) লিখে সবার সম্মুখে প্রতিভাত করলেন খলীফাদের সংগ্রামবহুল জীবন, আদর্শ এবং ইসলামের শিক্ষা-সমৃদ্ধ আলোর মাহাত্ম্য। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে আরবী ইতিহাস সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আরবী ভাষাভাষী খৃস্টান লেখক আস্-স্যার জন হামেলতুন আরবী ইতিহাস-সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করলেন 'তারিখুল আ'লাম' (বিশ্বের ইতিহাস) লিখে। সুবৃহৎ দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটিতে পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস থেকে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ সহ সমগ্র বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও বিষয়ের তথ্য-সমৃদ্ধ উপকরণ সংযোজিত হয়েছে। আধুনিক আরবী ইতিহাস-সাহিত্যে এ ধরনের গ্রন্থ ইহাই প্রথম এবং অভিনব।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং প্রাবন্ধিক মুসতাফা সাদেক আর্‌-রাফায়ী ভিন্ন বিষয়বস্তুতে মনোনিবেশ করলেন। তিনি রচনা করলেন 'তারিখে আদ বুল আরব' (আরবের সাহিত্যের ইতিহাস)। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটিতে আরবী সাহিত্যের পটভূমি, বিষয়বস্তু এবং রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা স্থানলাভ করেছে। ইসলামপূর্ব যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর চারদশক পর্যন্ত সময়কালের আরবী সাহিত্যের পরিচয় এতে বিধৃত।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত মহম্মদ আহমদ যাদাস মওলা প্রমুখদের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে খৃস্টান কবি ও প্রবন্ধকার জুরজী জায়দান সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচনা করলেন 'আল আরব কাবলাল-ইসলাম' (ইসলাম-পূর্ব আরবের ইতিহাস)। গ্রন্থটি ইসলাম-পূর্ব আরবদের সামাজিক জীবনের একটি জীবন্ত চিত্র।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আলী আল্‌ জারেম-এর 'আল্‌-আরব ফি আসিয়া-নিয়া' (এশিয়ায় আরবদের অবদান) গ্রন্থটিও নানা কারণে উল্লেখের দাবি রাখে। এতে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শন ও সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সমগ্র এশিয়ায় কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলিম ঐতিহ্য, স্বাজাত্যবোধ ও গৌরবের ব্যাখ্যায় গ্রন্থটির ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

হোসাইন হোসনী আবদুল ওয়াহাব-এর 'খোলাসাতু তারিখে তুনেসা' (তিউনিসের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন) গ্রন্থে তিউনিসের উৎপত্তি, ভৌগোলিক বিবরণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছাড়াও সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জন-জীবনের পরিচয় বিধৃত। একটা দেশের সম্যক উপলব্ধি লাভ করার পক্ষে গ্রন্থটি খুবই সহায়ক।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ ওসমানের 'দাওলাতুল ইসলাম ফিল আনদালুস' (আনদালুসে ইসলামের সম্পদ) গ্রন্থটিও মুসলিম স্বাজাত্যবোধের অম্লান স্বাক্ষর। অনুরূপভাবে আলী আর-রাবীর 'আস-সাওরাতুল আয়ার-লেনদিয়াতা (আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লব) গ্রন্থটিও আয়ারল্যাণ্ডবাসীর গৌরবময় কাহিনী নিয়ে ভাস্বর হয়ে আছে।

আবদুল হামিদ জওদাতাস্ সাহার আরবী ইতিহাস-সাহিত্যের ভাণ্ডারে আবির্ভাব ঘটালেন এক নতুন বিষয়বস্তু। তিনি রচনা করলেন 'সানেয়ুত্ তারিখুল আমেরেকী' (আমেরিকান সভ্যতার ইতিহাস)। আরববাসী এই গ্রন্থে এক নতুন স্বাদ উপভোগ করলো।

ভিন্ন সাহিত্য থেকে ঐতিহাসিক রচনা সম্বলিত বেশসংখ্যক অনূদিত গ্রন্থও আরবী ইতিহাস-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। অনূদিত গ্রন্থের উল্লেখে ডক্টর মাহমুদ আবদুল আজীজ সালেমের 'আল ইসলামু ফিল মাগরেব ওয়াল আনদালুস' (পাশ্চাত্য ও আনদালুসে ইসলাম), মুহম্মদ আবদুল হাদী আবু রীদাহ্-এর 'তারিখুল ফালসাফাতা ফিল্ ইসলাম' (ইসলামে দর্শনতত্ত্বের ইতিহাস) ; ডক্টর জাকী নাজীব মাহমুদের 'তারিখুল ফালাসাফাতাল গারবিয়্যাতা' (পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস), মহম্মদ আদেল জাঈতার-এর 'হাজারাতুল আরব' (আরব-সভ্যতা), 'হাজারাতুল হিন্দ (ভারতীয় সভ্যতা) ; ডক্টর জর্জ হাদ্দাদের 'মাজা হাদ্দাসা ফিত্ তারিখ (কি করে ইতিহাস কথা বলে), সুবত কাজুকের 'তারিখুল মু'সিকী' (সঙ্গীতের ইতিহাস), প্রভৃতি আরবী ইতিহাস-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

দর্শন-তত্ত্বসম্পর্কিত রচনায়ও আধুনিক আরবী সাহিত্যিকগণ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে মুসলিম-দর্শনের প্রতিই তাঁদের পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করবার মতো। পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং মুসলিম জীবনপ্রবাহে দর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে আব্বাসীয় ও আব্বাসীয়-উত্তরকালে আফলাতুন, ইবন খলদুন প্রমুখ দার্শনিকগণ গবেষণাসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আধুনিক দার্শনিকগণও এ ব্যাপারে পশ্চাৎপদ নন এবং তাঁদের মূল্যবান অবদানে আধুনিক আরবী সাহিত্যের দর্শনবিভাগও সমৃদ্ধ। আধুনিক আরবী সাহিত্যের দর্শনতত্ত্ব-সম্পর্কিত রচনার উল্লেখে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ডক্টর আহমদ ফোয়াদ আল-আহওয়ানীর। তাঁর অমর গ্রন্থ 'মায়ানী উল-ফালাসাফাতা (দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যা) মুসলিম দর্শন, গ্রীক দর্শন এমনকি ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ।

ডক্টর জাকী নাজীব মাহমুদ তাঁর 'খারাফাতুল মিতাফিজিয়া' (অধিবিদ্যার পাঠ) গ্রন্থে দর্শনতত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সহ জীবন-দর্শনের এক

সুস্পষ্ট ইংগীত দিয়েছেন। তাঁর দর্শনতত্ত্বের পশ্চাৎপটও পবিত্র কুরআন-কেন্দ্রিক। তাঁর মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির যোগসূত্র স্থাপনে একমাত্র 'নূর' বা আলো পরম সহায়ক এবং এই নূরই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। এবং এটাই মুসলিম দর্শনের আদি ব্যাখ্যা। জীবরান খলীল জীবরানের জীবনবাদ একই দর্শনতত্ত্ব থেকে উৎসারিত।

ওস্তাদ সুলায়মান দানীয়া ব্যাপৃত থেকেছেন ইমাম গাজ্জালীর দর্শন-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় এবং তাঁর অমর গ্রন্থ 'আল হাকিকাতু ফি নাজারুল গাজ্জালী' (গাজ্জালীর দর্শনে যা স্পষ্ট দেখেছি) গাজ্জালী দর্শনের স্পষ্ট ব্যাখ্যায় বাঙময়। একাদশ শতাব্দীর মুসলিম দার্শনিক আল-গাজ্জালীর দর্শনতত্ত্ব পবিত্র কুরআনভিত্তিক। মানব ও মানবাত্মা সম্পর্কে গাজ্জালীর অভিমত :

'আল্লাহ মানব সৃষ্টি করেছেন দুই অংশে : "এক অংশ দেহ, অপর অংশ আত্মা। তিনি দেহের মধ্যে আত্মার জন্য একটি ঘর তৈরী করে দিয়েছেন এবং আত্মা এই জগতে দেহে অবস্থান করে পরবর্তী জগতের সংস্থান গ্রহণ করে। দেহে অবস্থানের জন্য প্রত্যেক আত্মার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত আত্মা থাকতে পারবে না এবং এটাই আত্মার সঙ্গে চুক্তি। চুক্তি ফুরিয়ে গেলেই দেহ এবং আত্মা পৃথক।

যেভাবে খুশি তুমি বাঁচতে পারো কিন্তু এটা অবধারিত সত্য যে, তোমাকে মরতে হবে। যাকে খুশি তাকেই তুমি ভালোবাসতে পারো, কিন্তু এটাও অবধারিত সত্য যে, তার কাছ থেকে তোমাকে বিদায় নিতে হবে। তোমার যা খুশি তাই করতে পারো, প্রত্যেক কাজের জন্যই তোমার ফলভোগ করতে হবে।"

•

মানব, আত্মা এবং আল্লাহ্ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এই সম্পর্কের দার্শনিক ব্যাখ্যাই আল্-গাজ্জালী-দর্শনের মূল বক্তব্য। ওস্তাদ সুলায়মান দানীয়া গাজ্জালী-দর্শনের মূল বক্তব্যই পেশ করেছেন 'আল হাকিকাতু ফি নাজারুল-গাজ্জালী' গ্রন্থে।

প্রখ্যাত দার্শনিক ইউসুফ কারাম জ্ঞান ও বুদ্ধির দার্শনিক ব্যাখ্যায় তৎপর হয়েছেন অধিক মাত্রায়। জ্ঞান ও বুদ্ধি পরস্পর সমার্থক। কিন্তু তাদের কার্যকলাপে পার্থক্য রয়েছে বলেই জ্ঞান ও বুদ্ধি আলাদাভাবে চিহ্নিত। এবং চিহ্নিত করণের দিকটিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেছেন ইউসুফ কারাম তাঁর অমরগ্রন্থ 'আল-আকলু ওয়াল বুজুদ' (জ্ঞান ও বুদ্ধি)-এর মধ্যে।

আবুল আ'লা আফিফীর 'কুসুলুল হেকম' (জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ) গ্রন্থটি ইউসুফ কারামের 'আল-আকলু ওয়াল বুজুদ' গ্রন্থটির সমধর্মী হলেও আবুল আ'লা আফিফী জ্ঞানের বিভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে জ্ঞান মানুষকে সৎপথে চালিত করে আফিফীর মতে সেই জ্ঞানই 'দাওলাতুল হেকমু' বা সম্পদশালী জ্ঞান।

আব্বাস মাহমুদ আল-ওকাদ মুসলিম-দর্শনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাঁর অমর-গ্রন্থ 'আল ফালাসাফাতাল কুরআনিয়্যাতা' (পবিত্র কুরআনের দর্শনতত্ত্ব)-তে। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের সার্থকতা, আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, আলিফ-লাম-মিম, হা-মিম, ইয়া-সিন ইত্যাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও এতে স্থানলাভ করেছে। মুসলিম দর্শনের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রন্থটির ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

ডক্টর রাশেদ আল-বারাবী দর্শনতত্ত্বের এক নতুন দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। তিনি তাঁর দর্শনতত্ত্বের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করলেন বিপ্লব বা বিদ্রোহের অন্তরাল থেকে। বিপ্লব বা বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় কেন? এর সুফল বা কুফল কিরূপ? ইত্যাকার নানা প্রশ্নের সমাধান করেছেন তিনি দার্শনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে, এবং এসব ব্যাখ্যার সুষ্ঠু বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর 'আল ফালাসাফাতাল ইকতেসাদিয়াতাল সাওরাতা' (বিপ্লবের অন্তরালে দার্শনিক তত্ত্ব) গ্রন্থে।

আধুনিক আরবী সাহিত্যিকগণ শুধু দর্শন-তত্ত্বের গ্রন্থ লিখেই নিরস্ত হন নি। কিছুসংখ্যক পণ্ডিত ও দার্শনিক বিদেশী ভাষার দার্শনিক তত্ত্বসম্বলিত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যের পরিধিও

বিস্তৃত করেছেন। আরবীতে অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে ডক্টর আবদুল হালিম মাহমুদের 'আল আখলাক ফিল ফালাসাফাতা আল-হাদিস' (হাদিস-দর্শনের বৈশিষ্ট্য), ডক্টর মুহমুদ হবরুল্লাহ্-এর 'ইবাদাতুল এ'তেকাদ' (দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য), আমীন মুসা কানদিলের 'তাজদিদুল ফালাসাফাতা' (অভিনব দর্শন), মুহম্মদ আদেল জারীতাব-এর 'হায়াতুল হাকায়েক' (জীবন-দর্শনের তাৎপর্য), 'ফালাসাফাতুত্ তারিখ (দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস); আবুল আ'লা আফিফীর 'আল-মুদখেলা ইলাল ফালাসাফাতা' (দর্শনশাস্ত্রে অনুপ্রবেশ) প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

উপরোল্লেখিত ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি কেন্দ্রিক মননশীল রচনা ছাড়াও সঙ্গীত, শিল্প ও নৃত্যবিষয়ক মননশীল রচনাও আধুনিক আরবী সাহিত্যে যথেষ্ট রয়েছে।

সঙ্গীতসম্রাট সালেহ্ আবদুল বিভিন্ন সঙ্গীতের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'আস্ সাকাফাতুল মুসিকিয়্যাতা' (সঙ্গীতশিল্প পরিচয়) সঙ্গীত শাস্ত্রের সম্যক পরিচয় বহন করে। অনুরূপভাবে মুহম্মদ রেশাদ বাদরানের 'কারফা তানজুকুল মুসিকী' (কিভাবে সঙ্গীতের উদ্ভব) গ্রন্থেও সঙ্গীতের উদ্ভব, বিস্তার এবং তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। গোসাইন ফাওজী সঙ্গীত যে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর সঙ্গীতগর্বিত গবেষণাগ্রন্থ 'আল মুসিকিল সান্-ফুনিয়াতা' (সঙ্গীত-সংস্কৃতির অঙ্গ)-তে।

শিল্পকলা সম্পর্কিত গ্রন্থও আধুনিক আরবী সাহিত্যে যথেষ্ট রয়েছে। শিল্পকলা যে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই সম্পর্কেও আধুনিক আরব জগৎ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ওয়াকেফহাল। আরব-জগৎও বিশ্বাস পোষণ করে যে, শিল্প এবং মানবজাতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিল্পবিহীন হওয়ার অর্থই হলো মনুষ্যত্ববিহীন হওয়া। অতএব শিল্প মানুষের সুকুমার গুণাবলীর লক্ষণ অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই আরব শিল্পীরা শিল্পকার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তাঁদের শিল্পকর্মও আধুনিক শিল্পসম্মত ধারণার অধীন। আধুনিক শিল্পে যাঁরা

কৃতিত্বের দাবিদার তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় লেবাননের ডক্টর জাবেদ সলীমের। তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকা এবং প্যারিসে শিল্প সম্পর্কিত গবেষণায় নিয়োজিত থেকে সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং লেবাননের আকাদমি অব ফাইন আর্টস-এর পরিচালকের পদ গ্রহণ করেছেন। শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি গবেষণা-গ্রন্থ লিখেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন।

যে সব গ্রন্থ আধুনিক শিল্প-কর্মে যুগান্তর আনয়নে সমর্থ হয়েছে তন্মধ্যে মুহম্মদ তাইমুরের 'আত্ তাস্বীর ইনদাল আরব' (চিত্রশিল্পে আরবের অবদান), আবদুল আজীজ হাসান কামেলের 'ফুননুত তাসবীরুদ্ দোয়ী' (শিল্পকলার উৎকর্ষ) প্রভৃতি প্রধান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দার্শনিক কবি জীবরান খলীল জীবরানও একজন উচুঁমানের শিল্পী ছিলেন এবং তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের গবেষণা ও মননশীল রচনার রূপকারগণ তাঁদের প্রতিভার দীপ্তি সবক্ষেত্রে বিস্তার করেছেন এবং এজন্যেই তাঁদের অবদানে আরবী সাহিত্য এত সমৃদ্ধ এবং উন্নত।

কথা-সাহিত্য

পবিত্র কুরআন ও হাদিসই আরবী গদ্যের উৎসকেন্দ্র। পবিত্র কুরআন ছন্দোবদ্ধ গদ্যে (Rhymed Prose) রচিত এবং হাদিসের ভাষাও নিরেট গদ্য। শুধু গদ্য কেন, আরবী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার কেন্দ্রবিন্দুও পবিত্র কুরআন ও হাদিস। যেহেতু পবিত্র কুরআন ও হাদিস আরবী ভাষায় লিখিত সেহেতু সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণ আরবী ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং এই কারণেই তাঁরা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত আরবী সাহিত্যে গদ্যরীতি একরূপ অনুপস্থিতই বলা চলে। অষ্টম শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বে আবিদ বিন শারীআ, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, মুসা বিন ওকবা, ইবন ইসহাক, শিহাব আজ্ জুহ্‌রী প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত এবং জীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এসব কথা-সাহিত্য পদবাচ্য গদ্যরীতি নয়; ঐতিহাসিক প্রবন্ধজাতীয় মননশীল রচনা। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীমের (দঃ) জীবনী সম্বলিত ইবন ইসহাকের 'আস সীরাতু রাসূল আল্লাহ্' খুবই উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে খলীফা হারুন-অর্‌-রশীদের পুত্র খলীফা আল্‌-মামুনের রাজদরবারে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের আবির্ভাব আরবী সাহিত্য ও শিল্পে এক গৌরবময় দিক সূচিত করে। এই সময়ে আরবী গদ্যরীতিতে এক নবপর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এই নবপর্যায়ের উন্মেষ ঘটে রম্যসাহিত্য কেন্দ্র করে।

রম্যসাহিত্যের প্রথম হোতা ইবন আল্ মুকাফ্‌ফা (মৃত্যু : ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর 'কালিলা ওয়া দিমনা' আরবী কথা-সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ। 'কালিলা ওয়া দিমনা' মূলতঃ সংস্কৃতে লেখা ভারতীয় উপকথা। সংস্কৃত থেকে ষষ্ঠশতাব্দীতে এই উপকথা পহলবী ভাষায় অনূদিত হয় এবং পহলবী

ভাষা থেকেই তা ইবন আল্ মুকাফ্ফা আরবীতে রূপান্তরিত করেন। ভারতীয় উপকথাব পশু-পাখী-কেন্দ্রিক বিচিত্র ধরনের কাহিনীই 'কালিলা ওয়া দিমনা'র বিষয়বস্তু।

'কালিলা ওয়া দিমনা' ছাড়াও ইবন আল্-মুকাফ্ফা 'আদ্ দোররা উল্ ইয়াতিমা ফি তা'আত্ ইল্ মুলুক,' 'আল্ আদ বুস্ সাগির,' আল্ আদাবুল কাবির,' 'সিয়ার মুলুক উল আজম' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তুও রম্যসাহিত্য-কেন্দ্রিক। কিন্তু 'কালিলা ওয়া দিমনাই' ইবন আল মুকাফ্ফাকে অমর করে রেখেছে।

'কালি া ওয়া দিমনা' অনুবাদগ্রন্থ, কাজেই এতে আববী গদ্যের ষ্টাইল বা বর্ণনাভঙ্গী নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। ভিন্ন ভাষার রূপান্তরে রূপান্তবিত ভাষার বাক্‌রীতি নিরূপণ সহজ কিন্তু সেই রূপান্তরিত পদ্ধতিকে ষ্টাইল বলা যায় না।

ইবন আল্-মুকাফ্ফার পব ইবনে কুতায়বা, আল্-জাহিজ, ইবন আবদ-আর রাব্বিহী, আবুল মা'আরী আল্ হাজিরী, ইমাদ উদ্-দীন আল কাতিব ইস্ফাহানী প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি রম্যসাহিত্য-কেন্দ্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। এ-সব গ্রন্থের মধ্যে ইবনে কুতায়বার 'উয়ূন উল আখবার', আল-জাহিজের 'কিতাব উল হাউয়ান', ইবন আবদ-আব রাব্বিহীর 'ইক্দ উল ফরিদ; আবুল মা'আলী আল-হাজিরীর 'জিনাতুদ্ দাহ্‌র', ইমাদ উদ্দীব আল-কাতিব ইস্ফাহানীর 'খারিদাতুল কাসব' প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য। এইসব গ্রন্থেব রচনার বিষয়বস্তুও যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি প্রেম, ভালবাসা, সাহসিকতা এবং অভিযানেব রসসিক্ত মিশ্রণে কাহিনীসমূহ ভরপুর। কাহিনী গুলোব বর্ণনায় অনেকক্ষেত্রে 'হাদিসের' প্রারম্ভিক রীতির মত 'হুকে আন্না' (কথিত আছে), 'কিয়ালা' (বলা হযেছে) ইত্যাদি বক্তব্যে শুরু হয়েছে এবং নীতিকথা বা উপদেশের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। গল্প বলার মধ্যে সহজ সরল রীতি প্রায়ই অনুপস্থিত, বোরালো ভঙ্গীসম্মত বক্তব্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি অনেক পাঠকের পক্ষেই বোধগম্য নয়।

দশম শতাব্দীতে আরবী গদ্যরীতির আরও উন্নতিসাধিত হয়। আববী কথা-সাহিত্যের এই নবরূপায়নে সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন

বদি উজ্জামান আল হামদানী (মৃত্যু ঃ ১০০৭ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর সামগ্রিক রচনা 'মাকামাত' বা 'মাকামাতে হামদানী' নামে খ্যাত।' 'মাকামাত'-এর আভিধানিক অর্থ 'বৈঠক।' সাহিত্য-বৈঠকের মাধ্যমে লেখক তাঁর রচনা পড়ে শোনাতেন এবং প্রত্যেকটি রচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি ছোট গল্প। এই গদ্যরীতি সমগ্র আরবজগতে এক আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং হামদানীকে 'বদিউজ্ জামান' অর্থাৎ 'কালের বিস্ময়' এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

গল্পগুলোর বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে সামাজিক জীবনের হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, দুঃখ-দুর্দশা, সাহস-দুঃসাহস ইত্যাদির সমন্বয়ে। এমনকি কোন কোন গল্পে স্যাটায়ারধর্মী মনোভাবও স্পষ্ট। এসব গল্পের জনপ্রিয়তা অল্পকালের মধ্যে সুদূর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। নমুনা হিসাবে 'মাকামাতে হামদানী'র একটি গল্পের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি।

"এসব কথা যা হিসামের পুত্র ইসা আমাদের কাছে বলেছিল ঃ 'আমি পায়ে হেঁটে আহওয়াজ জেলার পথে ভ্রমণ করতেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল কিছু নীতিকথা ও উন্নতধরণের বক্তৃতার সারবস্তু সংগ্রহ করা।

আমি শহরের এক বিরাট হলঘরের সম্মুখে উপস্থিত হলাম। দেখলাম যে, একদল লোক একজন মানুষকে ঘিরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

লোকটি অনবরত একটি লাঠি দ্বারা মাটিতে আঘাত করতেছিল। সেই ঠক ঠক আঘাতের শব্দের সঙ্গে গানও চলতেছিল। যেহেতু গানের মধুর সুর আমাকে বিমোহিত করলো, সেহেতু আমি ভীড় ঠেলে, দুই হাতে পাশের মানুষ সরিয়ে লোকটার নিকটবর্তী হলাম।

আশ্চর্য! দেখতে পেলাম লোকটা মোটা, উস্কোখুস্কো ,অন্ধ এবং এমন আলখেল্লা দ্বারা তার শরীর পরিবৃত যা তার দেহের চেয়েও বড়। সে উপরের দিকে বার বার সেই আলখেল্লা টেনে তুলে, আর তা পড়ে যায়।

লোকটার লাঠিব আগায় ঘুঙুর বাঁধা। লাঠির আঘাতের সঙ্গে মাটি থেকে ধ্বনিময শব্দ উঠছে আর লোকটি ভাঙা ভাঙা শব্দে তার মনের আবেগ গানের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। সবাই যখন এসব শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব তখন সে বললো, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমার পৃষ্ঠদেশ যে বাঁকা দেখছেন, এটা এমনি হয় নি, ঋণের ভারে জর্জরিত হয়েআমার পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে। এখন আমার সঙ্গিনী আমার কাছে তালাক প্রার্থনা করে এবং সমস্ত পণের টাকা ফিরিয়ে চায়। এককালে আমার ঘরেও ধনদৌলতের প্রাচুর্য ছিল। এখন দারিদ্র্য আমার নিত সঙ্গী। আপনাদের মধ্যে এমন সহৃদযব্যক্তি কি কেউ আছেন যিনি আমাকে এই ভাগ্য-বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করতে পারেন? দারিদ্র্য আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছে এবং আমাব সম্মানের পোশাক টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে।'

ইসা বললো যে, তাব অন্তবাত্মা লোকটির কাহিনী শুনে বিগলিত হলো এবং এই বলে সে তাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করলো: 'আহা কি উজ্জ্বল এই স্বণখণ্ডের রঙ এবং কি সুন্দর এর আকৃতি- - - -।'

অতঃপর ইসা সেই লোকটা সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করলো এবং আরও অনেকেই যে লোকটাকে দান-দক্ষিণা করলো সে সম্পর্কেও ইংগিত দিলো। পরিশেষে ইসা বুঝতে পারলো যে লোকটি ভিক্ষুক এবং সে যে অন্ধ এটা তার ভান।

সব লোক চলে গেলে ইসা তার অনুসরণ করলো এবং বাম কাঁধের উপর চাপ দিয়ে বললো: 'আল্লার কসম, তুমি তোমার গোপন কথা আমাকে খুলে বলো। আমি জানতে খুব আগ্রহী। তা না হলে আমি তোমার গোপনতত্ত্ব ফাঁস করে দিয়ে তোমাকে অপমান করবো।'

হঠাৎ অন্ধ ভিক্ষুক তার বড় বড় বাদামী চোখ দুটি খুলতেই ইসা অবাক হয়ে লজ্জায় নিজের দু'চোখ ছাপিয়ে বললো, 'আশ্চর্য! তুমি আবুল ফাতহ্ ইস্‌কান্দ্রী।'

লোকটা উত্তর দিলো: 'না।' আমি আবু কালামুন অর্থাৎ বহুরূপী।' অতঃপর সে আরও বললো, 'যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে দ্বিধা করো না, তোমার ভাগ্যের গন্তব্যস্থল তোমার হাতেই নিশ্চিত।- - - -কোন যুক্তি

যেন তোমাকে প্রতারণা না করে। জীবনযুদ্ধে বোকামির মত প্রতারণা আর কিছু নেই।'

'মাকামাতে হামদানীর' গল্পগুলো রসাত্মক ও উপদেশধর্মী। তাছাড়া ভবঘুরে জীবনের অভিজ্ঞতা, সাহসিকতার চরম পরাকাষ্ঠা ইত্যাদিও গল্পগুলোতে সংগুপ্ত। যে অর্থে 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' আরব্য উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত সে অর্থে মাকামাতে হামদানীকেও উপন্যাস বলে স্বীকার করা যায়। কেননা একই প্রধান চরিত্রের গল্প মাকামাতে হামদানীতে এমনভাবে বিস্তারলাভ করেছে যে, তার সমাপ্তি ঘটেছে কয়েকটি গল্পের মধ্যে। সব ক'টি গল্প মিলিয়ে তার মধ্যে প্রধান চরিত্র, পার্শ্ব-চরিত্র, হাসি-কান্না, অভিযান-সাহসিকতা, তত্ত্ব-উপদেশ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে জীবনের সামগ্রিক রূপ। এদিক দিয়ে বিচার করলে 'মাকামাতে হামদানী' ছোটগল্পের সমষ্টি মাত্র নয়---খণ্ড খণ্ড উপন্যাস।

বদিউজ্ জামান হামদানীর পর আরবী কথা-সাহিত্যে আর একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তাঁর পুরো নাম আবু মোহাম্মদ আল কাসিম ইব্‌নে আলী ইবন মোহাম্মদ আল্-হারিরী। সংক্ষিপ্ত নাম আল-হারিরী (১০৫৪-১১২২)। আল-হারিরীর রম্যরচনাও 'মাকামাতে হারিরী' নামে খ্যাত এবং মাকামাতে হারিরীর রচনায় গল্প বা কাহিনী-প্রধান রীতির চেয়ে উপদেশধর্মিতার বিস্তৃতিই প্রধান।

হারিরীর মাকামাতে প্রধান চরিত্র আবু জায়িদ জীবন-যুদ্ধের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়েও অটুট এবং সাফল্যের নজির হিসেবে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়েছে এবং সব সময়েই আবু জায়িদ বিজয়ের স্বর্ণখণ্ড হাতে নিয়ে তার ঔজ্জ্বল্যে আমাদের মুগ্ধ করেছে। হারিরীর 'মাকামাত'-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গল্প বলার মাঝে মাঝে তিনি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েও তার বক্তব্য জোরদার করার চেষ্টা করেছেন এবং এই রীতি বদিউজ্-জামান হামদানীর মাকামাতে একরূপ অনুপস্থিত।

দশম শতাব্দীর আরবী গদ্য-সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা'—যা আমাদের কাছে 'আরব্য উপন্যাস নামে খ্যাত।

'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' বা এক হাজার এক রাত্রির কাহিনী ভিত্তিক এই রসাত্মক গল্পগুলোর মূল উৎস সবারই জানা। কোনোও রাজা নারী-চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন এবং বিয়ের রাত্রেই শেষ প্রহরে তিনি শাহেরজাদী বা রানীকে হত্যা করতেন। কিন্তু একবার রাজা এমন শাহের-জাদীকে বাণী করে নিয়ে এলেন যিনি প্রতিরাত্রেই রাজাকে গল্প বলে ভুলিয়ে রাখতেন এবং বলতেন এর চেয়ে ভালো গল্প আগামী রাত্রে বলা হবে। এভাবে এক হাজার এক রাত্রি বিচিত্র ধরনের গল্প বলার মাধ্যমে শাহেরজাদী রাজাকে নারীহত্যারূপ অভ্যাস থেকে বিরত করলেন এবং তিনি আজীবন রানী হিসেবেই টিকে রইলেন। এই এক হাজার এক রাত্রির গল্পসমূহই 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' বা 'আরব্য রজনী'।

কেউ কেউ অনুমান করেন 'কালিলা ওয়া দিমনার' মতো 'আরব্য রজনী'ও ভারতীয় উপকথা সম্বলিত মূল সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ। ইসলামপূর্ব-যুগে পারস্যে পাহ্লবী ভাষায় এর অনুবাদ হয় এবং দশম শতাব্দীতে আরবী ভাষায় এর রূপান্তর ঘটে। 'আরব্য রজনীর' অনেক গল্পেই 'মামলুকাতুল বান্জালাতা' বা বাঙ্গালা মুল্লুকের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে, গল্পগুলোর পশ্চাৎপট সিরিয়া, পারস্য ও মিশর হলেও বাংলাদেশের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত 'আরব্য রজনী' বিভিন্ন সম্পাদকদের হাতে পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে এক নবপর্যায়ে উন্নীত হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে।

'আরব্য রজনীর' গল্পসমূহও প্রেম-বিরহ, সাহসিকতা, অভিযান, দয়াদাক্ষিণ্য, মহানুভবতা ও উপদেশধর্মিতার এক-একটি জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তাছাড়া 'মাকামাতে হারিরী'র মতো 'আরব্য রজনী'তেও কবিতার উদ্ধৃতি রয়েছে যথেষ্ট। তবে গল্প বলার ভঙ্গীতে কোন নতুনত্ব না থাকলেও গল্পসমূহ রসাত্মক এবং চিত্তাকর্ষক। এজন্যে 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' জনপ্রিয়তা আজপর্যন্তও একটু ক্ষুন্ন হয় নি।

'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা'র সময়কাল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবী গদ্যরীতি একই খাতে প্রবাহিত হতে থাকে।

আননাহ্দা বা রেনেসাঁ যুগ থেকেই আরবী গদ্যের আধুনিকীকরণ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে রেজাউল করীমের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

'দুটো ইউরোপীয় মহাসমর সমগ্র আরবজগৎকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। প্রথম মহাসমর তাকে মুক্ত করল চারশ' বছরের তুর্কিশাসন থেকে, আর দ্বিতীয় মহাসমর তাকে মুক্ত করল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে। রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আরবজগতের উপর বইতে লাগল নতুন যুগের হাওয়া। পর পর কয়েকটি বিপর্যয়ের ধাক্কায় সে দেশ প্রবলভাবে কেঁপে উঠল। মধ্যযুগীয় জড়তা, ধর্মান্ধতা, রক্ষণশীলতা অপসারিত হতে লাগল। সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল। এই পরিবর্তন কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রেই নয়, সর্বক্ষেত্রে; শিল্প-সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় একটা বিপুল পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকল। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধিত হলো এবং শিল্পী লেখক ও সমালোচকগণ অসীম সাহসের সঙ্গে নতুন যুগকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁরা আর মান্ধাতার আমলের চিরাচরিত পথে চলতে সম্মত হলেন না। তাঁরা যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেদের শিল্প-কৌশলেরও পরিবর্তন করে ফেললেন। অবশ্য সাহিত্যের গতি পরিবর্তন দু'একদিনে হলো না। একশ' বছর ধরে আরবী সাহিত্যের শিল্পী ও লেখকগণ পশ্চিমদেশের ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। তখন থেকেই আরবী সাহিত্য পশ্চিমী সাহিত্যরীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। মহাসমরের পর আরবী সাহিত্য রক্ষণশীলতা পরিত্যাগ করে চাঙ্গা হয়ে উঠ্লো।'[১]

ইতিপূর্বে 'কবিতা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মিশর-অভিযানের পর থেকেই আরবী সাহিত্যের রূপান্তর আরম্ভ হয় এবং এই রূপান্তর আরবী কথা-সাহিত্যেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধই আধুনিক আরবী সাহিত্যের সূচনা-যুগ। এই সময়ে শিল্প-বিবর্তনের ফলে নতুন ধরনের গদ্যরীতি সাহিত্যে আশ্রয়

১. রেজাউল করীম : আধুনিক আরবী সাহিত্য (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭) পৃঃ ১৬১,

লাভ করলো ; ফলে রচিত হতে থাকল সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস ও গল্প যা ইতিপূর্বে আরবী সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয় নি।

নতুন আঙ্গিকের গদ্য শিল্পরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেমন এগিয়ে আসলেন শিল্পী সাহিত্যিকরা তেমনি তাঁদের পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করল কয়েকটি উন্নতমানের পত্র-পত্রিকা। এ প্রসঙ্গে বুত্‌রুস আস বুস-তানী (১৮১৯-১৮৮৩) সম্পাদিত 'আল জিনান', আহমদ লুতফী আল সায়্যীদ সম্পাদিত 'আল জারিদা', মাহমুদ হাসান হায়কল সম্পাদিত 'আল-সিয়াসা,' রজ্জাক গান্নাম সম্পাদিত 'আল ইরাক' প্রভৃতি সম্পর্কে 'কবিতা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি জুরজী জায়দান সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত 'আল হেলাল', ইয়াকুব সারুফ সম্পাদিত ও বৈরুত থেকে প্রকাশিত 'আল মুকতাতিফ' প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে চেতনাসঞ্চারী ক্রিয়া করে।

উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় যাঁরা সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করলেন তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার সালিম আল বুস্‌তানী (১৮৪৮-১৮৮৪), বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক জামালুদ্দিন আল-আফগানীর অন্যতম শিষ্য মিশরের মুহম্মদ আবদুহ্ (মৃত্যুঃ ১৯০৫), লেবাননের দার্শনিক কবি জীবরান খলীল জীবরান (১৮৮৩-১৯৩১), মিশরের মোস্তফা লুৎফী আল-মুনফালুতী (১৮৭৬-১৯২৪), সিরিয়ার খৃষ্টান সাহিত্যিক জুরজী জায়দান (১৮৬১-১৯২৪), লেবাননের সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সায়্যীদ আল বুসতানী (১৮৫২-১৯২৭) এবং ইয়াকুব সারুফ (১৮৫২-১৯২৭), সিরিয়ার ফারাহ্ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২), ইরাকের ইবরাহীম হিলমী আল-উমর (১৮৯৫-১৯৪১) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত কথাশিল্পীদেরকে রেনেসাঁ আন্দোলন বা আধুনিক কথা-সাহিত্যের পুরোধা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং এঁরা সবাই প্রধানতঃ উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। উপন্যাসের টেকনিক, ফরম এবং ষ্টাইল ইতালী ও ফরাসী ভাষা থেকে গ্রহণ করলেও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এঁরা স্বকীয়তা অর্জন করলেন। ফলে উপন্যাসের সার্বজনীনতার জন্য কিছুসংখ্যক উপন্যাস ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করলো।

সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার এমন নিখুঁত চিত্র আরবী সাহিত্যে ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা যায় নি। এই সময়কালের উপন্যাসের মধ্যে সালিম- আল-বুসতানীর 'আতোয়াফ ফিল হাদায়েকে দামেস্ক' (দামেস্কের বাগানে ভ্রমণ) 'আল-বাদ্রু' (পূর্ণিমার চাঁদ), 'সালমা', 'সামীআ' এবং 'জেনোবিয়া; জামিল আল্-মোদাব্বারের (১৮৬২-১৯০২) 'আয়্যামে হারুন আল-রাশীদ' (হারুন-আল-রাশীদের সময়), ইয়াকুব সারুফের 'আমিনা', 'বানাতুল নীল' (নীলনদ কন্যা), 'বানাতুল মিশর' (মিশরকুমারী) এবং 'বানাতুল ফাইয়ূম' (ফাইয়ূম-কন্যা), ফারাহ্ আনতুনের 'জারাজেলামুল আনা' (বর্তমানের জেরুজালেম), 'হেরায়েতুল হাউয়ান' (জন্তু-জানোয়ারের কাহিনী) এবং মাহমুদ হাসান হায়কলের 'জয়নব' প্রভৃতি নানা কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে। এসব উপন্যাসের বিষযবস্তু রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যবহারিক জীবনের সামগ্রিক চিত্রে বৈশিষ্ট্যময় এবং নতুন আঙ্গিক, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বসাত্মক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এক-একটি নতুন জীবনের ইংগীতবহ জ্বলন্ত প্রদীপ।

উপরোক্ত লেখকদের মধ্যে জীবরান খলীল জীবরানের রচনা দর্শনতত্ত্ব-ভিত্তিক। প্রধানতঃ তিনি কবি এবং এ সম্পর্কে আগেও বলা হয়েছে। উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্প লেখক হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ ইত্যাদির অন্তরালেও একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে, যে অনুভূতি চোখে দেখা যায় না কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়; সেই অনুভবের মূল্যায়ণেই জীবরান তৎপর। ছোটগল্প যেখানে আনন্দের বার্তায় মুখর সেখানে দর্শনের পাথরচাপা দিলে সেই পাথর থেকে আপামর জনসাধারণ কতটুকু রস সংগ্রহ করতে পারবে সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাই জীবরানের ছোটগল্প সার্থক হওয়া সত্ত্বেও সর্বজনগ্রাহ্য নয়; একমাত্র চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীদেরই খোরাক।

জীবরান-রচনার বৈশিষ্ট্যময় দিক এই যে, জীবনকে তিনি উপলব্ধি করেছেন দর্শনের মাপকাঠিতে। তাই সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হতে তিনি বিরত হন নি। এ বলিষ্ঠতা ও সৎসাহসের পরিচয় তাঁর সমগ্র রচনায় পরিস্ফুট। উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'আল্বাদায়ে ওয়াত্ তারায়েফ' গ্রন্থের 'শায়তান' গল্পটির উল্লেখ করা যায়। ধর্মের মুখোশ

পর। ফাদার সামান আসলে মনুষ্যগুণ বিবর্জিত শয়তানের প্রতিকৃতি; এই তথ্যই গল্পটির মূল বিষয়বস্তু। গল্পটির সমাপ্তি টেনেছেন তিনি এইভাবে:

'উপত্যকাভূমির গভীর নীরবতা ও সূচীভেদ্য অন্ধকারে ফাদার সামান গ্রামের দিকে অগ্রসর হন। বোঝার ভারে যেন তার কোমড় বাঁকা। তাঁর কালো পোশাক এবং লম্বা দাড়ি যেন উপর থেকে নির্গত কালো রক্তের স্রোত। সম্মুখে চলার তার এই যুদ্ধ এবং মুখের বিড়বিড় প্রার্থনা যেন মৃত শয়তানের জীবন-অন্বেষা।'

মিশরের মোস্তফা লুৎফী আল মুন্‌ফালুতীও উপন্যাসিকের চেয়ে ছোট-গল্পকার হিসেবেই অধিক পরিচিত। বর্ণনার চাতুর্য ও গল্পের টেকনিক নির্মাণে তিনি সার্থক। ফরাসী ভাষার কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস আরবীতে অনুবাদ করেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এসবের মধ্যে Francois Coppee-এর Cyrano de Bergerac ও Pour la Couronne; Bernardin de Saint Pierre-এর Poulet Virginie, এবং Alphonse Curr-এর Sous les Tilleuls খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে 'আল-আবারাত' (অশ্রু) এবং 'আল নাজারাত' (দৃষ্টি) আরবী কথা-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

উপরে বর্ণিত কথাশিল্পীদের সামান্য পরপরই আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যে আর একদল সাহিত্যিকের আবির্ভাব আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধির দিকে পৌঁছে দিল। এঁদেরকে আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা যায়। এই দলে যাঁরা বিশেষ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যকর্ম পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় মুবা-এলাহী, আয়েশা তাইমুর, মোহাম্মদ তাইমুর, তাহা হোসাইন, তাওফিক আল-হাকীম, মাহমুদ তাইমুর, ইসা আবিদ, সাহাতা আবিদ, তাহির লাশিন, মোহাম্মদ আহমদ, আনোয়ার শা'উল, আবদ আল্-মাসিহ, হাদ্দাদ, আমিন হাসুনা, ইবরাহীম মাসরী, আবদুল কাদের আল্ মাজিনী, নাজিব মাহফুজ, আবদুল হামিদ জুদা শাহাব, আবদুল হালিম, আবদুল্লাহ্ আলী আহমদ বাকাসির, আমিন ইউসুফ গুরমে, মাহমুদ আল বাদারী, নাজিব আল-

আকিকী, ইউসূফ সাবায়য়ী, আবদুল হামিদ জোয়াদুাতাস্ সাহার, জুনুনুন আল আইয়ুব, ফাহমী আল মুদাররীস, ইবরাহীম সালিহ্ শাকুর, হিকমাত সুলায়মান, আবদ আল ফাত্তাহ্ ইবরাহীম, জাফর আল খলিলী, আবদ আল্ মজীদ লুৎফী প্রমুখের।

কায়রোর মুবা এলাহী (১৮৭০-১৯৩০), আয়েশা তাইমুর (১৮৪০-১৯০২), মোহাম্মদ তাইমুর (১৮৯২-১৯২১) এই তিন প্রতিভাদীপ্ত কথা-শিল্পীর কোন উপন্যাসের সন্ধান পাইনি। ছোটগল্প রচনায় এঁরা তিনজনই সিদ্ধহস্ত। মুবা এলাহীর ছোটগল্প সংকলন 'কাসাসুল ইসা বিন হিসাম' আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা হলেও গল্পের টেকনিক আয়ত্ত করা হয়েছে প্রাচীনপন্থী 'মাকামাত' কিংবা 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' থেকে। অনুরূপভাবে আয়েশা তাইমুরও প্রাচীন ধারার 'মাকামাত' থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। তবে তাঁর গল্পে মুসলিম ঐতিহ্য ও সামাজিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করবার মতো। আয়েশা তাইমুর লিরিকধর্মী কবিতা ও মর্সিয়া লিখেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। মোহাম্মদ তাইমুর মুবা এলাহী ও আয়েশা তাইমুর থেকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম। তিনি ছিলেন গদ্য মোপাসাঁ ও চেখভের অনুসারী এবং ফলে মোহাম্মদ তাইমুর এর রচনায় তাঁদের ছাপ সুস্পষ্ট। 'নাজারতু শাইয়্যান' (সব কিছু দেখেছি) তাঁর ছোটগল্প সংকলন। মননশীল প্রবন্ধ ও নাটক রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আধুনিক আরবী সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে নাটক রচনা করেন।

মিশরের ডক্টর তাহা হোসাইনকে (১৮৮৯-১৯৭৩) আধুনিক আরবী সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত করা যায়। আরবী গদ্যরীতির প্রাচীন ধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে তিনি আরবী সাহিত্যে এক নতুন রীতির প্রচলন ঘটালেন। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হলেও স্বকীয়তা ও আধুনিক মনোভঙ্গীসঞ্জাত ধারণা তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে রেখেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সম্পূর্ণ অন্ধ হয়েও তিনি দুই বিষয়ে 'ডক্টরেট', প্রতিভার বলে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রেক্টর' এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদে পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। বলা আবশ্যক যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাহিত্যে যখন চেতনাসঞ্চারী ক্রিয়া চললো তখন

তিনি প্রকাশ করলেন বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ 'ফিল আদাবিজ জাহেলী' (অন্ধযুগের সাহিত্য)। আরবী সাহিত্যের উপর এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নি। ফলে, আধুনিক সাহিত্যিক জগৎ কর্তৃক তা সাদরে গৃহীত হলো। এর অল্পকাল পরেই প্রকাশিত হলো তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আল আইয়্যাম' (কালের গতি)। 'কালের গতি'র গদ্যরীতি আধুনিক আরবী সাহিত্য-দর্পণে এক নতুন প্রতিবিম্বের ছায়া ফেললো, যার সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ এবং বিস্ময়াবিষ্ট। আমরা এখানে আল-আজহাবের ছাত্রজীবনে তাঁর অভিজ্ঞতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। উল্লেখযোগ্য যে, 'আল-আইয়্যামে' তিনি নিজেকে 'হুয়া' (সে) বা 'হুযাল ওয়ালাদু' (সেই বালক) বলে তৃতীয় পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন :

'সেই বালক থামের পাশে বসলো এবং চেয়ারের শিকল খেলনার ছলে নাড়তে নাড়তে অধ্যাপকের (শায়খ) বক্তৃতায় মন দিল। অধ্যাপক হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। বালক তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পাবলো এবং তাঁর বক্তৃতায় সমালোচনার কোন সূত্র খুঁজে পেল না। কেবল তাঁর কাছে যা বেসুরো ঠেকলো তা এই যে—প্রত্যেকটি হাদিসের উৎস এবং ব্যাখ্যাকারীদেব নাম বর্ণনা।

অধ্যাপক কিছু বলেই 'ইত্যাদি' 'ইত্যাদি' বলে তাঁর বক্তৃতা বিলম্বিত করছিলেন। অধ্যাপকের এই সুদীর্ঘ নামের তালিকায় এবং অযথা উৎস সন্ধানের মধ্যে সেই বালক কোন অর্থই খুঁজে পেল না।

সে অধ্যাপকের কাছে আসলে হাদিস এবং তার যথার্থ ব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছুক। এবং যখনই সে অধ্যাপকের কাছে আসল হাদিস শুনতে পেলো তখনই সে তা হৃদয়ঙ্গম করলো এবং মুখস্থ করে ফেললো। কিন্তু সেই হাদিসের ব্যাখ্যায় অধ্যাপকের বক্তৃতা আবার তার কাছে একঘেয়েমিতে পরিণত হলো যেমন একঘেয়েমি লাগতো তাদের গ্রামের মসজিদের ইমামের একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি।

যখন অধ্যাপক বক্তৃতা করতেন এবং ছাত্ররা সেই বক্তৃতার আলোচনায় গুঞ্জন তুলতো, তখন মনে হতো যেন আল-আজহার তন্দ্রার পর আস্তে

আস্তে জেগে ওঠছে, চোখ খুলছে। অধ্যাপক এবং ছাত্রদের কণ্ঠস্বর মিলে এমন এক সুরধ্বনির সৃষ্টি করতো যার সর্বোচ্চ স্বর সর্বোচ্চ শব্দে গিয়ে মিলিত হতো 'আল্লাহ সব কিছু জানেন'।

অতঃপর সেই ছেলের ভাই আসতো, কোন কথা না বলে তার হাত ধরে অন্য স্থানে নিয়ে যেতো এবং বস্তার মত তাকে একাকী এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে দিয়ে চলে যেতো।

সেই বালক বুঝতে পারলো যে, তাকে আইনের ক্লাসে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। সে অধ্যাপকের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং ছাত্ররা চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকতো। এমনকি সবাই চলে যাওয়ার পরও সে সেখানে থাকতো যতক্ষণ না তার ভাই সাইয়ীদনা আল-হোসেন থেকে তাকে নেবার জন্য না আসতো।- - - - - -তার ভাই আসতো এবং কোন কথা না বলে তাকে আল-আজহারের বাইরে আবাস-স্থলে নিয়ে যেতো এবং তাকে পুরোনো কার্পেটবিছানো মেজের পুরোনো খাটে বেখে চলে আসতো।

'আল-আইয়্যামে' তাঁর অন্ধ-জীবনের অভিজ্ঞতা বিধৃত, কিন্তু কোথাও আবেগের আতিশায্য নেই; বরঞ্চ শিক্ষণীয় মাধুর্যে পূর্ণ।

মিশরের গণ্ডগ্রামে তাঁর জন্ম। পল্লীগ্রামের আপামর জনসাধারণের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব অভিযোগের নিখুঁত ছবি চিত্রিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্প সংকলন 'আল-মুয়াজ্জাবুন ফিল আরদ' (ঘামে ভেজা মাটি) গ্রন্থে। অন্ধ হয়েও যে তিনি সূক্ষ্ম-অনুভূতি দিয়ে সমাজ-জীবনকে আশ্চয-সুন্দর করে দেখতে পেয়েছেন এইটেই সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'আল ওয়াদাল হক' (সত্যের প্রতিশ্রুতি)। রাসূলে করীম (দঃ)-এর সমগ্র জীবনই সত্যিকারের 'সত্যের প্রতিশ্রুতি' এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ নিজের জীবনে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বিশ্ববাসীকে এমন সম্পদ উপহার দিয়েছেন যার আলো কোনোদিনই নির্বাপিত হবে না।

ডক্টর হোসাইন সেই বিষয়বস্তুই উপন্যাসের মাধ্যমে এমন সুন্দরভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন যে, বিশ্বের জাতীয় সম্পদ হিসেবেই তা টিকে থাকবে। 'আল ওয়াদাল হক'-এর চলচ্চিত্ররূপ 'জহুরুল ইসলাম' (ইসলামের প্রকাশ)।

'সাজারাতুল বুয়ুস' (দুঃখের বৃক্ষ) এবং 'দোআউল কারোয়ান' (কোকিলের ডাক) গ্রন্থ দু'টি সামাজিক উপন্যাস। এতে মিশরের সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না অনুরণিত।

ডক্টর তাহা হোসাইন ছিলেন অন্ধ কিন্তু অর্ন্তদৃষ্টির আলোকে যে জগৎ তিনি দেখেছেন সে জগৎ স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার জগৎ এবং সেই স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার জগৎই তিনি ব্যাপ্ত করেছেন তাঁর সামগ্রীক রচনায়। তাঁর প্রত্যেকটি রচনা স্বচছ এবং বুদ্ধিদীপ্ত।

আধুনিক আরবী সাহিত্য ভাণ্ডার ডক্টর তাহা হোসাইনের অবদানে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'আল আইয়্যাম', 'আল ওয়ান', 'আদিব', 'তাজাদিদ জিকরী আবিল উলা', 'জান্নাতুশ্ শাওক', 'দোআউল কারোয়ান', 'শাজারাতুল বুয়ূস', 'ফিল আদাবিজ জাহেলী', 'আল মুয়াজ্জাবুন ফিল আরদ', 'ফুসুল ফি আদাব ওয়ান নাকাদ', 'মুস্তাকবালাস্ সাকাফাতা ফি মিস্র' এবং 'আল ওয়াদাল হক' প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

মিশরের বিখ্যাত কথাশিল্পী আবদুল কাদির আল-মাজান্নীর গদ্যরীতিও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসঞ্জাত। দেশজ সম্পদকে তিনি ব্যবহার করতে পেরে নিজেকে গৌবান্বিত বোধ করেন। তাই আপন দেশের ঐতিহ্য তাঁর রচনায় পরিস্ফুট। তাঁর বাকরীতি, রূপক ও উপমা নির্বাচন, নতুন নতুন শব্দপ্রয়োগ এবং যৌগিক বাক্যের বর্জনরীতি রচনাকে সুখপাঠ্য করেছে।

মিশরের সমাজ-চৈতন্য ও জীবনদর্শন তাঁর লেখার মূল উপজীব্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণরূপ তাঁর গল্পসংকলন 'ইবরাহীম আস্ সানীতে' (দ্বিতীয় ইবরাহীম) বর্তমান। তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এবং রম্যরচনার সংকলন 'কাবজের রীহ্' (হাওয়ার হাত) আরবী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সাহিত্যিক বাবা-মা ভাই-বোন নিয়ে যে 'তাইমুর' 'পরিবারের খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন মিশরের মাহমুদ তাইমুর (জন্ম: ১৮৯৪)। কথাশিল্পী হিসেবে তিনি এতই দক্ষ যে, তাঁকে আরবী সাহিত্যের মোপাসাঁ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। লেখকের অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং সেই অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ যেন জীবন-চেতনার চিত্রবিচিত্র প্রতিচ্ছবি। তাঁর ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল এবং হৃদয়স্পর্শী। ছোটগল্পের সংজ্ঞায় তাঁর রচনা যে কতটা সার্থক তারই নমুনা হিসেবে সুদীর্ঘ হলেও 'আল মাওত' (মৃত্যু) গল্পটির অনুবাদ এখানে পেশ করছি:

[হারে মর খোজা লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার অসুস্থ চাকর মুসতাফা হাসানের কক্ষে ঢুকলেন। কক্ষটি আবর্জনায় ভর্তি। একটিমাত্র সরু পথ। চিকন সুতোর মতো সূর্যের প্রখর রশ্মি সেই সরুপথ বেয়ে কক্ষে এসে ঝকমক করে ওঠে। কক্ষের আসবাবপত্র পুরনো এবং ভাঙা। সব চয়ে দেখার মতো ঠাণ্ডা বিছানাটা। ছেঁড়া ময়লা চাদরটা ঝুলে পড়ে আছে। এসব কিছুতেই প্রমাণ করে না যে, এখানে কোনকালে মূল্যবান কিছু ছিল।

মুসতাফা হাসান নিজের সম্পর্কে খুব সচেতন। এ কারণেই তাঁর পক্ষে দু'শ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ জমানো সম্ভব হয়। নিজের জীবনের চেয়ে এই দিকেই তাঁর ঝোঁকটা ছিল প্রবল।

ডাক্তার রুগীর নাড়ী টিপলেন, টেথিস্কোপ দিয়ে বুক দেখলেন এবং ভালো করে ফুসফুসটা পরীক্ষা করলেন। অতঃপর খোজা লোকটিকে বাইরে ডেকে নিয়ে কানের কাছে বললেন, 'রোগী দু'ঘণ্টার বেশী বাঁচবে না।'

ডাক্তার বিদায় নিলেন। খানিকক্ষণ পরে রোগী চোখ মেললো। হঠাৎ খুশখুশ কাশি উঠলো। কতক্ষণ হাইফাই করে উবু হয়ে পড়ে রইলো।

মুসতাফা হাসান এই বাড়ীর মৃত মালিক পাশার চাকর। আট বছর বয়সের সময় তাকে দূরের কোন বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছিল।

বালক মুসতাফা বিশ্বাস ও কাজের যাদু দিয়ে প্রভুকে বশ করলো। প্রভু খুশী হয়ে তাকে সমস্ত সম্পত্তি দেখাশুনার ভার তার উপর অপণ করলেন।

অল্পদিন পর মুশতাফা হাসানের ভাবান্তর দেখা দিল। সে অন্যমনস্ক। দায়িত্বপালনে তার অনীহা। এতে প্রভু ক্ষুণ্ন হলেন এবং তার পদমর্যাদা কেড়ে নিলেন। মুসতাফা তখন অবজ্ঞার পাত্র। অবশেষে বুড়ো দ্বাররক্ষক আম্ম মারজানের মৃত্যুর পর তাকে সেই পদে বহাল করা হলো।

প্রভুর মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত সে দ্বাররক্ষকই ছিল। প্রভুপত্নী যখন গৃহের একচছত্র কর্ত্রী, তখন তিনি মুস্তাফা হাসানের প্রতি অনুগ্রহ দেখালেন। একটা মোটা ভাতা বরাদ্দ করে তিনি মুসতাফাকে চাকরি থেকে অবসর দান করলেন।

বছরখানেক আগে থেকে মুসতাফা ফুসফুস-যন্ত্রণায় ভুগছে। রোগ এত সাংঘাতিক যে, বাঁচবার আর কোন আশা নেই। সে এখন শেষ নিঃশ্বাসের জন্য তৈরী।

ডাক্তারকে পথ দেখিয়ে দিয়ে খোজা লোকটি উপরতলায় গৃহকর্ত্রীর কক্ষে চলে গেলো। তিনি তখন জায়নামাজে বসে পবিত্র কুরআনের সূরা 'ইয়াসীন' পাঠ করছিলেন। পাশে একজন বৃদ্ধা মহিলা। তিনি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। খোজা লোকটির পায়ের শব্দে গৃহকর্ত্রী চোখের সোনার চশমাজোড়া কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার কি বললেন বশীর আগা ?'

বশীর আগা দুই হাতের তালুতে চোখ ঘসে কেবল আমতা আমতা করলো।

'মুসতাফা হাসান কি বেঁচে নেই ?' গৃহকর্ত্রী উত্তেজিত হলেন।

খোজা লোকটি ততক্ষণে অনেকটা শান্ত অবস্থায় ফিরে এসেছে। সুতরাং সে চট করে জবাব দিল, 'মুসতাফা এখনো মরে নি। তবে মনে হয় প্রায় শেষনিঃশ্বাসের কাছাকাছি এসে গেছে।'

গৃহকর্ত্রীর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেয়ুন---নিশ্চয়ই সব কিছু আল্লার এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।' সেই সঙ্গে তিনি মুসতাফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মুসতাফা, তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য সুরা ফাতেহা (আলহামদু লিল্লাহে) পাঠ করা উচিত।'

তিনজনে মিলে সুরা ফাতেহা পাঠ করলেন। বশীর আগা ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলো দশটা বাজে। সে মনে মনে আওড়ালো, 'মুসতাফা হাসান ঠিক বারোটায় মারা যাবে। ---দিবালেকের মতেই একথা সত্য।'

ওখান থেকে চলে এসে বশীর আগা রোগী মুসতাফা হাসানের কক্ষে প্রবেশ করলো। কারণ সেই কক্ষ পাহারা দেবার ভার ছিল তার উপর। সে তো মুসতাফা হাসানের কাছে নিযুক্ত কর্মচারী। এবং মুসতাফা হাসানের মৃত্যুর পর সব সম্পত্তির মালিক তো সে নিজেই।----

মুমূর্ষ মুসতাফা হাসানের সংবাদ পেয়ে চারদিক থেকে অন্যান্য চাকররা ভেড়ার পালের মতো চলে এলো। তারা দেখলো বশীর আগা তালাবন্ধ করে লাঠি হাতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে যে ঢুকতে চাচেছ তাকেই লাঠি দিয়ে তাড়া করছে।

'মুসতাফা হাসান কি বেঁচে নেই?' সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। 'না, মরেনি। মৃত্যুর কাছাকাছি।' বশীর আগার সংক্ষিপ্ত এবং উত্তেজিত জবাব।

সব চাকর বুঝতে পারলো ভেতরে ঢুকবার কোন পথ নেই। তাই আস্তে আস্তে তারা পথ ধরলো। দু'একজন বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো খোজা লোকটির সাথে কথা বলার জন্যে।

আর একদল ছেলেমেয়ে আসলো মুসতাফা হাসানের মৃত্যু দেখার জন্য। তারা জানালায় রোগীমুখো হয়ে দাঁড়ান। একজন জনতার ভীড় ঠেলে সামনে এসে বললো, 'কী আশ্চর্য, ওর পেট এতো ফুলেছে কেন? এযে আকাশ ছুঁতে চাচেছ।'

দ্বিতীয় বালকের কথায় দৃশ্য চাপা পড়লো। সে প্রথম বালকের প্রতি একচক্ষু রাগ দেখালো, 'কেবল ওর ফোলা পেটটাই দেখলে। ওর চোখের আগুনের ফুলকি দেখেছো? মুখে রক্তভেজা থুথু! আগুন---রক্ত---আগুন---রক্ত----।

সবাই চলে গেলো। কিন্তু তাদের সব কথা বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মতো আন্দোলিত হতে লাগলো।

খোজা লোকটি ভালো করে তাকিয়ে দেখে ঘড়িতে এগারটা বাজে। সে মনে মনে বললো, 'মুসতাফা হাসান, তোমার কাছে আজরাইল আসতে আর মাত্র এক ঘন্টা বাকী। তারপরই তুমি আর এক নতুন জগতের অধিবাসী। তখন আমি তোমার জমানো ধন-সম্পত্তি থেকে আমার পছন্দমত অনেক কিছু নিয়ে নিতে পারবো।'

সর্দার আমম্ মাদবুলী একজন ধার্মিক ও প্রাচীন লোক। তাঁর কাছে গিয়ে খোজা লোকটি বললো, 'আর মাত্র এক ঘন্টা। তারপরই মুসতাফা হাসানের জীবনলীলা সাঙ্গ হবে। তার ধন-সম্পত্তি কি আমরা নিতে পারি? অথবা, সেগুলো কি চাকরবাকরদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া ভালো মনে করেন?'

বৃদ্ধ সর্দার কেবল মাথা নাড়লেন। সে মাথা নাড়ায় একটা গূঢ় ইংগীত সুস্পষ্ট। আমতা আমতা করে বললেন, 'যা ভালো মনে করো তাই করবে।'

'আপনাকে দেবো কয়েকজোড়া দামী জুতো, তিনটে লম্বা কোর্তা আর একটা পশমী কম্বল।'

'আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, তুমি নিজে কিছু নেবে না?'

'না, কিছুই নয়। টাকার থলেটা পর্যন্ত আমি আমার গৃহকর্ত্রীর হাতে সমর্পণ করবো।'

এই কথোপকথন শুনে ঝাড়ুদার তাদের কাছে ঘেঁসলো। খুব নরম গলায় খোজা লোকটির দিকে চেয়ে বললো, 'হুজুর, আমার বিশ্বাস আমার কথা আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই।'

'তোমাকে ভুলিনি ওসমান। তোমাকে কয়েকজোড়া স্যাণ্ডেল দেব। অনেকগুলো মূল্যবান স্যাণ্ডেল আছে।'

ওসমান মহা খুশী। চোখ দুটো বড় করে বললো, 'আল্লাহ্ আপনার ভালো করুন! আর কাশ্মিরী শালটা আমার ভাগে পড়বে না?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

ওসমান আনন্দে খোজা লোকটির সাথে মুসাফা করলো।

ভিস্তিওয়ালা আবদুল কাওয়াবী অদূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সে এসে প্রতিবাদের সুরে বললো, 'আমি ওর বহু সেবাযত্ন করেছি। আমি কি তার সম্পত্তির কানাকড়িও পাবার যোগ্য নই?'

'তুমি কি মনে করো আমরা তোমার কথা ভুলে গেছি? বোকা কোথাকার?' খোজা লোকটি গর্জন করে উঠলো।

আবদুল কাওয়াবীর আনন্দ আর ধরে না। বক্তব্যের সাথে কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে বললো, 'আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের সঙ্গী করুন। আমি সামান্যই চাই। প্রথমতঃ ঘন কালো উজ্জ্বল জুতো জোড়া—যেটা পাশা বাহাদুর মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন।

দ্বিতীয়তঃ, নতুন পাগড়ীটা। গতবছর মাত্র ওটা মুসতাফা হাসান কিনেছিল। একদিনও সেটা ব্যবহার করা হয় নি।

তৃতীয়তঃ, ঈদের মৌসুমে কেনা সেই শালটা। যা একেবারে আনকোরা। একটু ভাঁজও ভাঙ্গে নি।

চতুর্থতঃ-- - - - - - -'

আম্ম মাদবুলী ভিস্তিওয়ালাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি দেখছি কিছুই বাদ রাখবে না। আরও অনেক চাকর-বাকর আছে। সমস্ত ধন-দৌলত আমরা সুন্দরভাবে বিতরণ করতে চাই। মোল্লা শায়েখ আবদুল হাই, বাবুর্চী আলী ও তার ছেলে এবং ঝাড়ুদার সাইয়ীদ মুতওয়াল্লী ওরা কি কিছু পাবে না? আর তুমি- - - - -'

ঘরের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদের স্বর ভেসে আসলো। কবরের মাঝখানের অস্বাভাবিক শব্দের মতোই ভীতিপ্রদ এবং প্রকট। এই আর্তনাদ মুসতাফা হাসানের বিকট চীৎকার।

খোজা লোকটি ভয়ে আড়ষ্ট হলো। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে সবাইকে ডেকে বললো, 'বন্ধুগণ, সময় হয়ে গেছে। মুসতাফা হাসান এখনই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। চলো আমরা ভিতরে যাই।'

দরজার তালা খুলে দিলে দমকা হাওয়ার মত সব চাকর ঘরে ঢুকলো। রোগীর বিছানা ঘিরে দাঁড়ালো। মুসতাফা হাসান মাথাটা সামান্য উঁচু করে বশীর আগার হাতটা জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বললো, 'ডাক্তার কি বললেন বশীর আগা? শুনলাম, তোমরা আমার জিনিসপত্র নিয়ে কিসব বলাবলি করছো? ওসব কি আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে?'

বশীর আগা মাথা নীচু করলো। নীরব। রোগীর মুখটা তখন পাণ্ডুবর্ণ। সারা শরীরে অসম্ভব কাঁপুনি। খুক্ করে কয়েকবার কেশে হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়লো। সবাই ভাবলো মুসতাফা হাসান আর বেঁচে নেই। সমস্ত ঘর জুড়ে একটা নিস্তব্ধতা। সবাই খোজা লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বশীর আগা বুঝতে পারলো কি তাদের অভিপ্রায়। সে সর্দার আম্মম মাদবুলীর দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কানে কানে কী সব বললো। আম্মম মাদবুলী রোগীর শিয়রে পৌছে বালিশের নীচেকার চাবির কৌটো সাবধানে সরাবার চেষ্টা করলেন।

হঠাৎ রোগী (যাকে মৃত বলে ধারণা করা হয়েছিল) চোখ মেলে চাইলো। আম্মম মাদবুলী চট করে হাতটা সরিয়ে নিলেন এবং মুসতাফা হাসানকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি তার এলোমেলো বিছানাটা ঠিক করে দিতে যাচ্ছিলেন। গোপন অভিসন্ধি ঢাকবার জন্যে তার কানের কাছে আস্তে করে বললেন, 'মুসতাফা হাসান, তোমার চাবিগুলো দাও, বাক্স খুলে তোমার জন্য একটা জামা ও একটা চাদর নিয়ে আসি। মনে হচ্ছে, তোমার খুব শীত করছে।'

'দরকার নেই, জনাব। ওসব আমি ভালো হয়ে ব্যবহার করবো।' বলে রোগী পাশ ফিরলো। একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করলো সে। অন্য একজনের একটা হাত বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অবোধ শিশুর মতো আতস্বরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, 'আমি কি মরবো? আমি মরবো না। আমি মরবো না। আমি যেন অনেকটা ভালো বোধ করছি।'

মুসতাফা হাসানের চোখে অশ্রুর বন্যা। কণ্ঠও ভিজা। সে বিছানায় বসতে চেষ্টা করলো, 'আমি বলতে চাই। আমার মনে হচ্ছে আমার দেহে নতুন শক্তি পাচ্ছি। তোমরা আমাকে একা থাকতে দাও। আমাকে যতটা দুর্বল মনে করো আমি ততটা নই।'

মুসতাফা হাসান কথাগুলো বললো অবশ্যি, কিন্তু নিঃশ্বাস টানতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ সে ধপাস করে বিছানায় পড়ে গেলো। দুটো চোখ ফ্যাকাশে। শ্বাস নেবার জন্যে মুখটা একবার হা করছে আবার বন্ধ করছে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত শরীরে অসম্ভব খিচুঁনী শুরু হলো। থুথুর সাথে বেরিয়ে এলো একদলা রক্ত। অতঃপর সব শেষ। মুসতাফা হাসান নীরব। নিশ্চল।

আম্‌ম মাদবুলী কাছেই ছিলেন। একটা কাপড় এনে মৃতদেহ ঢেকে দিলেন। এবারে নির্বিঘ্নে বালিশের নীচে হাত দিয়ে চাবির কৌটোটা সরিয়ে নিয়ে বশীর আগার হাতে অর্পণ করলেন। - - - - - - -

বশীর আগা ভাবলো এইবার তার গৃহকর্ত্রীর কাছে যাওয়া দরকার। বুদ্ধিমানের মতো তাঁর কাছে পৌঁছে চাকরের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে বললো 'এখন মুসতাফা হাসানের দাফনের জন্য টাকা-পয়সা প্রয়োজন।'

ভদ্রমহিলা তাকে অনেক টাকাকড়ি দিলেন। টাকার থলে নিয়ে সে সোজা চলে গেলো তার কামরায়। দরজাটা ভাল করে এঁটে দিল। থলের মুখটা খুলে কোলের মাঝখানে নিংড়ালো। আনন্দের আতিশয্যে গুণে দেখলো টাকার পরিমান দু'শ পাউণ্ড। গোণা শেষ করে হাতের দুটো তালু একত্র করে কতক্ষণ ঘষলো এবং বিশেষ যত্নসহকারে টাকাগুলো

নিজের পাত্রে রেখে দিল। বিড় বিড় করে বললো, 'মুসতাফা হাসান, তুমি উত্তম কাজ করেছো। ---কাজের মতো কাজ।---- তুমি বড় ভালো মানুষ ছিলে। তাই -----'

ততক্ষণে ঘর থেকে চাকররা সব লুট করে নিয়ে গেছে। সেখানে কেবল পড়ে আছে মৃত দহটি আর ভাঙ্গা আসবাবপত্রের ধ্বংসাবশেষ।

সেদিনই বিকেল চারটায় মুসতাফা হাসানের মৃতদেহ কবরস্থ করা হলো। এই কাজের ভার দেয়া হয়েছিল কয়েকজন শায়খকে। তাঁরা কেবল মুখে মুখে আওড়াচ্ছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্'। আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই।'

মৃতদেহটির পেছনে পেছনে বশীর আগার নেতৃত্বে একদল চাকর গিয়েছিল কবরস্থানে। সে ছাড়া সবাই নতুন জামা-কাপড় পরিহিত এবং তাদের পায়ে ঝকমকে জুতো। ওসব কাপড়-জুতো তারা মৃত মুসতাফা হাসানের ঘর থেকে লুঠ করে নিয়েছিল।

ভিস্তিওয়ালা আবদুল কাওয়াবী ছাড়া সবাই নিজ নিজ প্রাপ্যে ভয়ানক খুশী। সবাইকে বেশ-ভূষায় সজ্জিত দেখে সে আফসোস করে বললো, 'আমি কি মুসতাফার জন্যে কম খেটেছি? বিনিময়ে আমার কি কিছুই পাওয়া উচিত নয়? কুশ্রী ওসমানকে দ্যাখো, কি সুন্দর কাশ্মিরী শাল পরে আছে! নতুন পাগড়ী ও লাল জুতোজোড়া কি সুন্দর মানিয়েছে তাকে! আর আম্‌ম মাদবুলী? জীবনে এমন দামী সার্ট কখনো দেখেছে? দামী কম্বল আর ডজনখানেক মোজার কথা না হয় নাই বললাম!'

মাদ্রাসার শিক্ষক আল-বাইয়ূমী শুধু তার দিকে একবার তাকালেন এবং বললেন, 'আবদুল কাওয়াবী, তুমি কি কি পেয়েছো?'

'এই পুরনো স্যাণ্ডেলজোড়া ছাড়া আর কিছুই পাইনি। মুসতাফা হাসান মাত্র দশ আনায় এটা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে খরিদ করেছিল।' ভিস্তিওয়ালা অভিমানের সুরে কথাগুলো বললো।

বশীর আগা তারদিকে ফিরে থুথু ফেলে পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করে অবজ্ঞার সুরে ধমকে উঠলো : চুপ কর হারামজাদা।--- শয়তান----কোথাকার!']

উপরিউক্ত গল্পটিতে মাহমুদ তাইমুর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এমন মুন্শিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন যা যে কোন দেশের সুধীসমাজ কর্তৃক আদৃত হবার যোগ্য। নিজস্ব ভঙ্গী ও স্বকীযতার জন্য মাহমুদ তাইমুর আরবী কথা-সাহিত্যে এমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন যাকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরী হয়েছে।

আরবী কথা সাহিত্যে তাইমুর ষ্টাইলের অনুসারী হয়ে যাঁরা নিরলস কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে মিশরের ইসা আবিদ, শাহাতা আবিদ, তাহির লাশিন, ইরাকের মোহাম্মদ আহমদ, আনোয়ার শাউল এবং আমেরিকায় বসবাসকারী আব্দ আল-মাসিহ্ হাদ্দাদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে তাহির লাশিন রসরচনায় দক্ষ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মাহ্মুদ তাইমুরের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় পঞ্চাশখানা গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে; তন্মধ্যে 'আবুল হোল ইয়াতির', 'ইবনে জ্বা'লা', 'আ'লামুল মুহেদ্দেসীন ফিল ইসলাম', 'আবুশ্ শাওয়ারেব,' 'দুনিয়া যাদিদাতু', 'সালওয়া ফি মুহেব্বের রীহ্', 'শাফাউর রূহ', 'শাবাব ওয়াগানিয়াত', 'আতারা ওয়া দুখান', 'কাজেব ফি কাজেব'। 'কুল্লু আমেন ওয়া আনতুম্ বিল্ খায়ের', এবং 'আন্নাবী উল ইসলাম' প্রধান।

আরবী গদ্যরীতির নবরূপায়নে মিশরের প্রখ্যাত কথাশিল্পী তাওফিক আল-হাকীমের (জন্ম : ১৯১২খৃঃ) অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কেবল শিল্পের জন্য শিল্প নয় (Art for art's sake), জীবনের জন্যও যে শিল্প (Art for life's sake) অপরিহার্য এই সত্যের মূর্তপ্রকাশ তাওফিক আল-হাকীমের রচনায় বিদ্যমান। জীবন সত্যের প্রতিচ্ছবি, সেই সত্যের অপলাপ যারা করতে চায় তারা মিথ্যার বেসাতীই করে, সত্যের শরীরে কলঙ্কলেপন করতে সমর্থ হয় না। জীবন তথা সাহিত্যকে শিল্পসমৃদ্ধ করার অভি-

প্রায়েই তিনি মিশরের তদানীন্তন স্বৈরচারী সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন তাঁর 'হেমারুস হাকিম' (বুদ্ধিজীবীর গাধা) উপন্যাস লিখে।

মাহমুদ তাইমুরের শৈল্পিক চাতুর্যে যেখানে 'আবুল হোত ইয়াতির' বা 'পীরামিড উড়ে' সেখানে তাওফিক আল হাকীম এর শৈল্পিক খোরাকের লোভে 'আবুল হোত ইয়াতাকাল্লাম' বা 'পীরামিড কথা' বলে। সমসাময়িক প্রখ্যাত কথাশিল্পী ইউসুফ সাবায়য়ীর 'আস মা'জী লা ইয়ায়ুদ' (অতীত ফিরে না) মতবাদে তাওফিক আল-হাকীম বিশ্বাসী নন। তিনি অতীত ও বর্তমানকে এমন স্বর্ণ-শিল্পে আবদ্ধ করেছেন যে, তা ভবিষ্যতেরও গৌরবের বস্তু। তাই তিনি মিশরের প্রাচীন ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য পীরামিড, মমি, লোক-গাঁথা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যেসব উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন তাতে অতীত অবশ্যি কথা বলে, তবে বর্তমানকালের জানালায় মুখ রেখে। তাঁর 'তাহতা শামসিল ফেকর' (সূর্যের নীচে ধ্যান) উপন্যাসেও একই ধরনের সূক্ষ্ম অনুভূতি আশ্রিত।

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে মিশরের যে ক্ষতিসাধিত হয় তা নিঃসন্দেহে অপরিসীম। শিল্প-বিবর্তনের পর সেখানে যে-নব অভ্যুত্থান দেখা দিল তা মিশরবাসীর পক্ষে নবজীবনের সন্ধান দিল, সন্দেহ নেই। এই পশ্চাতপটে চিত্রিত তাঁর উপন্যাস 'আওদাতের রুহ' (আত্মার প্রত্যাবর্তন) আধুনিক আরবী কথাশিল্পের একটি অমূল্য সম্পদ।

আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যে তাওফিক আল-হাকীমই সম্ভবতঃ বেশী পরিচিত নাম। শুধু সংখ্যাধিক্যে নয়, উৎকর্ষ বিচারেও তাঁর রচনা শিল্পসমৃদ্ধ। ভাষার প্রাঞ্জলতা, আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাঁর রচনায় যা লক্ষ্যযোগ্য তা হলো এই যে, তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে সকলের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন। নাটক, প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, রম্যরচনা ও রসসাহিত্য সহ তাঁর চল্লিশখানা প্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান আমরা পেয়েছি। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি। যেমন, 'আহলের কাহাফ, 'আর নি আল্লাহ্', 'বি জামালিউন', 'তাহতাশ শামসিল ফেকর', 'হেমারুল হাকিম', 'রাকেসাতুল মা'বুদ', 'রেসালাতু কিলকালব,' 'সোলায়মান আল হাকিম', 'শাহেরজাদ', 'শাজারাতুল হেকম', 'আওদাতের রুহ', 'আহাদাশ

১০—

শায়তান', 'ওসুফুরু মিন আল শারক', 'মহম্মদ', 'রেহালাতু ইলাল গাদ', আর রাবাতুল মোকাদ্দাস', 'জাহরাতুল আমর', 'সুলতানুল আজলাম', 'আস সাফকাত', 'ফুনুনুল আদব', 'আল মালাক আওদিব' এবং 'মেসরাহুল মুজতামা'।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আহলেল কাহাফ', 'শাহেরজাদ' ও 'মহম্মদ' এই তিনটি নাটক এবং 'ফনুল আদব' মননশীল প্রবন্ধ পুস্তক। 'আরানি আল্লাহ্' এবং 'রাকেসাতুল মা'বুদ' গ্রন্থ দুটিতে সমাজজীবনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রসোত্তীর্ণ ভাষায় কটাক্ষ করা হয়েছে।

তাওফিক আল-হাকীমের সমসাময়িক মিশরের আর একজন কথাশিল্পী ইউসূফ সাবায়য়ী (জন্ম: ১৯১৮ খৃ:)। জীবনকে তিনি উপলব্ধি করেছেন অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে এবং গতানুগতিকতার সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে যে জীবন দ্বন্দ্ব-কোলাহলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে জীবনই সত্যিকার জীবন বলে ইউসূফ সাবায়য়ীর কাছে চিহ্নিত। তাঁর 'মিন হায়াতি' (জীবন থেকে) উপন্যাসে এই ব্যাখ্যাই তদ্গত। অনুরূপভাবে গতানুগতিক নারী-পুরুষের মিলনাত্মক প্রেমের তিনি পক্ষপাতী নন—সেই প্রেম তিনি কর্মের স্বর্ণ-ফসলে বিস্তারিত করে সফলতার প্রাচুর্য দেখতে আগ্রহান্বিত। তাঁর জীবনবোধ ও শৈল্পিক চেতনায় প্রেমের আসল সংজ্ঞা কর্মে বিস্তারিত। তাঁর 'হাজা ওয়া হোব্বু' (এই-ই প্রেম) উপন্যাসে কর্মময় জীবনের ব্যাখ্যায় প্রেমের আসল পরিণতির প্রতি ইংগীত করা হয়েছে।

ইউসূফ সাবায়য়ী তাওফিক আল-হাকীমের অনুসারী হলেও শিল্পকে তিনি চিত্রিত করেছেন নিজস্ব মহিমায় এবং এই স্বকীয়তাই তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছে। তাওফিক আল-হাকীমের 'শাহেরজাদ' নাটকে যে জীবন-চৈতন্য পরিস্ফুট ইউসূফ সাবায়য়ীর 'হাজিহিল হায়াত' (এই-ই জীবন) উপন্যাসে একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি। কিন্তু বক্তব্য এবং রচনার ষ্টাইলে দু'জনকেই পৃথক করে চেনা যায়। তাওফিক আল-হাকীমের জীবন-কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব-কোলাহল ঘুমের ভিতর প্রশান্তি খুঁজে আর ইউসূফ সাবায়য়ীর জীবন-কেন্দ্রিক শ্রম-নিষ্ঠা ঘুমের প্রশান্তি আনে, তফাৎ এইখানে।

ইউসুফ সাবায়য়ী একাধারে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল লেখক। প্রাচীন ক্লাসিকধর্মী গদ্যরীতির অবসান ঘটিয়ে নতুন ষ্টাইলের গদ্যরীতিতে তিনি বিশ্বাসী। এবং এ কারণেই তাঁর রচনায়, অন্ততঃ ষ্টাইলের দিক দিয়ে পশ্চিমী প্রভাব প্রকট।

ইউসুফ সাবায়য়ীর রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন পক্ষপাতিত্ব তাঁকে পীড়িত করেনি। সমাজের 'সানাতা আশারাতা ইমরাতিন' বা 'দশজন নারীর প্রশংসায়.' তিনি যেমন মুখর তেমনি 'আসনা আশারা রেজালুন' বা দশজন পুরুষের গুণকীর্তন করতেও কার্পণ্য করেন নি। এবং এ কারণেই ইউসুফ সাবায়য়ীর জনপ্রিয়তা এত প্রচুর।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অকৃপণ অবদান নিঃসন্দেহে আরবী সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বিয়াল্লিশটি। তন্মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করছি। যেমন, আতিয়াফ, সানাতা আশারাতা ইমরাতিন, আসনা আশারা রেজালুন, আরদুন নাফাক, আগানিয়াত, উম্মুর রতিবাত, আ'নি রাহেলাতা, আইয়্যামে তামের, বায়না আবু রিশ ওয়া জানিনাতা না'মিশ, বায়নাল আতলাল, আল বাহাসা আনেল জাসাদ, জামিয়াত কাতালা আয-যাওযাত, খুহবা ইয়াস্-সোদুর, রোদ্দে কালবী, আস্সাকামাত, সামারাল লায়লী, সেত্তু নেসায়ু ওয়া সেত্তু রেজালু, সাওরো তাবাকাল আসাল, ফি মাওকাবেল হাওয়া, লায়লাতুল খামার, লায়াল ও দুমুয়ু, মিন হায়াতী, মিনাল আ'লামেল মজহুল, মাব্কা আল আ'শাক, নায়েবে আজরাইল, হাজিহিন্ নুফুস, হাজা ওয়া হোব্বু, হাজিহিল হায়াত এবং ইয়া উম্মাতি জাহেকাত ইত্যাদি। উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'রোদ্দে কালবী' (মানসিকতার পরিবর্তন) ১৯৫৮ সালে চলচিচত্র রূপলাভ করেছে।

মিশরের আবদুল হামিদ জোয়াদাতাস্ সাহারও (জন্ম : ১৯০৭ খৃঃ) অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিভাদীপ্ত কথাশিল্পী। গদ্যরীতিতে প্রাচীনপন্থী স্বভাব কাটিয়ে উঠলেও তাঁর রচনার বিষয়বস্তুতে প্রাচীনধর্মীতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণাত্মক কাহিনী উপন্যাসের চেয়ে তিনি 'আল কাসাসুল দি'নী' (ধর্মীয় গল্প) এবং 'কাসাসুল আন্বিয়ায়ু' (পয়গম্বর কাহিনী) লিখতেই

অধিকতর উৎসাহী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সায়ীদ কাত্তাব এবং আবদুল হামিদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মাজমু আতে আল কাসাসুর রাশেদীন' (খুলাফায়ে রাশেদীনের গল্প সংকলন) এবং 'মাজমু আতে আল কাসাসুস সায়েরাতা' (ভ্রমণকাহিনীর সংকলন) ইত্যাদি আরবী কথাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

আবদুল হামিদ জোয়াদাতাস্ সাহার-এর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যাও একেবারে উপেক্ষার নয়। আমরা আজপর্যন্ত তার উনিশটি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। তন্মধ্যে ফি কাফেলাতুজ্ জামান, সাদীউস্ সিনিন, কাসাসু মিনাল কিতাবিল মোকাদ্দাসাতু, আন্-নাকাব, আল-মুসতানকায়ূ, হামজাতুশ্ শায়াতীন, আমিরাতু কারতাবাতা, ফিল আজিফাতা, আবু জার আল-গিফারী, হায়াতুল হাসীন, আর-রাসূল, বিলালা মুআ-জ্জেনুব রাসূল এবং সা'দ বিন আবি ওকাস প্রধান।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কাসাসু মিনাল কিতাবিল মোকাদ্দসু'তে পবিত্র কুরআনের আসহাবে কাহাফ, তওবাতুন নসূহ সহ আয়াত-নাজিল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য উপদেশধর্মী কাহিনী আশ্রয়লাভ করেছে। 'আররাসূল' হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবন-কেন্দ্রিক তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাগ্রন্থ, 'বিলালা মুআজ্জেনুর রাসূল' গ্রন্থে কেবল শান্তির সাধক রাসূলে করীমের জীবনই চিত্রিত করেন নি, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কানে জাতীয়তার আহ্বান জানিয়েছেন এবং 'আবুজার আল গিফারী' গ্রন্থে মধ্যপ্রাচ্যের দার্শনিক সাধক আলগিফারীর উপর সমালোচনা স্থান পেয়েছে।

ইরাকের প্রতিশ্রুতিশীল কথাশিল্পী জুননুন আইয়ুব (জন্ম: ১৯০৯) আধুনিক আরবী সাহিত্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তাঁর রচনার প্রধান দিক এই যে, তিনি সমাজের এমন কতকগুলো সমস্যার প্রতি কটাক্ষ করেছেন যা একমাত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং সাহসী লেখকের পক্ষেই সম্ভব। ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনে তিনি স্কুল-শিক্ষক। এই শিক্ষকতার অন্তরালে সমাজ-জীবনর এমন খুঁটিনাটি ঘটনা এবং অন্যায়-আচরণের সন্ধান পেয়েছেন যা সমাজ-শরীরে দূষিত ক্ষত ছাড়া কিছুই নয় এবং সেসবই তিনি লেখনীর মাধ্যমে পেশ করেছেন সবার অবগতির জন্য।

প্রসঙ্গতঃ তাঁর 'আদ্ দাক্‌তোর ইবরাহীম' (ডাক্তার ইবরাহীম) উপন্যাসটির উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর আরব জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং পৃথিবীর কয়েকটি ভাষায় এর অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক প্রগতিশীল সাহিত্য-পত্রিকা 'তাইরিজ হায়রান' পত্রিকায় গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'ইন্না মিসলা হাজিহি কিস্‌সাতা জুরোরিয়্যাতা লানা লে তুশায়না আ'লা তুফাহ্হিমা শায়াব', 'নিশ্চয় এই ধরনের কাহিনীর প্রয়োজন আমরা আমাদের সমাজ-জীবনের উত্থানের জন্য দরকারী মনে করি'। 'আদ্-দাবতোর ইবরাহীম' উপন্যাসটির মাধ্যমে সমাজ-জীবনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জুননুন আল-আইয়ুবের বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ।

তাঁর অন্যতম গল্প 'ইরাদাতিল আবেদ' (পীর সাহেবের অভিপ্রায়) নানা কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে। সমাজের এক ধরনের ধোকাবাজ পীর-দরবেশ ধর্মের ছদ্মবেশে নিরক্ষর অশিক্ষিত গরীব দুঃখীকে চুষে খাচেছ এবং ধর্মের নামে অশ্লীলতার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে। তারই নিখুঁত চিত্র 'ইরাদাতুলআবেদ' গল্পের বিষয়বস্তু। ছোটগল্পের সংজ্ঞায় 'ইরাদাতিল আবেদ' কতটা সার্থক সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ ; কিন্তু গল্পগুলো যে শিক্ষণীয় তাতে সন্দেহ নেই। ঘটনাকে দীর্ঘ করে বড় বেশী পেচিয়ে বলার অভ্যাস জুননুন আইয়ুবের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এজন্যে অনেক ক্ষেত্রেই গল্প পড়তে গেলে ধৈর্য হারাতে হয়। তবে তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল এবং সহজ। নমুনা হিসাবে 'ইরাদাতিল আবেদ' গল্পের কিছু অংশের অনুবাদ এখানে পেশ করছি —ধোকাবাজ পীর এবং তার শিষ্যদের কুকীর্তির বিষয় সকলের অবগতির জন্য :

'আমি মাজার শরীফের সদর দরজার নিকটবর্তী হতেই একটা ফিস্ ফিস্ শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। তবে কী পীর সাহেব আমার প্রতীক্ষা করছিলেন ?

ভয়ে আমার সারা গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। ভাবলাম পালাই, কিন্তু মনোবল আমাকে সেই ফিস্ ফিস্ শব্দের কাছাকাছি যেতে ধাক্কিয়ে নিল।

শব্দটি আসছিল একটি কক্ষের খোলা জানালার সরুপথ বেয়ে। যে কক্ষে আমার ভাই মাজার শরীফ পাহারা দেবার জন্য শয়ন করত।

জানালার কাছাকাছি গেলাম। অতি সাবধানে। আশ্চর্য, শব্দগুলো আমার ভাইয়ের। একেবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাকে বলতে শুনলাম : 'সাদা, যদি তুমি আমার কাছে না আসো তবে আমার ঘুম হয় না। তোমার নরম হাতের স্পর্শ পাবার জন্যে যেন আমার চোখকে কোন ক্রমেই বন্ধ করতে পারি না।'

সাদা আমার ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে জবাব দিল : 'পীর সাবের শপথ, হে আবদু সা'মী, যদি কেউ না দেখে তবে আমি প্রত্যেক কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রিতে তোমার কাছে আসতে পারি।'

: 'পীরসাব আমাদেরকে রক্ষা করবেন। কাজেই তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই'---আমার ভাইয়ের নরম কণ্ঠ।

: 'না, আমার ভীষণ ভয় হয়। কারণ আমার স্বামী বড় কঠিন লোক। তিনি আমাকে অত্যধিক ভালোবাসেন। পীরসাবের প্রতি তার বিশ্বাস কম। কখনো যদি তিনি আমাকে আপনার সঙ্গে এই অবস্থায় দেখতে পান, নির্ঘাৎ তিনি আমাদেরকে খুন করে ফেলবেন।'—সাদার দীর্ঘশ্বাস।

কথা বলার মাধ্যমে দু'জনকে চুমু খেতে দেখলাম। দু'জনের কী হাসি। শব্দ হয় না। অথচ গালের নরম মাংসের ভাঁজ দেখলে বুঝা যায়। প্রথম আমার কান অতঃপর আমার চোখ—কোনটাকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভাবলাম, তাদেরকে এই অবস্থায় বিরক্ত কিংবা ভয় দেখানো উচিত নয়। আমি মাজারের কাছাকাছি গিয়ে মোনাজাত করলাম যেন পীরসাব আমার চোখের পর্দা খুলে দেন।

আস্তে করে দরজা খুলে মাজার-ঘরে প্রবেশ করলাম। ঠিক যেন চোরের মত। ঘরের মাঝখানে উঁচু কবরের একটা ছায়া দেয়ালের

দিকে শুয়ে আছে। হঠাৎ সেই ছায়া নেচে উঠলো। ঘরে বাতি সরালে ঘরের কোনোকিছুর ছায়া যে রকম নাচে।

ভয়ে আমার তালু শুকিয়ে গেল। পরক্ষণেই চুপ। কয়েক মিনিট পরেই নাকের গড়গড়ানির শব্দ আমার কানে এলো। চারদিকে ভাল করে তাকালাম। কোথা থেকে শব্দটা আসছে। হ্যাঁ, ঠিক ধরতে পেরেছি। এটা আমার বাবাজানের নাকের শব্দ। মাদুরে শুয়ে অমন করে গোঙাচ্ছিলেন। তাঁকে জাগানোর কোন কারণ খুঁজে পেলাম না।

বাবাকে আড়াল করে একটা জায়নামাজ ছড়িয়ে আমার জানা সমস্ত নফল ইবাদত আদায় করলাম। এক ঘণ্টা কেটে গেল। এখন আমার চোখের পাতা ভারীবোধ হচ্ছিল। কাজেই উঠে উপরে ঝুলানো পাগড়ীতে চুমো খেলাম এইজন্য যে, পীরের দোয়ায় যেন সৎপথ পাই।

স্যাঁতসেতে বালুকায় একটা মাদুর বিছিয়ে আরাম করার জন্যে পা ছড়ালাম। মাথাটা বাহুর উপর রেখে ভাবতে লাগলাম আমার ভাইয়ের কথা। কী আনন্দেই না তার সময় কাটছে সাদার বাহুর আরামে। অথচ পীরসাবের অভিশাপে তার চোখও অন্ধ হচ্ছে না কিংবা পীরসাব তার ঘাড়ও ভেঙ্গে দিচ্ছেন না।

এখন যদি সেই পীরসাব কবর থেকে উঠে আসেন আর তাঁর অলৌকিক আলো জেলে দেন। তাহলে এই পাপীদের কি অবস্থা হবে? আমি চিন্তায় মশগুল। হঠাৎ আবার সর সর শব্দে আমার ধ্যান ভাঙলো। চেয়ে দেখি দেয়ালে একটা মানুষের ছায়া। মনে হলো কে যেন উঠে আসছে। ভয়ে আমার কন্ঠ-তালু একসঙ্গে শুকিয়ে গেল। ভাবলাম আমার কল্পনা বুঝি বাস্তবে রূপায়িত হলো। ছায়াটা পরীক্ষা করার জন্যে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখি ছায়াটার হাত মাঝখানে গিয়ে উঁচু হলো এবং হাত দিয়ে একটা গর্তের ঢাকনা খুলে এক অপরূপ শব্দের সৃষ্টি করলো। শব্দ পরীক্ষা করে দেখি একটা জীবন্ত মানুষ—গর্তে প্রস্রাব করে ঢাকনাটা পুনরায় যথাস্থানে রেখে শুয়ে পড়লো। আবার সমস্ত নীরব।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। জ্ঞানের সব দ্বার উন্মুক্ত করে ভাবতে লাগলাম আমার বাবা কী করে এমন একটা পবিত্রস্থানে প্রস্রাব করতে সাহস

গেলেন ? অথচ কোনরূপ অন্যায় অপবিত্র কাজ করলে নাকি আবু হাসান মানুষকে চোখ অন্ধ করে দেন এবং ঘাড়ও ভেঙ্গে থাকেন। এখন আমার সমস্ত সন্দেহ একটা নিশ্চয়তায় এসে পৌঁছলো। আমি খুবই আনন্দিত যে, আমার নামাজ আজ এখানে ব্যর্থ যায় নি। সকল ঘটনার চাক্ষুষ একটা প্রমাণ আমাকে এক মহাপরিতৃপ্তির পথে পৌঁছে দিল।

আমার বাবা যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন, তখন আমি চোরের মতো পালিয়ে এলাম। রাস্তায় অজস্র তারার আলোকে একটা নারীমূর্তি আমার সাড়া পেয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বাড়ী পৌঁছলাম। আমার মা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?

: 'পীরসাবের মাজারে ঘুমিয়েছিলাম,' বলে মার কাছে একটু এগিয়ে গেলাম। তারপর মুচকি হেসে পুনরায় বললাম,

: 'আচছা মা, আব্বাসের স্ত্রী সাদা এত রাত্রে পীরসাবের আস্তানায় যায় কেন ?'

: 'সাত বছর হলো সাদার বিয়ে হয়েছে। অথচ তার কোলে কোন সন্তান-সন্ততি আসে নি। সন্তানের আশায় সে ওখানে যায়।' মা বললেন।

: 'এবার আল্লার রহমতে তার ঘরে খুব সুশ্রী একটা সন্তান আসবে মা' ; বলে মনে মনে হাসলাম।

রাত্রির এসব কাণ্ড দেখে পরের দিন ভোরে পীরসাবের মাজারে গেলাম। আমার মুখে বিজ্ঞের হাসি। বাবার সাথে মুসাফা করলাম। উপরে ঝুলানো পাগড়ীতে চুমো খেলাম এবং বাবার ভয়ঙ্কর মূর্তি লক্ষ্য করে তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখালাম। এমন সম্মান আগে কোনদিনই দেখাই নি।

আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে, আমার বাবা মস্তবড় পীর এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী, যার ফলে তিনি সমস্ত লোককে এমনভাবে অন্ধ করে রেখেছেন। বুঝতে পারলাম এটাই তাঁর একমাত্র উপার্জনের পথ। স্থানীয় সুলতানের চেয়ে এই মহল্লায় তিনিই সবচেয়ে শক্তিশালী।

যখন অগণিত ভক্ত ও তীর্থযাত্রী আসতে থাকতো আমি সেখানে বসে বসে নীরবে পবিত্র কুরআন পড়তাম। জায়গাটা খালি না হওয়া পর্যন্ত আমি ওখানেই বসে থাকতাম। সবচেয়ে বেশী নজর রাখতাম সেই অলৌকিক আলোর দিকে যেটাকে ঢাকনা দিয়ে ছাপিয়ে রাখা হয়েছিল। নিশ্চুপে উঠে গিয়ে ঝুলানো পাগড়ীর নীচে লেখা অক্ষরগুলো উদ্ধার করে দেখলাম তাতে লেখা আছে: 'মাজেন দারেনের তৈরী।'

বুঝলাম পাগড়ীটা কোথা থেকে এসেছে। অট্টহাসি হেসে মাজারের কাছে গিয়ে বললাম: 'হে শক্তিশালী পীর, আমি যা জানি যদি গ্রামবাসী তা জানতো তবে সবাই মিলে আমার বাবাকে চিরদিনের জন্য এখান থেকে বিতাড়িত করতো। তাদের ছেড়ে দেওয়া সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিত। তখন আমাদের পরিবারের লোকদের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন অবলম্বন থাকতো না। কোথায় থাকতো আমাদের বাহাদুরি।

আমার শৈশবের পরিসমাপ্তি এইখানেই।"

'শিল্পের জন্য শিল্প' (Art for art's sake) এই নীতিতে জুন নুন আইয়ুব বিশ্বাসী নন। যে শিল্প বা সাহিত্যে নির্যাতিত মানুষের কথা বা প্রতিচ্ছবি না থাকে সে শিল্প-সাহিত্য বা জীবন পূর্ণাঙ্গ নয়। তাঁর এই মতবাদ প্রচারকল্পেই তিনি একটি সমাজতান্ত্রিক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনগণের মুখপত্র হিসেবে এর নামও বেশ আকর্ষণীয়: 'আল মাজাল্লা' (সবার পত্রিকা)। সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক দিকের প্রতি আলোকপাত করাই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। আশার কথা, অল্প দিনেই এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং 'জুন নুন মতবাদী' একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এই ধারায় যাঁরা সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে ইরাকের প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবদ আল মালীক আবদ আল লতীফ নূরী: 'আল রায়ী আল আম' পত্রিকার সম্পাদক সালীম তাহা আল্ তিকরিতী এবং মুহম্মদ মাহদী আল জওয়াহারী প্রমুখের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য।

বলা আবশ্যক যে, জুননুন আইয়ুবের উপন্যাস 'আদ দাকতোর ইবরহীম'-এ সমাজের নির্যাতিত মানুষের কথা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে

সরকারের প্রতি কটাক্ষ। ফলে জুন নুন আইয়ুবকে সরকারী নির্যাতনের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে কয়েকবার। তাঁর ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে 'সাদিকী' (আমার বন্ধু), 'বুর্জ বাবেল' (বাবেলের চূড়া), 'আল্-কাদিবুন' (নিম্নশ্রেণী) এবং 'আল হুমায়্যাত' (অসুখ) প্রভৃতি আরবী সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

ইরাকের জাফর আল-খলিলী প্রথমতঃ সাংবাদিক এবং পরে সাহিত্যিক। জুন নুন আইয়ুব যেমন একটি নিজস্ব ধারার সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন জাফর আল্-খলিলীর বেলায়ও তা প্রযোজ্য। 'আল-হারিফ' পত্রিকা কেন্দ্র করেই 'খলিলীগোষ্ঠী' তৈরী হয়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জা'ফর আল-খলিলী পর্যায়ক্রমে 'আল রায়য়ী' (কৃষক) এবং 'আল ফজ্‌র আল্ সাদিক' (অনির্বাণ ভোর) পত্রিকা দুটির সম্পাদনা করেন এবং পরবর্তী সময়ে 'আল হারিফ' পত্রিকায় যোগদান করেন। নির্যাতিত সমাজের বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসই 'আল-হাবিফ' পত্রিকায় প্রধানতঃ পত্রস্থ হতো। এভাবেই গড়ে উঠে 'খলিলী সাহিত্যগোষ্ঠী।

আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে যে কয়জন ইরাকী সাহিত্যিকের অবদান অনস্বীকার্য জা'ফর আল-খলিলী তাঁদের অন্যতম। তাঁর নামকরা উপন্যাস 'ফি কোরা আল-জ্বীন' (জ্বীনের দেশে) এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরবী সাহিত্য-জগতে আবির্ভূত হয়েছে। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার থেকে :

এক নাজাফী ভদ্রলোক তার এক বন্ধুর সহযোগিতায় জ্বীনের দেশে পৌঁছে। জ্বীনের বাদশাহ্ অলৌকিক শক্তিবলে নাজাফীকে প্রথমে পিপীলিকায় রূপান্তরিত করে। এমনভাবে মধুমক্ষিকা এবং কুকুরে রূপান্তরিত হতেও তাকে দেখা যায়। নাজাফী পিপীলিকা হয়ে খাদ্য সংগ্রহ রীতি, মধুমক্ষিকা হয়ে নিয়ম-শৃংখলা এবং কুকুরে রূপলাভ করে বিশ্বস্ততা শিক্ষালাভ করে। এমনিভাবে বহু চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতার মধ্যে তার দিন কাটতে থাকে এবং নাজাফীর বন্ধু সব ঘটনা নিজের দেশে পাঠাতে থাকেন।

যাহোক, বন্ধুর সহযোগিতায় নাজাফী দুটো অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আয়না হস্তগত করতে সমর্থ হয় এবং এই আয়না দিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ সব গোপন রহস্য উদঘাটন করে শেষ পর্যন্ত আয়নার সাহায্যেই তার দেশে ফিরে আসা সম্ভব হয়। এমনি চাঞ্চল্যকর চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই 'ফি কোরা আল-স্বীন' উপন্যাসের কাহিনী।

জা'ফর আল-খলিলীর ছোটগল্প সংকলন 'আল্-ধায়য়ী' (নিঃসঙ্গতা) এবং 'ইনদামা কুন্তো কাজিয়ান' (যখন আমি বিচারক ছিলাম) গ্রন্থ দুটিও খলিলীর বলিষ্ঠ স্বাক্ষর বহন করে। 'ইনদামা কুন্তো কাজিয়ান' গল্পসংকলনের গল্পগুলো তাঁর বিচারক-জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত।

তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল এবং দুর্বোধ্যতামুক্ত। একমাত্র খলিলীই সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের পথ-প্রদর্শক। এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ, কেননা অনেক সাহিত্যিকই বর্তমানে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করছেন। খলিলীর সাহিত্যকর্মে ইরাকের সামাজিক জীবনের পূর্ণচিত্র প্রতিফলিত।

ইরাকের আর একজন প্রতিভাবান কথাশিল্পী আবদ আল্-মজীদ লুৎফী। কবি ও নাট্যকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সমধিক। তিনি 'জাবাল অাল্-তারিক' (জিব্রাল্টার) কবিতার জন্য 'ব্রিটিশ বেতারসংস্থা' কর্তৃক এক বিশেষ সম্মানীয় পুরস্কার অর্জন করেন।

জা'ফর আল-খলিলীর 'আল-হারিফ' কেন্দ্র করেই লুৎফীর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় লুৎফীর সমান দখল, কাজেই তাঁর সাহিত্য-কর্মেও পশ্চিমী প্রভাব বর্তমান। গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত তাঁর 'আসদা আল-জামান' (কালের বুদ্বুদ) তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী করেছে। তাঁর অপর উপন্যাস 'কালব আল উম্ম' (মায়ের অন্তঃকরণ) ইরাকের সামাজিক জীবনের চিত্র-বিচিত্র বৈচিত্রে বৈশিষ্ট্যময়। ছোটগল্প রচনায়ও তাঁর দক্ষতা অপরিসীম।

নতুন নতুন শব্দ, উপমা, বাক্যালঙ্কার এবং বিশেষণের সমারোহে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে ভাষাকে সুন্দর করার প্রবণতা আবদ আল মজীদ লুৎফীর

রচনার বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া 'ওয়া' (এবং), 'আও' (অথবা) এবং 'বায়না' (কিন্তু) ইত্যাদি সংযোজক বাক্যরীতি তাঁর রচনার সর্বত্র বিরাজমান এবং এ কারণেই লুৎফীকে আবিষ্কার করতে কষ্ট হয় না। কোন কোন সমালোচক এই রীতির প্রতিবাদ করলে লুৎফী তার জবাবে বলেছেন, 'অর্থপ্রকাশের জন্য বাক্যকে দীর্ঘ ও যৌগিক করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমার কাছে এটাই সুন্দর এবং এটা আমার একান্ত নিজস্ব।'

মিশরের নাজিব মাহফুজ (জন্ম: ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ) আধুনিক আরবী সাহিত্যে একটি উৎসর্গীকৃত প্রাণ। শিল্পকে তিনি লালন করেন আপন সন্তান-সন্ততির মতো। এ কারণেই তিনি আজীবন চিরকুমার ব্রত পালন করে আসছেন।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিপ্লোমা লাভের পর তিনি সরকারী কাজে যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি ওয়াক্ফ মন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকেও নিরলস সাহিত্য সাধনা করছেন।

নাজিব মাহফুজের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় ১৯৩০ সালের পর থেকে। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি মননশীল প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর ছোটগল্প এবং পরিশেষে উপন্যাস এবং সিনেমা-গল্প লেখায় মনোনিবেশ করেন। যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে বর্তমানে তিনি একাগ্রচিত্তে উপন্যাসই রচনা করে চলেছেন।

নাজিব মাহফুজের রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি একদিকে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্য অস্বীকার করতে রাজী নন; অপরদিকে তেমনি শিল্পের পুনরুজ্জীবনে আধুনিকতার পক্ষপাতী। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ফিরাউন নাজিব মাহফুজের কাছে গর্বের বস্তু; কেননা ফিরাউনের ঐতিহ্য-চেতনাই নব-পর্যায়ের মিশরের পটভূমি। অবশ্য, শিল্প-চেতনায় এই ঐতিহ্য-প্রীতির পুনরুজ্জীবন কতটা সার্থক এবং সর্বজনগ্রাহ্য এটাই নাজিব মাহফুজের মূল বক্তব্য। ফলে, 'আল্-কাহেরাতুল জাদিদা' (অভিনব কায়রো) উপন্যাসে তিনি যেমন কায়রোকে আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান হিসেবে

চিত্রিত করেছেন ; অনুরূপভাবে 'বাদায়েত ওয়া নেহায়েত' (প্রারম্ভিক এবং আবশ্যিক) উপন্যাসে তিনি ফিরাউনকে মিশরীয়দের পূর্বপুরুষ বলে স্বীকার করতে কুন্ঠাবোধ করেন নি। তবে বিবর্তন ধারায় স্বার্থক শিল্পের প্রশ্নে বর্তমান বিশ্ব কর্তৃক তা কতটা আদৃত সেইটেই বিবেচ্য বিষয়। অবশ্য, নাজিব মাহফুজের চিন্তা-ভাবনা মুসলিম দর্শন সমন্বিত।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনা ও নাজিব মাহফুজের রচনায় পরিস্ফুট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অর্থাৎ ১৯১৮ সালের পর মিশরে যে উত্থান ঘটে এই পট-ভূমিকায় রচিত তাঁর সুবৃহৎ বারো শ' পৃষ্ঠার উপন্যাস 'বায়নাল কাসরাইন' (দুই প্রাসাদের মাঝখানে) আরবী সাহিত্যের একটি অনবদ্য রচনা। ১৯৫৭ সালে গ্রন্থটি রাষ্ট্রীয় পুরষ্কারের সম্মান অর্জন করে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'খানাল খালিলী', 'জাকাক্ অল্ মাদক', 'আস্‌সরাব', 'অস্ সুককারিয়া', 'আবাসাল আকদার', 'কাসরুন্ শাওক', 'বেফাহ্ তায়্যবাহ্', 'হামসুল জুনুন' প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

মিশরের প্রখ্যাত দৈনিক 'আল-জমহুরিয়া' পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রহমান আল্-খামিসী (জন্ম : ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং সাহিত্যবিভাগীয় সম্পাদক মাহমুদ সাদানী (জন্ম : ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ) সংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও উভয়ে খ্যাতিমান কথাশিল্পী। উভয়ের রচনাতেই স্বাজাত্যবোধ এবং দেশপ্রেম তদগত। তাছাড়া উভয়েই প্রচুরপরিমাণে বিদেশভ্রমণ করছেন, ফলে দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতার স্পর্শও তাঁদের রচনায় বর্তমান।

১৯৫৫ সালে প্রকাশিত মাহমুদ সাদানীর প্রথম গল্পসংকলন 'আস্-সামাউন সাউদারু' (কালো রঙের আকাশ) আরবী কথাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কৃষক, শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষের জীবন-আলেখ্য চিত্রণেই মাহমুদ সাদানী অধিকতর উৎসাহী।

উপরোক্ত কথাশিল্পীদের পর পরই আর একদল কথাশিল্পীর আবির্ভাব আরবী সাহিত্য জগতে নব উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ১৯৫০-এর পর এঁদের খ্যাতি এবং এঁদের নানারূপ পরীক্ষা-নীরিক্ষা আধুনিক আরবী সাহিত্যকে এক গৌরবময় দিকের প্রতি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যের কালক্রম অনুসারে এঁদেরকে তৃতীয় দল ভুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। এই দলে যাঁরা নিরলস সাহিত্য-কর্ম করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইউসুফ ইদরীস (মিশর) সুহাইল ইদরীস (লেবানন), জাবরান ইবরাহীম জাবরান (লেবানন), ইউসুফ শারোনী (কায়রো), সারওয়াত আবাজা (কায়রো), ইউসুফ আল্-গোরাব (লেবানন), ইবরাহিম আল-আরীজ (লেবানন), আবদুর রহমান বেগ (হলব), ইদরীস শা'রাবী (মাজাগান), সুলায়মান আল-মুসা (আম্মান) হোসাইন কাশেম (বৈরুত), জীকরীয়া তামের (দামেস্ক), ওসমান সা'দী (ইরাক), আল-তাবেবী (লেবানন) প্রমুখ।

কায়রোর কাসর আলআইনী হাসপাতালের ডাক্তার ইউসুফ ইদরীস (জন্ম: ১৯২৮) সাহিত্যেরও একজন খ্যাতিমান ডাক্তার। সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচারের ক্ষত নিরাময় করার উদ্দেশ্যই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তিনি আধুনিক সভ্যতার অতি উগ্রতাকে উপলব্ধি করেছেন তাঁর অন্তঃদৃষ্টির নিরিখে। তাই তাঁর সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত উপন্যাস 'হাদেসাতু শারফ' (মঞ্চের কাহিনী) এই অভিজ্ঞতারই মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

হাসপাতালের কর্ম-জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যে-সব গল্প লিখেছেন তাতেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান। অনুরূপ একটি গল্প 'মাসবুলিয়্যাত' (দায়িত্ব) হাসপাতাল জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

'মাসবুলিয়্যাত' গল্পের প্রধান চরিত্র একজন আগন্তুক, নাম শাবরাবী এবং অপরজন রোগিনী এবং পাগলী, নাম জুবাইদা। জুবাইদাকে হাসপাতালে ভর্তির সমস্যাই গল্পের বিষয়বস্তু। এই ভর্তির মধ্যে আছে একটা দ্বন্দ্ব। এবং সে দ্বন্দ্ব দায়িত্বের দ্বন্দ্ব।

শাবরাবীর দায়িত্ব সে জুবাইদাকে ভর্তি না করানো পর্যন্ত তাকে ছেড়ে আসতে পারছে না; হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব যে উপযুক্ত অভিভা-বকের অভাবে পাগলী জুবাইদাকে ভর্তি করানোও সম্ভব হচ্ছে না। অথচ তাকে সুদূর মিশর থেকে নিভৃত পল্লীতে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এ দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন:

"ডাক্তার এলেন। তিনি শাবরাবীর হাত থেকে কাগজগুলো চেয়ে নিয়ে অনান্য ডাক্তারদের সব রিপোর্ট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়লেন। তারপর শাবরাবীকে অবাক করে দিলেন এই বলে : 'কায়রোতে তার কোন আত্মীয়-স্বজন এসেছে ? হাসপাতালের ফরম পূর্ণ করতে আত্মীয়ের দরকার।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ডাক্তার আবার যোগ দিলেন, 'না হলে, যেখান থেকে এসেছো আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে।'

: আবার সেই আল-দাখালিয়াতে যেতে হবে ? শাবরাবী বিমূঢ়।

: নিশ্চয়।

: কিন্তু এটা অসম্ভব ডাক্তার সাহেব। ফেরত যেতে মাত্র একজনের টিকিট আছে। কেবল আমার।

: কিন্তু তার একজন নিকট আত্মীয়ের দরকার।

: দয়া করুন ডাক্তার সাহেব। বড় অনুরোধ করছি।

: অনুরোধের কথা নয়। এটা একটা দায়িত্ব। এসব আমাদের ঘাড়ে নেবার কথা নয়।

'দায়িত্ব' কথাটা শুনে শাবরাবী চমকে উঠলো। অসম্ভব দুশ্চিন্তা তাকে মূর্চ্ছিত করার আগেই একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। জুবাইদা ততক্ষণে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গোপনে পায়চারী শুরু করে দিয়েছে। উপস্থিত সকলেই হতভম্ব।

শাবরাবী সমস্ত কৌশল খাটিয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করলো। কিন্তু বিফল। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পুলিশের সাহায্যে তাকে কোনঠাসা করা হলো। আবার শাবরাবী ও জুবাইদার মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ।...

ডাক্তার একটা জ্যাকেট দিলেন। চারজন লাগল জুবাইদাকে সেই জ্যাকেট পরাতে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য সে মেজে গড়াতে লাগলো। সারা মেজ তখন রক্তে রঞ্জিত।...

ডাক্তার এইবার তাড়াতাড়ি ফরম পূরণ করলেন।"

উদ্ধৃতির পরিসর না বাড়িয়ে বলা যায়, ইউসুফ ইদরীসের রয়েছে মানবতাবোধ। তাই সরকারী হাসপাতালের আইন-কানুন সে মানবতার কাছে পরাস্ত। জুবাইদাকে শেষ পর্যন্ত ভর্তি করা হলো।

আধুনিক আরবী কথাশিল্পীরা চিন্তা-জগতে যে কতটা প্রতিক্রিয়াশীল ও আধুনিক মনোভঙ্গীসম্পন্ন তা ইউসুফ ইদরীসের রচনায়ও স্পষ্ট। আধুনিক সমাজ-জীবনে গতানুগতিকতার কোন মূল্য নেই। সেখানে চাই বলিষ্ঠতার সৌকর্য, বিবর্তনের স্পর্শ। ইউসুফ ইদরীসের 'বুলদান' (শহর) গল্পের কিছু অংশে তার প্রমাণ মিলবে:

'শাইয়্যান কাবিবান কাল-জান্নাতা ওয়া ফিহা খাওয়াজাতা লা ইযাহ্ সা লাহুম আদাদা। ওয়া বানাতু ফাল্ লাবানুন্ হালিব, ওয়া নিসায়ু ফাবনাজু লাহ্নু মুলাইয়াতু লাক্ফিন হাবিরিয়াতু তালমায়া ওয়া তাল আলায়ু। ওয়া কাগাবা বেরাকাআ হুন্না লা বুদ্দা সাগিরু ওয়া দাকিকু মিসলা আকলাতুল্ আসবায়ু ওয়া আনু ফাহুন্না লা বুদ্দা কা হুববাতেল্ ফাওলু ওয়াজ্ গামুহুন্না লা বুদ্দা মসনুয়াতে মিন লাহমে তারায়ী। ওয়া লায়সা ফিহা এজামা: ওয়া ইন্নামা হেইয়া কাল মুলবানা তাহুজিহী ফাইয়ান জাজাবা মা'আশা। ওয়া তাল মাসেহী ফি সায়েৎসা লা'বুকা মিন হালাওয়াতেহী। ওয়ার রেজালু মুকা তারীয়ীনা। লা ইয়াশবায়ুনা নেযায়ুহুম। ওয়ান নেসায়ু ইয়ামদাগুন্নাল লাবানা ফা ইয়াতরাশায়ু ফি আফওযাহুন্নাল হালাওয়াতাল জাবকাতা। ওয়া ইয়াতলাবনো আররেজালু। রেজালু মিসলানা ফালাহিনা খানাসিরু কাফহুলাল জামুসা।'

[...যেন প্রশস্ত স্বর্গরাজ্য। সেখানে অসংখ্য পুরুষ; দুধের মতো শাদা নারী এবং নারীদের গায়ে সিল্কের পোশাকে ঝলমলে বাহার। তাদের স্বর্ণ-খচিত মুখের আবরণ খুবই সৌন্দর্যময়, তাদের নাক যেন টিয়াপাখীর মতো ধারালো, হাড়হীন মাংসে তাদের শরীর তৈরী, এমন নরম, যেন টার্কিস তোয়ালেকেও হার মানায়। তাদের শরীরের ঘ্রাণের লোভে মুখের লালা নির্গত হয়।

কিন্তু পুরুষরাও অনুরূপ নরম এবং তাদের নারীদের পরিতৃপ্ত করতে অসমর্থ।]

এবং নারীরা তাদের লাবণ্যময় নরম মুখে চুইনগাম চিবোয় এবং এমন পুরুষের সাহচর্য প্রার্থনা করে—যে পুরুষের শৌর্যে একজন বলিষ্ঠ কৃষক বর্তমান কিম্বা খুব শক্তিশালী পুরুষ মহিষ।...]

ইউসুফ ইদরীসের ছোট গল্প সংকলনের মধ্যে 'বিস্‌সাতুল হোব্বু' (প্রেমের গল্প) আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

জাবরান ইবরাহীম জাবরানও প্রতিক্রিয়াশীল কথাশিল্পী। জীবনটা যে 'গোলাব কুঁড়ির বিছানা' নয় এই সত্যই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। তাঁর মতে তিক্ততা, শঠতা, কদর্যতা ইত্যাদিই সত্যিকার জীবনের সন্ধান দেয়। এবং এসবের লালনই তাঁর শিল্পের উপজীব্য। তাঁর 'আদনান' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য শহরে জীবন অর্থহীন; কেননা কফি-হাউসের গালগল্পে এর পরিসমাপ্তি এবং চাটুকারিতাই একমাত্র লক্ষ্য। অনুরূপভাবে 'আরাক' গল্পে তিনি এমন মই-এর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যে মই দিয়ে কেবল নিম্ন দিকেই যাওয়া যায় এবং যার কোন ঊর্ধ্বগতি নেই। এমন কি 'শুব্বাকুল জুলমাত' গল্পেও এমন 'অন্ধকার জানালার' আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যে জানালা-পথে নারী-পুরুষ কেবল নিম্নগামী প্রেমে ধাবিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

জাবরান ইবরাহীম জাবরান অতিমাত্রায় নৈরাশ্যবদী এবং তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে নৈরাশ্যবাদিতার স্পর্শ বিদ্যমান। একমাত্র ব্যতিক্রম 'গ্রামোফোন'। অবশ্যি 'গ্রামোফোন' গল্পেও যে জীবন তদগত তা যেন কৃত্রিম এবং প্রক্সির নামান্তর।

আধুনিক আরবী কথাশিল্পীরা যে আর পিছিয়ে নেই তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। কি টেকনিক, কি বিষয়বস্তু, কি ষ্টাইল সব দিক দিয়েই যে আধুনিক আরবী উপন্যাস ও ছোট গল্প উন্নতমানের তা বলাই বাহুল্য। এমন কি বিশ্বের অন্যান্য উন্নত সাহিত্যের কথাশিল্পের সঙ্গেও যে আরবী কথা-শিল্প তুলনীয় হতে পারে এ সম্পর্কেও আশা করি কারও দ্বিমত থাকবার কথা নয়। অবশ্যি, এর পশ্চাতে আধুনিক আরবী কথাশিল্পীদের ধৈর্য, তিতিক্ষা, অধ্যবসায় এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল। ছোট গল্প হিসেবে এঁদের

রচনা কতটা সার্থক মাজাগানের তরুণ কথা শিল্পী ইদরীস শারাবীর 'আল্‌হাজ্জ' (তীর্থ যাত্রা) গল্পটি তার সাক্ষ্য বহন করে। উদাহরণস্বরূপ কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'ফেজ কতদূর ?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

তাড়াতাড়ি মার কথার জবাব দিতে পারলাম না। যে পবিত্র স্থানে আমরা যাচ্ছি তার যাত্রাপথই এতো সব নোংড়ামিতে ভরা তবে আমরা পবিত্রতায় পৌঁছব কি করে ? পবিত্র রাস্তা না হলে কি পবিত্র স্থানে যাওয়া যায় ?

মার কাছ ঘেঁষে ভালো করে কানের কাছে বললাম, 'মক্কাত দূরের কথা, ফেজই এখনো অনেক দূরে, মা।'

ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক সমস্যা ছাড়াও আধুনিক সভ্যতার অতি উগ্রতা কিংবা যৌন আবেগও আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যে আশ্রয়লাভ করেছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধানও ঘটছে লেখকদের সুনিপুণ চাতুর্যে। এক কথায় সব কিছুর আশ্চর্য সমন্বয় আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যে বিদ্যমান। তরুণ কথাশিল্পী ইয়ুসুফ শারোনীর 'কিসসাতু ফি দাকিকাতু' (সমসাময়িক কাহিনী) গল্পে যেমন যৌন-ক্রাইসিসের সূক্ষ্ম অনুভূতি রয়েছে তেমনি 'সেত্তাতু বেজালুন তাহতাল বাতিল' (ছয়জন পুরুষ মিথ্যায় নিমজ্জিত) গল্পেও আধুনিক সভ্যতার অতি উগ্রতার প্রতি কটাক্ষ হানা হয়েছে।

আধুনিক আরবী কথাশিল্পে যৌন-লিপ্সার আর্তি না আছে এমন নয় তবে সে আর্তি সার্বজনীন নয়; ঘৃণিত এবং অবজ্ঞেয়। ঘৃণা, অবজ্ঞা-অনীহা ইত্যাদিকে ম্লান করার পশ্চাতে লেখকের যে শ্রম তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রূপক, প্রতীকধর্মিতা এবং সর্বোপরি উপদেশের আলো ঘৃণ্য অবস্থা ও অনীহার স্তূপের উপর এমন ভাস্বর যে, শেষ পর্যন্ত সেই আলোকই সবার কাম্য ; অন্ধকার ('বাতিল') নয়। তাই ইউসুফ শারোনী যেখানে 'কায়ফা ইয়া তাখাল্লাসুল বাতিল' (কি করে অন্ধকার উন্মোচিত হলো) গল্পে আলোর চাবি-কাঠি দিয়ে অন্ধকারের তালা খুলতে পারেন তেমনি

অন্ধকার নোংরা গলির নোংরা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের আলো জ্বেলে তাকে সত্যিকার মানুষরূপে সৃষ্টি করতে পারেন। এই সৃজনশীলতাই সার্থক শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। 'দারবু আদ-দারাইব' (দারাইব গলি) ইউসুফ শারোনীর এমনি একটি সার্থক সৃষ্টি। কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"গোটা পাঁচটি বছর ধরে সে আদালতের নিম্নতম কর্মচারী হিসেবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে কোন উন্নতির আশা সে মোটেই করে নি। পাঁচ বছরে সম্ভবতঃ এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা যে দারাইব গলি চিরদিনই কর্দমাক্ত, নোংরা এবং ঘিনঘিনে মাছিতে পূর্ণ। যে রকম সে হোসনিয়ার সাথে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অপরাধীর মতো নিশ্চুপে মেলামেশা করে। তার বাড়ী নেই, ঘর নেই, এবং নিঃসন্তান অবস্থায় দিন দিন কেবল অবনতির দিকে চলে যাচেছ।

হোসনিয়া তখনও তাকে চুমো দিতে ক্রমশঃ এগোচেছ। মাহদুব নির্নিমিখ ভাবে চেয়ে দেখলো হোসনিয়ার পরিশ্রান্ত অবস্থা, উদাস চোখ এবং একটা কামনা, যা তার সারা দেহে রূপের লাবণ্যে উন্নত হয়ে ফুটে উঠেছে। দাবাইব গলির সেই উঠোনের পিঁপড়ের ঢিবিতে গরমপানি ঢালার কথা স্মরণ করে সে হোসনিয়াকে টান দিয়ে নিজের কাছে এনে খুব তাড়াতাড়ি তার কপালে নরমে চুমো দিয়ে ছুটে পালাল।"

ইউসুফ শারোনীর অন্যান্য গল্প সংকলনের মধ্যে 'খামসাতু আ'শেকীন' (পাঁচজন প্রেমিক) এবং 'খাত্তু ইলাল ইমরাতিন' (একজন মহিলার নিকট পত্র) খুবই উল্লেখযোগ্য।

'খামসাতু আ'শেকীন' গল্প সংকলনের সবগুলো গল্পই তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার অতি উগ্রতা যে সমাজ-দেহে কালিমা লেপন করছে তারই একটা স্পষ্ট ইংগীতে গল্পগুলোর বাঙময়।

'খাত্তু ইলাল ইমরাতিন' গল্প সংকলনে তিনি মানুষের মর্যাদা এবং 'সবার উপর মানুষ সত্য'-এই সংজ্ঞাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উইসুফ শারোনীর রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক উভয়ই শিল্প সঞ্জাত হয়ে রূপলাভ করেছে। কোথাও বৈপরীত্য নেই।

আধুনিক আরবী কথাশিল্পের সামগ্রিক রূপ পরিদৃষ্টে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এতে স্বাজাত্যবোধ, ঐতিহ্য-চেতনা, দেশপ্রেম ছাড়াও রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও যৌন-সম্পর্কিত জীবন-যন্ত্রণা। শুধু তাই নয়, লেখকদের একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা এবং আন্তরিকতা আধুনিক আরবী কথা-সাহিত্যকে দিন দিন শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলছে। অতি সাম্প্রতিক কালে যে-সব কথাশিল্পী সাময়িক পত্রিকা যেমন আল্-আদাব, আল্-আদিব, আল্-আকলাম, আল্-আহ্দাফ, আল্-কুল্লিয়াত ইত্যাদিতে লিখছেন তাঁদের রচনায়ও প্রতিভার স্বাক্ষর দীপ্তিমান। এ প্রসঙ্গে জীকরিয়া তা'মেরের 'ইবতাসামা ইয়া ওয়াজহাহাল মুতাব', ওসমান সাদীর 'তাহতা জিসরাল মুয়াল্লাক', হোসাইন কাশেমের 'দারবিস', আবদুর রহমান বেগের 'আল-আনজাতু ওয়াস সারোখ' প্রভৃতি গল্পগুলোর উল্লেখ করা যায়। এঁদের সামগ্রিক রচনা গ্রন্থাকারে এখনো প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ইংগিত বহন করে।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত সাহিত্যের মত আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যও যে উন্নত এবং শিল্পসমৃদ্ধ তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। এবং এ জন্য আধুনিক কথাশিল্পীদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতাই দায়ী।

নাট্যসাহিত্য

আরবী সাহিত্যে নাটক রচনার প্রচলন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর আগে নাটক রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আধুনিক আরবী কবিতা ও গদ্যরীতিতে যেমন দুটো ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের দান অপরিসীম তেমনি আরবী নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশেও এ দুটো মহাযুদ্ধের অবদান অনস্বীকার্য।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধ আরব জগতকে মুক্ত করলো চারশ' বছরের তুর্কী শাসনের নাগপাশ থেকে আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাকে রেহাই দিলো পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে। এই রাজনৈতিক মুক্তিই সমগ্র আরব জগতকে এক নতুন উন্মাদনায় উন্নীত করে। এই স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারী উন্মেষ থেকেই আরবী নাট্য-সাহিত্যের জন্ম।

আরবী নাটকের প্রারম্ভিক পর্বে ঐতিহাসিক ঘটনা, স্বাজাত্যবোধ ও ঐতিহ্য-চেতনাই নাটক-রচনার বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আরবী সাহিত্যিকগণ নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী ও বিষয়বস্তুকে তাঁদের নাটক রচনার উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

সিরিয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক আল-আহদাব (১৮২৬—১৮৯১) সর্বপ্রথম নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় বিশটি নাটকের রচয়িতা এই আল-আহদাব তাঁর সব কটি নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন ঐতিহাসিক ঘটনা কেন্দ্র করে। পূর্ব-পুরুষদের শৌর্যবীর্যের রসাত্মক কাহিনীই এইসব নাটকের মূল উপজীব্য।

আল-আহদাব রচিত নাটকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ইসকান্দার,' 'ইয়াজিদ বিন আবদুল মালেক,' 'আবু নুবাস' এবং 'ইবনে জায়দুন'।

'ইসকান্দার' নাটকে কীর্তিত হয়েছে ম্যাসাডোনিয়ার বিশ্ববিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের অভিযান কাহিনী; 'ইয়াজিদ বিন আবদুল মালেক' নাটকে ইসলামের ইতিহাস-খ্যাতি বীরশ্রেষ্ঠ ইয়াজিদ বিন আবদুল মালেকের কাহিনীই আশ্রয় লাভ করেছে; 'আবু নুবাস' ও 'ইবনে জায়দুন' নাটক দুটি কেবল ঐতিহাসিক কাহিনী-নির্ভর নয়, এতে প্রেমের জ্বলন্ত স্বাক্ষরও বিদ্যমান।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আবু নুবাস (৭৫৬—৮১০) আব্বাসীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবি-মনের পাশাপাশি আরও একটি মন প্রোজ্জ্বল ছিল এবং তা তাঁর প্রেমিক-মন। এই প্রেমিক-মনটিই তিনি গচ্ছিত রেখেছিলেন ক্রীতদাস কন্যা আল-জানানের কাছে। এবং এ জন্যে তাঁকে যন্ত্রণাও কম ভোগ করতে হয় নি। খলীফা হারুন অল রশীদের সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও এই প্রেমের পরীক্ষায় আবু নুবাসকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল-জানানের সঙ্গে হজ্জ-ব্রত পালনের অজুহাতে আবু নুবাস বাগদাদ ত্যাগ করে পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ হন। এই প্রেমোপাখ্যানই 'আবু নুবাস' নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। আল-আহমাদের শক্ত লেখনীতে প্রেমের স্বাক্ষরই বেশী জ্বলন্ত হয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

অনুরূপ ভাবে 'ইবনে জায়দুন' নাটকের কাহিনীও গ্রহণ করা হয়েছে একাদশ শতাব্দীর স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবি ইবনে জায়দুন (১০০৩—১০৭১)-এর জীবন থেকে। এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে নারী চরিত্রের রহস্যময়তার দিকে কটাক্ষ হানা হয়েছে তীব্রভাবে। ইবনে জায়দুন শেষ উমাইয় খলীফা আল-মুসতাকফির কন্যা আল-ওয়াল্লাদার প্রেমাসক্ত হন। আল-ওয়াল্লাদাও ছিলেন খ্যাতিমান কবি। ইবনে জায়দুনের প্রতি প্রথম অবস্থায় আল-ওয়াল্লাদার অনুরক্ততা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু পরবর্তী সময়ে আবুল হাজাম ইবনে জবাহার মন্ত্রি-সভার সদস্য ইবনে আবদুস-এর প্রতি আসক্ত হন এবং ইবনে জায়দুনকে পরিত্যাগ করে ইবনে আবদুসকেই বিয়ে করেন। অথচ আল-ওয়াল্লাদার জন্য ইবনে জায়দুনকে কারাভোগ ছাড়াও বিষপানের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছুতে হয়েছিল। অবশ্যি, বিষ তাঁকে পান করতে হয় নি, কৌশলে বেঁচে যান।

'আবু নুবাস' নাটকের মত 'ইবনে জায়দুন' নাটকেও আল-আহদাব তাঁর বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন ইবনে জায়দুনের চরিত্র-চিত্রণে। নাটকটি আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবেই স্বীকৃত।

আল-আহদাবের সমসাময়িক সিরিয়ার মারুন নাক্কাশও (১৮১৭—১৮৫৫) কয়েকটি নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্রধানতঃ ফরাসী নাট্যশিল্পী মোলেব-এর অনুসারী এবং মিলনান্তক পটভূমিই তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' কাহিনী অবলম্বনেও তিনি কয়েকটি নাটকের অবতারণা করেন; তবে তাতে সিরিয়ার সামাজিক জীবনের কিছু চিত্রও সংযোজিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে আদিব ইসহাক (মৃত্যু: ১৮৮৫) এবং সালীম নাক্কাশ (মৃত্যু: ১৮৮৪)-এর নেতৃত্বে আলেকজান্দ্রিয়াতে একটি নাট্য-আন্দোলন গড়ে উঠে। সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা নাটক মঞ্চস্থের ব্যবস্থা এবং নাটকের পাঠসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। ফলে আরব জগতে নাটক দর্শন ও নাটক-রচনা উভয়ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষিত হয়। তখন নাটক রচনায় যাঁরা শক্তিমত্তার পরিচয় দেন তন্মধ্যে সিরিয়ার খলীল ইয়াজেজী (মৃত্যু: ১৮৮৯) এবং নাজীব হাদ্দাদ (মৃত্যু: ১৮৯৯) সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই সময়ে রচিত খলীল ইয়াজেজীর 'আল-আমান ওয়া আল-আমী' (মহানুভবতা ও বিশ্বাস) নাটকটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাটকটির বিষয়বস্তু আইয়্যামে জাহেলিয়া যুগের আরব-কবি অর্থাৎ 'সাব-আ মুয়াল্লাকা' গোষ্ঠীভুক্ত কবিদের জীবন আলেখ্য। এই নাটকটিতে খলীল ইয়াজেজীর শিল্পচাতুর্যে প্রত্যেকটি কবি-চরিত্রেরই এমন বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটেছে যে, তাতে দর্শকবৃন্দ ভাবাবেগে আচ্ছন্ন না হয়ে পারে না।

অপরপক্ষে, নাজীব হাদ্দাদের রচনায় ভিন্ন স্বাদ উপভোগ করা যায়। তিনি শেক্সপীয়ার, হোগো, কর্ণেলী প্রমুখ প্রখ্যাত নাট্যশিল্পীদের নাটক আরবীতে রূপান্তরিত করে আরব দর্শকবৃন্দের সামনে উপস্থিত করেন।

এতে দুটো ধারা ক্রিয়া করে: প্রথমতঃ আরবী পাঠক-পাঠিকা ও দর্শক-বৃন্দ নাটকের টেকনিক ও কলা-কৌশল সম্পর্কে অবহিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয় সমাজ-জীবনের বৈচিত্র্যময় দিক তাদের সমাজ-জীবনের মাপ-কাঠিতে বিচারের সুযোগ ঘটে। তাছাড়া ইসলামের ইতিহাস খ্যাত বীর সালাহ্ উদ্দিনের জীবনকেন্দ্রিক নাটক 'সালাহ্ উদ্দিন' নাটকও নাজীব হাদ্দাদের অমর সৃষ্টি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর সময়কাল পর্যন্ত আরবী নাট্য-সাহিত্য একই গতানুগতিক খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আরবী নাটকে এক নতুন ধারার প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং এই ধারা নাটকের ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ।

নাটকের ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুতে নিজস্ব সামাজিক-জীবন চিত্রিত করার প্রয়াসে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেন মিশরের ওসমান জালাল এবং প্রখ্যাত কথাশিল্পী মোহাম্মদ তাইমুর। তাছাড়া নাটক মঞ্চস্থ করার কলা-কৌশলেও আধুনিক মনোভঙ্গীসঞ্জাত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। ফলে আরবদের নাট্যশিল্প বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময়ে রচিত মিখাইল নু'আমার 'আবু ওয়া ইবনু' (পিতা ও পুত্র) নাটকটি ওসমান জালাল ও মোহাম্মদ তাইমুরের প্রচেষ্টায় ইন্ধন যোগায় এবং আরবী নাট্যশিল্প আন্দোলনে চেতনা সঞ্চারী ক্রিয়া করে। 'আবু ওয়া ইবনু' নাটকের বিষয়বস্তুতে মিশরীয়দের সামাজিক জীবন-যন্ত্রণার চিত্র পরিস্ফুট।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুতে আরবী নাটকের ভাষায় কাব্য-রীতি লক্ষ্য করা যায়। প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আহমদ শাওকীই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় নাট্য-কবিতার প্রবর্তন করেন। অবশ্যি, প্রথমতঃ তাঁকে কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। প্রখ্যাত সমালোচকদের মন্তব্য থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, গদ্য-কবিতাই নাটকের প্রধান ভাষা ও অবলম্বন হওয়া উচিত। এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়েই

তিনি গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হন। এ ব্যাপারেও তিনি প্রথমে পশ্চিমী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। প্রথমত: তাঁর রচনায় ফ্রান্সের প্রখ্যাত নাট্যকার কর্নেলী, রেসিন, ভিক্টর হোগো প্রমুখের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি তাঁদের প্রভাব মুক্ত হয়ে আপন ঐতিহ্যে বৈশিষ্ট্যময় রূপ পবিগ্রহ করতে সমর্থ হন। তাঁর কাব্যরীতিতে রচিত নাটকের মধ্যে 'মাজনুন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস প্রসিদ্ধ লায়লী ও মজনুব অমর প্রেমকাহিনী এই নাটকের বিষয়বস্তু। নমুনা হিসাবে তাঁর মাজনুন নাটকের একটি দৃশ্যের অনুবাদ এখানে পেশ করছি। [বলা আবশ্যক যে প্রখ্যাত আরবী কবি কায়েস বিন আমর লায়লী নাম্নী এক যুবতীর প্রেমে মত্ত হন। প্রেমোন্মত্তার জন্যই তাঁকে 'মজনুন' বা 'পাগল' আখ্যা দেওয়া হয়। লায়লী-মজনুব প্রেমকাহিনী অবলম্বন করে অনেকেই নাটক রচনা করেছেন কিন্তু শাওকীর রীতি কাব্য-নাট্য। নিম্নোদ্ধৃত দৃশ্যে মজনুকে লায়লীর পিতা আল-মাহদীর তাঁবুতে যেতে দেখা যাচ্ছে লায়লীর কাছ থেকে আগুন আনার অজুহাতে।]:

কায়েস : নীবব নিথব রাত এবং মরুর নিস্তব্ধতা—
এসব বিদীর্ণ কবে আমার কাব্যেব হাওয়া বয়;
বিস্তৃত বালুকা ভূমি, এমন কি আকাশসীমানা
তুমিই করেছো পূর্ণ হে আল্লাহ্ প্রেমের পরশে;
এবং আমার কাঁধে দিয়েছো সে ভার।

উড়ন্ত ধূলির
বিস্ময়ে আমিই যাই লায়লার তাঁবুতে গোপনে।
পথের দিশারী নেই, একমাত্র মনের নায়ক
আমাকে চালিত করে।

সে আছে সমগ্র রাত ধরে
আমার তাঁবুর কাছে; অথচ পাইনা তাকে আমি।

আমার এ মন ছুটে প্রেয়সী লায়লা সন্নিধানে—

সুউচ্চ পাহাড় থেকে যেমন ঝর্ণার স্রোত নেমে
নদীর মিলন চায়।

হে আল্লাহ্ ক্ষমা করো তাকে—
যেহেতু, আমার মনে দিয়েছে সে যন্ত্রণার বোঝা
এবং হৃদয় জুড়ে প্রেমের আগুনে পোড়া ছাই।

কী করে তাঁবুতে থাকি। অন্ধকারে। আলোর অভাবে
কেমন বিচ্ছিরি লাগে; আলো চাই, আলো চাই আমি।

আল-মাহদী : দাঁড়াও কায়েস।
(লায়লাকে ডেকে) লায়লা, লায়লা!

লায়লা : (তাঁবুর অপর পার্শ্ব থেকে) কেন ডাকো, বাবা!

আল-মাহদী : এসেছে তোমার ভাই, কায়েস এখানে।
আগুনের প্রয়োজন। অগ্নি দিতে হবে।

(লায়লা তাঁবুর বাইরে চলে এলো)

লায়লা : এসেছো কায়েস ভাই; স্বাগত, স্বাগত।

কায়েস : তোমার জীবন হোক অনুপম, সুন্দর শোভন।
(আল-মাহদী তাঁবুর ভেতরে চলে গেলেন। লায়লা তখন দাসী আফরাকে ডাক দিলো এবং আফরা এসে হাজির।)

লায়লা : এখনি আগুন আনো, কায়েসের খুব প্রয়োজন।
(আফরার সঙ্গে লায়লাও দ্রুত চলে গেল আগুন আনতে।)

কায়েস : লায়লা, তুমিও গেলে আগুন আনার অভিপ্রায়ে—
কি অগ্নি জ্বেলেছো তুমি আমার হৃদয়-শুষ্ক কাঠে?
তোমার ও অগ্নি যেন কিছু নয়, কিছু নয় আহা;
জ্বালাময়ী আমার গজল অগ্নির চেয়েও তীব্র।
যে যন্ত্রণা নিয়ে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি একা
তোমার ও অগ্নি যেন কিছু নয় যন্ত্রণার কাছে।

(লায়লা শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে এনে কায়েসের হাতে সমর্পণ করে)

লায়লা : সামান্য সময়টুকু, যা নাকি মিলন ঘটিয়েছে
আমাদের দু'জনের; আল্লার কসম, আমি বলি
সমগ্র-জীবন থেকে সে মুহূর্ত দামী বলে জেনো।

কায়েস : তুমি কি আমাকে চাও? বলো, বলো তবে?

লায়লা : তোমার আত্মাকে বলো, সে দিবে উত্তর।
আমিতো পাথর নই, কিম্বা লৌহে গঠিত জীবন।
যে জ্বালা সইছি আমি, পৃথিবীর মানুষ পারে না
সে জ্বালা ধরতে বুকে। কী যে জ্বালা!
প্রেমের আগুনে!

কায়েস : কি করে বুঝাই বলো আমার আত্মার মর্মকথা?
দুই চোখে অশ্রু এনে বলবো কি প্রেম উপাখ্যান?
নাকি আছে এর কোনো সংক্ষিপ্ত জবাব?

লায়লা : কায়েস, আমাকে বলো মরুভূর উত্তপ্ত বালিতে
কী হীরক দ্যাখো তুমি? তোমার কাব্যের সুষমায়
বালিও হীরক হয়ে ঘোরে ফেরে শহরে নগরে।
অথবা হরিণী দেখে তার সে গলায় কী কৌশলে
কাব্যের মালিক দাও, তাকি তুমি দেখেছো কখনো?
হরিণী তোমার প্রিয়, আমি কি তোমার কিছু নই?

কায়েস : হরিণী হিংসা করো; সে কিন্তু তোমাকে ভালোবাসে।
তোমার পায়ের চিহ্ন আছে বলে মরুভূর বালি
হীরক আমার কাছে। এমন কি হরিণী ও চাঁদ
আমার হৃদয় জুড়ে তোমার ও ভালোবাসা আনে।

(লায়লা দেখলো যে ততক্ষণে আগুন কাঠ দগ্ধ করে কায়েসের জামার আস্তিনে ধরেছে।)

লায়লা : আল্লার কসম, তুমি পুড়ে গেলে কায়েস আমার!
(কায়েসের সেদিকে কোন খেয়াল নেই। সে বলেই চলছে)

কায়েস : ভোরের জানালা খুলে যখন বাতাসে মুখ রাখি
তোমার খোশবু আসে বাতাসে একাত্ম হয়ে, আর
হরিণীর চোখে দেখি চুরি করা তোমার দু'চোখ।

লায়লা : ফেলে দাও অগ্নি কাঠ; দ্যাখোনা পুড়ছে ডান হাত?
(কায়েস অগ্নি ফেলে দিয়ে বলেই চলেছে)

কায়েস : হিংস্র ব্যাঘ্রের চেয়ে কঠিন তোমার পিতামাতা,
বাঘ, সেও দাঁত থাবা বিস্তার করে না।
ববঞ্চ সে
আমাকে সান্নিধ্যে রাখে একান্ত আপন মনে করে।

লায়লা : কায়েস, বড়ই দুঃখ। এমন কি হাত পুড়ে গেলে
একটু পায়না টের, প্রেমের আগুন বড়ো তবে?

কায়েস : তোমার প্রেমের অগ্নি পুড়িয়েছে অন্তর আমার।
সামান্য আগুনে ভয়? সেতো শুধু পুড়িয়েছে হাত।

(কায়েস কাঁপতে শুরু করলো। অচেতন হয়ে পড়ে গেলো। লায়লা কায়েসের মাথা বুকে তুলে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলা শুরু করলো)

লায়লা : কেন যে এমন করো। কি হয়েছে বলো না আমাকে।
হোক্ না আমার বাবা শত্রু তব?
আমি তো তোমার।

কায়েস : কেমন অস্বস্তি লাগে; চোখ দুটি বন্ধ হয়ে আসে।
আমার পায়ের নেই কোনো শক্তি; কী করে এদেহ
রাখবে সে ধরে?
(লায়লা এবারে কায়েসকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার শুরু করলো।)

লায়লা : বাবা, বাবা, তোমরা কোথায় ?
কায়েস মরলো পুড়ে। বলে না সে কোনো কথা আর।
(আল-মাহদী তাঁবুর বাইরে এলেন এবং বলা শুরু করলেন।)

আল-মাহদী : লায়লা, দ্যাখোনা তুমি সবাই কেমন ঠাট্টা করে।

লায়লা : জীবনের কাছে ঠাট্টা অতি তুচ্ছ। কেন যে অযথা
ঠাট্টাকে ডরাও তুমি। যে যা খুশী বলুক,
তাতে কি ?
তারা কি দেখেছে কভু আমার হৃদয় ? বাবা, বাবা
কায়েসকে নাওনা তুমি কোলে। আমি যে পারি না......
(আল-মাহদী কায়েসকে কোলে নিলেন এবং লায়লাকে বলতে শুরু করলেন।)

আল-মাহদী : আল্লাহ্ সহায় হোন। তোমার ধৈর্যের পুরস্কার
নিশ্চয় আসবে ধাবে। 'পাছে লোকে কিছু বলে' ভয়
আমাকে বিব্রত করে। অথচ আমার এ-হৃদয়
করুণার স্নিগ্ধ তাপে গলে নিরবধি।
তুমি কি জানো না
তোমার অন্যায় আমি কতবার করেছি যে ক্ষমা ?
আমি পিতা ; অন্য দশজন
পিতার মতন
আমি তো কঠিন নই। তোমার প্রশান্তি আমি চাই।

(কায়েসকে বলতে শুরু করলেন)

কায়েস, কায়েস তুমি একবার তাকাও এদিকে।
তোমার কবিতারাজি যদিও আমার কাছে পাপ
তথাপি তা পড়ি আমি। সৌন্দর্য কে না ভালোবাসে ?
(কায়েস চোখ মেললো। আল-মাহদী উত্তেজিত হয়ে বললেন)
কায়েস। কায়েস।

কায়েস : আমি তো এখানে আছি । আপনার পাশে।'

আল-মাহদী : চলে যাও, চলে যাও তুমি।
এখানে এসোনা কোনোদিন।

লায়লা : বাবা, বাবা, ও কথা বলো না।

আল-মাহদী : বলবো না কেন ?

লায়লা : তুমি কি দ্যাখো না বাবা কায়েস কেমন
অস্তগামী সূর্যের মতোন

করুণ, ফ্যাকাশে।

তোমার কি দয়া নেই, মায়া নেই কোনো ?

আল-মাহদী : লায়লা, নিশ্চুপ হও। বাড়িয়োনা ক্রোধের আগুন।

কায়েস : কি দোষ করেছি আমি ? ভালোবাসা অন্যায় ? জানি না।

লায়লা : কায়েসের কি বা দোষ ? আমিই বরঞ্চ বেশী দোষী।

আল-মাহদী : তোমার কবিতা তুমি ভুলে গেছো ? কি লিখেছো তাতে ?

কায়েস : ও সব বানানো কথা, মিথ্যা সব, মিথ্যা।

আল-মাহদী : যে কবিতা লিখেছিলে 'গয়েলের' নির্জন কোঠায়
সে কবিতা কাকে নিয়ে ? বলো তুমি, বলো ?
কে ছিলো তোমার পাশে কবিতার উৎস কেন্দ্র হয়ে ?

কায়েস : যে থাকে অন্তরে বসে সে আমার কাব্যের প্রতিমা।
• কে তাকে বিচ্ছিন্ন করে, কার সাধ্য আছে ?

আল-মাহদী : চলে যাও, চলে যাও তুমি।
তুমি কি এসেছো আজ অগ্নি নিতে? না কি
পোড়াতে এসেছো এই আমাদের সম্মানের তাঁবু?

কায়েস : কোথায় আকাশ তুমি? কোথায় পৃথিবী, দ্যাখো চেয়ে
যে আছে কবরে শুয়ে। কাকে বলে ঘুম?
জীবনে দেখিনি আমি। মহাযাত্রা যদি শুরু হয়
একাকী যাব না আমি। লায়লা আমার স্বর্গ-সুখ,
থাকবে আমার পাশে চিরদিন। চিরদিন পাশে।

[কায়েস যেন কবর থেকে উচ্চস্বর শুনতে পেলো।]

উচ্চস্বর : কায়েস! কায়েস!

কায়েস : কে তুমি কে তুমি?

উচ্চস্বর : কায়েস! কায়েস!

কায়েস : শুনছি! শুনছি!

উচ্চস্বর : কায়েস! কায়েস!

কায়েস : কবর আমাকে ডাকে, শুনেছি শুনেছি!

উচ্চস্বর : কায়েস! কায়েস!

কায়েস : আমার এ নাম ধরে বার বার তুমি ডাকো, ডাকো...
আমি তো তোমার পাশে রয়েছি একাকী।

(কায়েস মৃত্যুর কাছাকাছি এসে গেছে। আর্তস্বরে বলছে।)
মৃত্যু কি পারবে মুছে দিতে
আমাদের ক্ষত চিহ্ন কোনদিন ভুলে?
অথবা দূরত্ব এনে দিতে
আমাদের এ তাঁবুর মাঝখানে?

উচ্চস্বর : কায়েস ! লায়লা !

কায়েস : লায়লা-কায়েস নাম চিরদিন রবে—
যদিও দেখেনি কভু এ নিষ্ঠুর পৃথিবী তাদের ;
অমর ! অমর জেনো লায়লা এবং এ পাগল ।

'মাজনুন' নাটক যে আহমদ শাওকীর অমর সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। আহমদ শাওকীর ভাষা সরল, নাটকের সংলাপ গতিশীল কিন্তু বড় বেশী আবেগধর্মী। এই আবেগ প্রবণতার জন্যই লায়লা-মজনুর প্রেম আরও ঘনীভূত হয়ে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়েছে।

শাওকী প্রথমতঃ কবি অতঃপর নাট্যকার। এ কারণেই তাঁর রচনায় নাটকোচিত গুণ অনেকক্ষেত্রেই অনুপস্থিত এবং লিরিকধর্মীতার প্রাধান্য লক্ষ্যযোগ্য তবে একথা সত্য যে, নাটকের ভাষায় পদ্যরীতির প্রবর্তনে একমাত্র শাওকীই যতটা সফলকাম' হয়েছেন আর কেউ ততটা সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হন নি।

শাওকীর পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সমালোচকের মধ্যে নাট্য-কবিতা নিয়ে গভীর আলোচনার সূত্রপাত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ডক্টর তাহা হোসাইন তাঁর 'আল আদিব' (সাহিত্য) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: আরবী সাহিত্যে নাট্য-কবিতার এখনও শৈশব অবস্থা। এবং নাটক গদ্যে রচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নইলে সাধারণ দর্শকের পক্ষে পাঠোদ্ধার করা কষ্টকর ব্যাপার।

কিন্তু ডক্টর তাহা হোসাইনের সমসাময়িক লেখক ও সমালোচক আজীজ আবাজা প্রতিবাদমূলক মন্তব্য করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: কাব্যরীতিতে রচিত নাটক পশ্চিমী দেশের মঞ্চে মঞ্চস্থ করতে কোনোরূপ অসুবিধে হয় নি ; বরঞ্চ তা সফলতা অর্জন করতেই দেখা গেছে। কাজেই কাব্যরীতিতে নাটক রচনার প্রচলন যদি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় থাকে তবে আরবী ভাষায়ও থাকবে তাতে কোন আপত্তি না থাকাই উচিত।'

'মাজনুন' ছাড়াও আহমদ শাওকী রচিত 'আমিরাতুল আনদালুস' 'আনতারা' এবং 'আলী বেক আল কাবির' প্রভৃতি যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। 'আলী

বেক আল কাবির' সামাজিক নাটক এবং 'আমিরাতুল আনদালুস' ও 'আনতারা' ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত আন্দালুসের রাজা-বাদশাহ ও কবিদের জীবনকাহিনী। 'আনতারা' নাটকে আহমদ শাওকীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শুধু 'সাবআ মুয়াল্লাকা গোষ্ঠীভুক্ত' অন্যতম কবি আনতারার সংগ্রামবহুল জীবন-চিত্রণেই ক্ষান্ত হন নি, বরঞ্চ তৎকালীন আরবদের সমাজব্যবস্থার এমন একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন যা দর্শকদের সামনে জীবন্ত হয়েই প্রতিভাত হয়।

বলা আবশ্যক যে, আনতারা ষষ্ঠ শতাব্দীর 'সাবআ মুয়াল্লাকার' অন্যতম কবি। তিনি আব্স বংশের অন্যতম প্রধান শাদ্দাদের পুত্র। নিগ্রো ক্রীতদাসী জাবিহার গর্ভে জন্মলাভ করায় আনতারা প্রথমতঃ শাদ্দাদের পুত্র হিসাবে স্বীকৃত হন নি। কিন্তু আনতারার অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা এবং বীরত্ব গুণ শাদ্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তাঁকে নিজের ঔরসজাত সন্তান বলে স্বীকার করেন। 'জন্মে মানুষের বিচার হয় না, কর্মে'—এই নীতিবাক্য স্মরণ রেখে আহমদ শাওকী আনতারাকে এমন একটি চরিত্র হিসাবে চিত্রণ করেছেন যা আমাদের কাছে শ্রদ্ধার সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আন্তারা' নাটকে আনতারার দাহিস এবং গবরা যুদ্ধবিজয় বীরত্ব-পূর্ণ পরিচয়ের অভিব্যক্তি। তাছাড়া প্রধান চরিত্র আনতারার বিবাহের দৃশ্যটি খুবই উপভোগ্য। আব্স রাজবংশসম্ভূত এবং আনতারার চাচাত বোন আবালার সঙ্গেও তাঁর বিবাহের নানা বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হলো। সে বাধাও তিনি অতিক্রম করলেন কাব্য-প্রতিভা ও বীরত্বের গুণাবলী দিয়ে। মোটকথা 'আনতারা' আহমদ শাওকীর এক অমর সৃষ্টি: ফলে আনতারা সকলের গৌরবের বস্তু।

গদ্যরীতিতে যাঁরা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে জীবরান খলীল জীবরান অন্যতম। জীবরান মূলতঃ কবি এবং দার্শনিক কবি। এজন্যে তাঁর নাটকে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাই আশ্রয়লাভ করেছে অধিকমাত্রায়। জীবরান-দর্শনের মূলতত্ত্ব জীবনবাদ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির

সমন্বয়সাধনই জীবরান-দর্শনের মূল বক্তব্য। এক বিন্দু জলে গোটা সমুদ্রের অস্তিত্ব কিংবা এক কণা বালিতে গোটা মরুভূমির অস্তিত্ব—এই দার্শনিক তত্ত্বই জীবরান মতবাদের সারবস্তু। এবং এই মতবাদই তাঁর সমস্ত রচনায় বিস্তারিত।

খলীল জীবরান মূলত: খৃষ্টধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর রচনার বিষয়-বস্তুতে মুসলিম দর্শন পরিস্ফুট। তাঁর 'ইরামা জাতিল ইমাদ' (গৌরবের রাজধানী) নাটকটি মুসলিম দর্শনের একটি জ্বলন্ত আলেখ্য। নাটকটির ভূমিকা দিতে গিয়ে লেখক পবিত্র কুরআনের আয়াত 'আ'লাম তারা কায়ফা বেআদে এরামা জাতিল ইমাদ আল্লাতি লাম ইউখ্লাক মিসলুহা ফিল বিলাদ' এবং হাদিসের অংশ 'ইয়াদ খুলুহা বায়াদা উম্মাতি' ছাড়াও আশ্শাবীর ,শায়েরুল মুলুক' গ্রন্থ থেকে একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। অত:পর 'স্থান' 'সময়' 'চরিত্র' ইত্যাদি সন্নিবেশ করে নাটকের শুরু করেছেন। নমুনা হিসাবে নাটকটির প্রথম ও শেষ অংশ থেকে কিছু অনুবাদ পেশ করছি:

স্থান: ছোট বন; চারপাশে দাঁড়ানো পপলার গাছ ও ঝাউ শাখা। মাঝখানে গ্রাম। গ্রামের নাম আল-হারমিল। লেবাননের পূব-উত্তর দিকে অবস্থিত। অদূরে একটি নদী বহমান। নদীর নাম আল-আসি। গ্রামের একটি নির্জন পুরনো বাড়ী।

সময়: মাঝামাঝি শ্রাবণের বিকেল।

চরিত্র: জয়নুল আবেদীন (নাহাওন্দের অধিবাসী। বয়স চল্লিশ। সিদ্ধপুরুষ।)

নাজীব রাহমী (লেবাননের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত। বয়স তিরিশ বছর।)

আমিনা (বয়স কেউ বলতে পারে না। তাপসী বলে পরিচিতা।)

[পর্দা উঠালে দেখা যাবে জয়নুল আবেদীন একটা হাতের তালু ভাঁজ করে গালে ঠেকিয়ে এবং কনুই হাঁটুতে ভর দিয়ে বৃক্ষের ছায়ায় বসে আছেন। বেড়ানোর ছড়িটা পাশেই মাটিতে ঠেস দেওয়া। নাজীব রাহমী সেখানে ঘোড়ায় চড়ে প্রবেশ করবেন। তারপর ঘোড়া থেকে অবতরণ করে ঘোড়াটা গাছের কাণ্ডের সাথে বেঁধে দু'হাত দিয়ে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে জয়নুল আবেদীনের ঠিক সামনে এসে বলবেন।]

নাজীব।। আস্‌সালামু আলাইকুম, জনাব।

জয়নুল।। ওয়ালাইকুম অস্‌সালাম। (মুখটা একটু ঘোরালেন। তারপর মনে মনে আওড়ালেন, সালাম হয়তো গ্রহণ করলাম কিন্তু এর পবিত্রতা? সেটা ভিন্ন জিনিস।)

নাজীব।। আচ্ছা, এখানে কি তাপসী আমিনা থাকেন?

জয়নুল।। হ্যাঁ, এটা তাঁর বাসস্থানের মধ্যে একটি।

নাজীব।। এটা ছাড়া কি তাঁর আরও বাড়ী আছে?

জয়নুল।। তাঁর এতো বাড়ী যে, সেসব গণনার বাইরে।

নাজীব।। আমি অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি। কই, অসংখ্য বাড়ীর কথাতো কেউ কখনো বলে নি?

জয়নুল।। এতে বুঝা যায় আপনাকে যারা সংবাদ দিয়েছে তারা চর্ম-চক্ষু ছাড়া আর কিছুই দেখে না এবং দুটো কান ছাড়া কিছুই শুনে না। আমিনা তাপসী সবখানেই আছেন। (পাশের ছড়িটা হাতে নিয়ে অগ্রভাগ দিয়ে পূব দিকে দেখিয়ে) এমনকি ওই পাহাড়ের চূড়ায়ও তাঁকে দেখা যায়, আবার এই উপত্যকাভূমিতেও তিনি বিচরণ করেন।

নাজীব।। আচ্ছা, আজ কি তিনি এখানে ফিরবেন।

জয়নুল।। আল্লার ইচ্ছা। তিনি নিশ্চয়ই ফিরবেন।

নাজীব॥ (জয়নুলের মুখোমুখী হয়ে একটা পাথরের উপর বসে এবং এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে) কিছু মনে করবেন না, আপনার দাড়ির ধরন দেখে মনে হয় আপনি পার্শী।

জয়নুল॥ হ্যাঁ, আমার জন্ম নাহ্ওয়ান্দে, প্রতিপালিত হয়েছি শিরাজে এবং লেখাপড়া শিখেছি নিসাপুরে। পূর্ব-পশ্চিম অনেক জায়গায়ই ভ্রমণ করেছি; কিন্তু একটা কথা কি, আমি সব জায়গায়ই জ্ঞানে দরিদ্র ছিলাম।

নাজীব॥ নিজেকে সবাই দরিদ্র বলেই পরিচয় দেয়।

জয়নুল॥ সত্যি কথা। আমি হাজার লোকের সাথে মিশেছি, আলাপ করেছি, কিন্তু এমন একটি লোকও পাই নি যে নিজের ভাগ্যেই সন্তুষ্ট। বিরাট পৃথিবীর ভিতর নিজের সামান্য গণ্ডী নিয়ে সকলকেই ব্যস্ত দেখতে পাই। পৃথিবী সম্বন্ধে ধীরভাবে কোন চিন্তাই তারা করে না।

নজীব॥ (জয়নুলের কথায় একটু আশ্চর্যান্বিত হয়ে) আচ্ছা, জনাব তা'হলে কি মানুষ ও তার জন্মের সাথে কোন যোগসূত্র নেই?

জয়নুল॥ মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা নিজেদের জীবনেই সীমাবদ্ধ, এবং চিন্তাধারা কেবল নিজেদের জীবন ঘিরেই। তাদের দুর্বল দৃষ্টি নিজের চলার পথের পদক্ষেপ ছাড়া এক ইঞ্চিও বাইরে যায় না এবং নিজের হেলান দেওয়ার দেয়াল ছাড়া কোথাও কাঁধ সরে না।

নাজীব॥ আমাদের মধ্যে সবারই তৃতীয় চক্ষু নেই যা দিয়ে তারা জীবন সম্বন্ধে খুব তলিয়ে দেখবে। এই কারণেই তাদের দুর্বল দৃষ্টি থেকে আলোর উৎস দূরের কথা সূক্ষ্ম চিন্তাও আশা করা যায় না।

জয়নুল॥ সত্যি কথাই বলছেন। তবে এটাও ঠিক যে, আঙ্গুর না চটকালে তা থেকে শারাব পাওয়া যায় না।

নাজীব ।। (কিছুক্ষণ ধীরভাবে চিন্তা করে) আমি অনেক বছর যাবৎ আমিনা তাপসীর জীবন সম্বলিত গল্প শুনেছি। সেইসব গল্প আমাকে আকৃষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত মনস্থ করেছি তাঁর সাথে দেখা করবো। তাঁর জীবনের গোপন রহস্য জানবো।

জয়নুল ।। পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই আছে যে আমিনাকে ভাল করে জানতে পারে। বাগানে ভ্রমণ করে কি সাগরের তলদেশের মুক্তোর সন্ধান পাওয়া যায়?

নাজীব ।। মাফ্ করবেন, জনাব। আমি আপনার কথা স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না। জানি, আমার পক্ষে তাঁর জীবনরহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়, তথাপি আমার জানবার ইচ্ছা, তিনি যে সাধনা-নগরের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন আমাকে তার অধিবাসী করবেন। সেই নগরের স্বুবর্ণ রাজধানীতে আমিও তাঁর একজন হবো।

জয়নুল ।। তাঁর ধৈর্যের দরজার পাশে আপনার প্রতীক্ষা করা উচিত। যদি সে দরজা খুলে যায় তবে আপনার সৌভাগ্য, গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবেন। যদি তা না হয় আপনার পক্ষে আক্ষেপ, নিরানন্দ জীবন।

* * * *

নাজীব ।। প্রত্যেক ধারণায়ই কি সত্য নিহিত আছে?

আমিনা ।। নিশ্চয়। কোনকিছু আত্মার আয়নার সামনে না দাঁড়ালে প্রতিবিম্ব পড়ে না। স্বচ্ছ হ্রদের ধারে গাছপালা না থাকলে কি করে হ্রদের জলে ছায়া প্রতিফলিত হবে? অস্তিত্ববিহীন কোন পদার্থের সূর্যের আলোকে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় না। অস্তিত্ব না থাকলে কোনকিছু দেখা এবং অনুভব করা যায় না। যখন আপনি কোন জিনিস দেখেন, বিশ্বাস করবেন সত্যিকারের গোপন রহস্য কিছুই আপনি বাইরের চক্ষুতে দেখবেন না। সেই সব বুঝতে হলে তৃতীয় চক্ষু খুলতে হবে, তবেই

আপনি সফল হবেন। বিশ্বাসীদের ধারণা সাধারণ মানুষের ধারণার চেয়ে পৃথক। তাঁরা বিশ্বাসটাকে তাঁদের চারপাশের দেয়াল মনে করেন এবং সেই দেয়ালঘেরা পথে যখন তাঁরা ভ্রমণ করেন তখন ভাবেন 'এই শহরের কোন বহিঃপথ নেই—ভেতরেই এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ।' (আমিনা উঠে দাঁড়ালেন ও চারপাশে একটু চিন্তাক্লিষ্টভাবে ঘুরে ঘুরে) বিশ্বাসীরা চিরকাল বেঁচে থাকবেন আর অবিশ্বাসীরা মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তাদের জীবন কত ক্ষুদ্র যারা পৃথিবীতে হাত ও মুখের সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। আর তারাও খুব বুদ্ধিহীন যারা সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দৈহিক ছায়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই দেখে না।

নাজীব।। (দাঁড়িয়ে, যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়ে) তাহলে লোকের কাছে কি বলবো যে, ইরাম, গৌরবের শহর, কেবল আধ্যাত্মিক স্বপ্নের শহর? আমিনা তাপসী সেখানে পৌঁছেছেন তাঁর প্রেম, ভালবাসা, চেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা ও একনিষ্ঠ বিশ্বাস দ্বারা?

আমিনা।। হ্যাঁ, তাদেরকে বলবেন, ইরাম গৌরবের রাজধানী, পৃথিবীর সাগরপর্বত মরুভূমি যেরূপ বর্তমান, তদ্রূপ। বলবেন, আমিনা সেখানে পৌঁছেছে কঠিন মরুভূমি পার হয়ে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করে ও নির্জন জীবনের অভিশাপ বহন করে। বলবেন, সেই রাজধানী তৈরী হয়েছিল শতাব্দীর বিজ্ঞ কারিগর দ্বারা—তাদের পরিশ্রমে—মানব থেকে গোপন করে নয় বরঞ্চ মানবই তার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বলবেন, ইরামে পৌঁছতে যারা পথ ভুল করে তারা যেন কঠিন রাস্তাকে দোষারূপ না করে, বস্তুতঃ দোষারূপ করে তাদের পথ-চালককে। আরও বলবেন, যারা সত্যের আলো না জ্বালে, তারা তাদের সামনের পথ বরাবরই অন্ধকার দেখবে, একেবারে অন্ধকারময়। (আমিনা প্রেমময় চোখ তুলে উপরে তাকালেন—মুখে স্বর্গের আভা।)

নাজীব।। (আস্তে আস্তে আমিনার দিকে অগ্রসর হলেন ও ভক্তিতে মস্তক নোয়ালেন) তাহলে আমি মানুষের ঘরে পৌঁছে যাবো সূর্যাস্তের পূর্বেই যেন অন্ধকার আমার রাস্তাকে গিলতে না পারে।

আমিনা ॥ আলোকে পথ চলুন। আল্লাহর বিশ্বাসই আলো।

নাজীব ॥ যে প্রদীপ আমার হাতে দিলেন তা নিয়ে হাঁটতে আমার আর কোন ভয় নেই।

আমিনা ॥ আলোময় সত্যপথে চলুন। দেখবেন কঠিন ঝড়ও সে আলো নিভাতে পারবে না। (আমিনা দীর্ঘ ও একদৃষ্টিতে নাজীবের দিকে চাইলেন।)

জয়নুল ॥ (নাজীবের দিকে অগ্রসর হয়ে) এখন আপনি কোথায় থাকবেন?

নাজীব ॥ আমার প্রতিবেশীদের কাছে, আসী নদীর ধারে।

জয়নুল ॥ সেসব লোকের সান্নিধ্যে পৌঁছতে আপনার সাথী হতে পারবো কি?

নাজীব ॥ নিশ্চয় পারবেন। তবে আপনিত এখানে আমিনা তাপসীর কাছাকাছি আছেন। আমিও যদি থাকতে পারতাম।

জয়নুল ॥ আমরা সূর্য থেকে দূরে আছি। সূর্যের কাছাকাছি যেতে পারি না তথাপি সূর্য আমাদের খুবই দরকারী। আমি সপ্তাহে একবার আসি আশীর্বাদের জন্য, নিজেকে পরিতৃপ্ত করে চলে যাই।

নাজীব ॥ চলুন আমরা যাই। এখন থেকে একা নয়—অনেকে—সপ্তাহে একবার নয়—হাজার বার এই পথে আসবো।

(নাজীব ঘোড়াটাকে বৃক্ষের কাণ্ড থেকে মুক্ত করলেন এবং জয়নুল আবেদীনকে পাশে বসিয়ে দু'জনে চললেন—অনন্তের পথযাত্রী।)

উপর্যুক্ত 'ইরামা জাতিল ইমাদ' নাটকে জীবরানের রচনার বৈশিষ্ট্যময় দিক জীবনবাদই সুস্পষ্ট। নাটকোচিত গুণাবলীতে এটা কতটা সমৃদ্ধ সেটা অবশ্যি প্রশ্নসাপেক্ষ। নাটকে চরিত্র অঙ্কন এবং দৃশ্য ইত্যাদির বাহুল্য নেই। তিনটি মাত্র চরিত্র এবং তিনটি চরিত্রই প্রধান; এক অঙ্ক এবং

এক দৃশ্যেই নাটকটির পরিসমাপ্তি। তবে সংলাপ-বাক্য এত দীর্ঘ যে, তা বক্তৃতায় রূপলাভ করেছে। আধুনিক নাট্যসমালোচকদের মতে দীর্ঘসংলাপযুক্ত বাক্য আধুনিক ভঙ্গীসঞ্জাত নয় এবং নাটক মঞ্চস্থ করার সময় এসব প্রায়ই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাতে অসুবিধে ঘটায়। তবে নাটকটির ভাষা পণ্ডিত্যপূর্ণ এবং উপমা রূপকল্পও চমৎকার।

জীবরান-রচনা দর্শনতত্ত্ব ভারাক্রান্ত একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই নাটকটি তত্ত্ব-সমৃদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু মিশরের আনতুন ইয়াজবাক এবং সিরিয়ার মারুন গুসন (জন্ম: ১৮৮১) নাটকে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করে জনসাধারণের যে সমর্থন অর্জন করেছেন, জীবরানের ভাগ্যে তা জোটে নি। জীবরানকে বুঝতে হলে যেমন তৃতীয় চক্ষুর দরকার তেমনি তাঁর নাটক অনুধাবন করতে হলেও অন্তঃচক্ষু উন্নত হওয়া দরকার। এদিক দিয়ে বিচার করলে 'ইরাম জাতিল ইমাদ' সার্থক রচনা কিন্তু সার্থক নাটক নয়। সার্থক নাটকের জীবনসম্পর্কিত গতিবেগ এবং মর্মান্তিক ভূমিকা এতে অনুপস্থিত এবং রসানুভূতিও কম।

ডক্টর তাহা হোসাইন আধুনিক আরবী সাহিত্যে একটি বহু-আলোচিত নাম। আরবী সাহিত্যের সবগুলো শাখাই তাঁর অনবদ্য রচনায় সমৃদ্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে 'জহুরুল ইসলাম' (শান্তির প্রকাশ) সব চেয়ে বেশী প্রশংসার দাবিদার। নাটকটিতে ইসলামপূর্ব যুগের আরবদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কুসংস্কারপূর্ণ পরিবেশের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই বিভিষিকাময় মুহূর্তে রাসূলে করীমের আবির্ভাব এবং 'জহুরুল ইসলাম' বা শান্তির প্রকাশ সত্যি এক প্রচণ্ড বিস্ময়। এসবেরই পূর্ণ বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য নাটকে। চরিত্র চিত্রণে ডক্টর তাহা হোসাইনের ক্ষমতা অপরিসীম। তা'ছাড়া তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতাও লক্ষ্য করবার বিষয়। নাটকটিতে যে জীবন তৎগত সে জীবনে ভাবালুতার স্পর্শ নেই, আছে কর্মাত্মক ভূমিকার এক অপূর্ব পরিবেশ এবং জীবনের গতিশীলতা কোথাও স্থিতিলাভ করেনি বরঞ্চ বেগবান হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তা'ছাড়া চরিত্রচিত্রণে লেখক যে রসানুভূতির সৃষ্টি করেছেন তা কেবল সর্বজনআদৃতই নয়, কাল্যোত্তীর্ণও বটে। সার্থক নাটকের সকল বৈশিষ্ট্যই আলোচ্য নাটকে সুস্পষ্ট।

আরবী নাট্য-সাহিত্যে মিশরের তাওফীক আল-হাকীমের অবদানই সবচেয়ে বেশী। শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয় সার্থক নাটক হিসেবে তাঁর রচনা যথেষ্ট সমাদরলাভ করেছে। মিশরের প্রাচীন ঐতিহ্য, লোক-কাহিনী ইত্যাদি তাঁর অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু। তা'ছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদিসের গল্পকেও নাটক রচনার উপজীব্য হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন ধরনের নাটকের মধ্যে 'মহম্মদ' নানা কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে।

'মহম্মদ' নাটকটি হজরত রাসূলে করীমের পূর্ণাঙ্গ জীবন-আলেখ্য। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনচরিত নিয়ে নাটক রচনা সম্ভবতঃ এই প্রথম এবং একে তাওফীক আল-হাকীমের রীতিমত দুঃসাহস বলা চলে। নাটকটি আজ পর্যন্ত কোথাও মঞ্চস্থ হয়েছে বলে শোনা যায় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নাটকটির চলচ্চিত্ররূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চললে মিশর সরকারের সেন্সরবোর্ড ঘোর আপত্তি জানায় এবং এই প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। তাদের প্রতিবাদের ঝড় ছিল রাসূলে করীমের ভূমিকা নিয়ে। রাসূলে করীম 'আশরাফুল মখলুকাত' বা মানব-শ্রেষ্ঠ; তাঁর সমকক্ষ আজ পর্যন্ত কেউ সৃষ্ট হয় নি। কাজেই এমন শ্রেষ্ঠ মানবের ভূমিকায় কাকেও অবতীর্ণ করানো সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বাছে ঘোর অপত্তিকর শুধু নয়, রীতিমত অবাস্তব এবং পাপ বলে স্বীকৃত। এই পরি-প্রেক্ষিতেই আজ পর্যন্ত নাটকটির মঞ্চস্থকরণ অকল্পনীয়ই রয়ে গেছে।

'মহম্মদ' নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল মহল ঘোর আপত্তি জানালে তাওফীক আল-হাকীম এই বলে তাদের আপত্তি খণ্ডন করেন যে, 'যীশুখৃষ্ট ও তাঁর দ্বাদশ শিষ্য' সম্পর্কিত নাটক যদি খৃষ্টান জগতে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে পারে তবে 'মহম্মদ' নাটকও অনুরূপ শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটাতে সমর্থ হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নাটক লিখলেই যে তা মঞ্চস্থ করতে হবে এমন কোন কথা নেই, সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যেকের কথাই যেন আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হচেছ এই আবেগ-অনুভূতির স্পর্শ অনুভব করাই 'মহম্মদ' নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য। যাহোক, আলোচ্যনাটকের মহম্মদ (দঃ), খদিজা, জিবরাইল, আজরাইল, আবুবকর, আলী, ওমর, ফাতেমা, আয়েশা চরিত্রগুলো এক-একটি অনবদ্য সৃষ্টি। তাওফীক আল-হাকীমের বিশিষ্ট বাব-ভঙ্গী সর্বত্র সংলাপের মধুরতায়

উজ্জীবিত হয়েছে। তা'ছাড়া লেখকের তীক্ষ্ণ অনুভূতি এবং চেতনার স্পর্শে নাটকটি উদ্দীপ্ত। ফলে এর গতিবেগ আমাদেরকে শুধু কর্মাত্মক জীবনে নয়, ন্যায়নিষ্ঠ সত্যের পথে চালিত করে। এখানেই নাট্যকারের আসল বৈশিষ্ট্য।

তওফীক আল-হাকীম 'মহম্মদ' নাটকের আগাগোড়াই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। রাসূলে করীমের সংলাপে নির্ভরযোগ্য হাদিস সংগ্রহ সত্যি দুরূহ ব্যাপার এবং এই দুরূহ কাজটি তিনি বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই সম্পাদন করেছেন। তা'ছাড়া মাঝে মাঝে পবিত্র কুরআনের আয়াত সংযোগ ধর্ম-প্রাণ মুসলমানদের কাছে আরও চিত্তাকর্ষক হয়েছে। সংলাপগুলো নাতিদীর্ঘ এবং ভাষা সহজ সরল এবং সাবলীল।

তাওফীক আল-হাকীমের 'শাহেরজাদ' নাটকটিও আরবী সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' শাহজাদা-শাহজাদীর অমর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। এবং এই প্রেমকাহিনীকে তিনি নতুন অঙ্গিকে এবং নতুন ভাবনায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এতে প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং প্রেমাশ্রিত জীবনের যে চিত্র আল-হাকীম আঁকতে চেয়েছেন সে জীবন গতিমান হলেও কর্মাত্মক নয়—ভাবাত্মক। নায়ক-নায়িকার কথোপকথনের মাধ্যমে যে প্রেম বিস্তারলাভ করেছে তা কেবল উপলব্ধি দিয়ে অনুভব করা যায় কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়গোচর হতে বেশ ভাবতে হয় এবং সময় লাগে। এটাই হয়ত নাট্যকারের কৃতিত্বের বড় অন্তরায়। নাটক মঞ্চস্থ হলে তা কতদূর সফলতা অর্জন করতে সমর্থ এ ব্যাপারেও নাট্যকারের সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। 'শাহেরজাদ' নাটকে তত্ত্বকথার অবতারণা করা হয়েছে বেশী—যেজন্য মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দর্শকমণ্ডলী বেশ কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে অতঃপর আনন্দের আভাস পাবে।

নাটকটির শুরুতেই নেপথ্যে শোনা যায় : 'আমি সব কিছুই ছিলাম, সব কিছুই আছি, এমনকি সব কিছুই থাকবো। কেউ আমার মুখোশ খুলতে পারবে না।'

নিঃসন্দেহে, কথা কটি চিন্তার স্রোত থামিয়ে দেয়। অতঃপর স্মরণে আসে রহস্যময়ী নারী-চরিত্রের মাহাত্ম্য : 'দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যা।' নারী রহস্যময়ী হলেও সে পুরুষের নিঃসঙ্গ সঙ্গী, প্রেমের পরম আশ্রয়। অথচ সৃষ্টির প্রচণ্ড গতিপ্রবাহে বিরাট ঘূর্ণিচক্রের আবর্তনমুখে পুরুষের জীবনও সময় সময় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দুনিয়ার সব কিছুই তখন তার কাছে বিস্বাদ ঠেকে—এমন কি তার প্রেমময়ী নারীও :

শাহরিয়ার : কি বলছো ?

শাহেরজাদ : কি আর বলবো ? তুমি কি চাও তাই ভাবছি।

শাহরিয়ার : তুমি ভালো করেই জানো, আমি কি চাই।

শাহেরজাদ : তুমি জানতে চাও আমি কি? আমি কে?

শাহরিয়ার : হ্যাঁ।

শাহেরজাদ : (হাসিমুখে) আমি একজন অপরূপ দেহধারিণী রমণী। দেহধারিণী ছাড়া আমি কি?

শাহরিয়ার : (চীৎকার করে) অমন সুন্দর দেহকে আমি ঘৃণা করি।

শাহেরজাদ : তাহলে আমি একটি মহান হৃদয়। মহান হৃদয় ছাড়া আমি কি?

শাহরিয়ার : ধিক্ তোমার অমন হৃদয়ে।

শাহেরজাদ : তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে যে, এই দেহকেই একদিন তুমি ভালোবাসতে। এমনকি তোমার হৃদয়ের বিনিময়েও ?

শাহরিয়ার : আমার সে মোহ কেটে গেছে। একদম কেটে গেছে।

বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের গতিবেগ পরিণামে শাহরিয়ারকে টেনে নিয়েছে প্রকৃতির দিকে। প্রকৃতিকে তিনি ভালো করে পাঠ করেছেন। সেখানে তাঁর আত্মোপলব্ধি ঘটেছে। এ-কারণেই তিনি শাহেরজাদকে একান্ত দেখতে পেয়েছেন প্রকৃতির মাঝে। প্রকৃতি ও নারীতে কোন তফাৎ নেই ভেবে আবার তিনি ফিরে এসেছেন শাহেরজাদের কাছে।

শাহরিয়ার আমার চুলে হাত বুলিয়ে দাও। তোমার মধুমাখা কথাগুলো শুনতে খুবই ইচেছ হচেছ। আগে জানতাম না যে তুমি এত সুন্দর। এটা কি তোমার মুখ শাহেরজাদ? আমার মনে হয় ওটা যেন মুখ নয়, মুক্তোভর্তি একটি পেয়ালা। এগুলো কি তোমার চুল? চুল নয়, যেন ঘন কালো আঙ্গুরের গুচছ।

শাহেরজাদ: ও সব রাখো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।

শাহরিয়ার: তোমার কোলে মাথা রাখতে দাও। আজ মনে হচেছ আমি যেন নির্বোধ শিশু। সত্যি আমি কি তোমার স্বামী? কখনো মনে হয় এসব মিথ্যে, অবান্তর। এই সত্যটা আমাকে খুলে বলো শাহেরজাদ। তোমার হাত দুটো দিয়ে আমাকে জড়িয়ে নাও। আহ্, ও যেন হাত নয়, নরম তুলোর পিণ্ড। এখন মনে হচেছ, সব কিছুই আমার। যদি কোনোদিন আমাকে এক কণাও ভালবেসে থাকো—সে ভালোবাসার কথা আজ আমাকে বলো।...... কিন্তু আমার জন্য তুমি একটুও অনুভব করো না।

শাহেরজাদ: (ঠাট্টা করে) তাহলে আবার তুমি আমার দেহকে ভালোবাসছো এবং হৃদয়ে ফিরে আসছো।

শাহরিয়ার: (ঘুমজড়িত কণ্ঠে) একটা কবিতা শোনাও শাহেরজাদ। কিংবা সেই মনোরম গল্প।......

শাহেরজাদ: (দরজার দিকে চেয়ে) তোমার গান শুনাও···

শাহরিয়ার: (ঘুমের ঘোরে) একটা গান শুনাও।...

শাহেরজাদ: শাহরিয়ার, আমার প্রিয়তম ...।

শাহরিয়ার: ... ...

শাহেরজাদ: (নিজে নিজে গানের সুরে)
ঘুমাও ... ঘুমাও ... ঘুমাও ...
সোনার খোকন ঘুমাও ...
শ্রান্তি এনেছে খেলায় ...
সোনার খোকন ঘুমাও ...

এ ভাবেই 'শাহেরজাদ' নাটকের পরিসমাপ্তি।

আধুনিক আরবী সাহিত্যিকদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যময় দিক হলো তাঁরা প্রকৃতিতে ফিরে এসেছেন। এই প্রকৃতিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। তাওফীক আল-হাকীমের ভাষায়: 'যে প্রকৃতির সব কিছু জানে সে কি শুধু নারী না প্রকৃতি নিজে?'

তাওফীক আল-হাকীম প্রথমত: কথাশিল্পী ও ঔপন্যাসিক; অতঃপর নাট্যকার। কাজেই উপন্যাস বা ছোটগল্পে তাঁর যে জীবন-প্রবাহ গতিমান সেই গতিবেগ তিনি নাটকেও আরোপ করেছেন। ফলে, তাঁর নাট্যশিল্পে যেমন আছে জীবনের প্রচণ্ডতা, ঘূর্ণিমুখর পরিবেশ তেমনি আছে প্রেম-বিরহ, হাসি-কান্না এবং সেই সঙ্গে কর্মময় আহবানের ইংগীত। এমন কি কোথাও কোথাও আবেগপ্রবণতার স্পর্শও সম্পৃক্ত। নাটকে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও রসসঞ্চার করতে হলে আবেগপ্রবণতা অপরিহার্য।

ইরাকের কবি ও কথাশিল্পী আবদ আল-মজীদ লুৎফীও নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'ক্বালব আল-উম্ম' (মায়ের হৃদয়) উপন্যাস যেমন আধুনিক আরবী সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে তেমনি অনবদ্য নাটক 'খাতিমাতু আল-মুসিকার' (শিল্পীর পরিণাম)-ও আরবী নাট্যসাহিত্যে বৈশিষ্ট্যময় দিক-চিহ্নের সূচনা করেছে।

আবদ আল-মজীদ লুৎফী ঐতিহাসিক ঘটনার চেয়ে সামাজিক ও সমসাময়িক ঘটনাবলীকেই নাটক রচনার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী এবং এ কারণে তাঁর নাটক 'খাতিমাতু আল-মুসিকার'-এ যে জীবন-প্রবাহ গতিমান তা আমাদের খুব পরিচিত এবং এরূপ ঘটনা বিশ্বের সর্বত্রই অহরহ ঘটছে। তবে লুৎফীর রচনার বৈশিষ্ট্য মানবতাবোধ। প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আলোড়ন এবং যন্ত্রণা মানবতার পথে অন্তরায় হলেও সৎবিবেকের তাড়নায় সাময়িক কুপ্রবৃত্তির বেড়াজাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

'মূলে ফেরৎ আসাই' ('ইয়ারজেয়ু ইলা আস্‌লেহী') মানবতার প্রধান লক্ষণ। আবদ আল-মজীদ লুৎফী এই মানবতারই জয়গান গেয়েছেন। তিনি তাঁর রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে। নাটকটির কাহিনীতে যতটুকু জানা যায় তাতে এক দরিদ্র শিল্পী—স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে দারিদ্র্যের কষাঘাতে পর্যুদস্ত। শিল্পীজীবন সার্থক করতে গেলে তার সংসার দেখা হয় না; আবার সংসারে নিবিষ্টচিত্ত থাকলে সত্যিকারের শিল্প গড়ে ওঠে না। অন্তর্দ্বন্দ্বের এই টানাপোড়েনে শিল্পী দুগ্ধীভূত হতে থাকলে তাঁর জীবনে দেখা দেয় এক নতুন উপসর্গ। তিনি এক ধনীলোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েন। ধনাঢ্য-কন্যাও ছিল শিল্পের সমঝদার। উন্নত শিল্প গড়ে তোলার ইচ্ছায় শিল্পী প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ধনাঢ্য-কন্যাকে বিয়ে করেন। কিন্তু এতেই কি তাঁর শিল্পসত্তার পরিবর্তন ঘটলো?

না।

শিল্পী উপলব্ধি করলেন শিল্পীমন আর আর্থিক স্বচ্ছলতা দুটো ভিন্ন জিনিস। অর্থের অভাব দূর হলো বটে কিন্তু শিল্পীমন আন্তর্হিত হলো। ওদিকে নতুন স্ত্রীর বেহায়াপনা এবং তার বন্ধুসংসর্গ দিন দিন তাকে বিব্রত করে তুললো; ফলে শিল্প তো দূরের কথা বিবেকের দংশনে তার শিল্পসত্তা সম্পূর্ণ বিপরীতগামীতায় প্রবাহিত হতে থাকলো। ওদিকে তার আগের স্ত্রীর ঘরের প্রথম সন্তানের মৃত্যুসংবাদে তিনি আরও ব্যথিত হলেন।

শেষপর্যন্ত শিল্পী ফিরে এলেন তাঁর আগের স্ত্রীর কাছে। ধনাঢ্য-কন্যাকে সম্পূর্ণ বিদায় করে দিয়ে।

আগের স্ত্রী তখন অবস্থান করছিল তার এক বড়লোক কন্যা-জামাতার সঙ্গে। আগের স্ত্রী তখনও স্বামীর প্রতি একটুও বিশ্বাস হারায় নি। সে স্বামীকে গ্রহণ করলো আন্তরিকতার সঙ্গে; কিন্তু দুঃখিত হলো স্বামীর শিল্পকলার অধঃপতন দেখে। এবারে শিল্পী আঁকতে পারলেন 'মাষ্টারপিস' এবং এটাই তাঁর শিল্পী-জীবনের সার্থকতা। পরবর্তী সময়ে শিল্পীর অভিমত, দারিদ্র্য এবং যন্ত্রণাই সার্থক শিল্পের পক্ষে পরম সহায়ক। বিলাসব্যসন সত্যিকার শিল্পের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ।

আবদ আল-মজীদ লুৎফী উপর্যুক্ত কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর 'খাতিমাতু আল-মুসিকার' নাটকে। লেখকের বক্তব্যে মুনশিয়ানা আছে, কেননা তীর্যক যুক্তির আলোকে প্রত্যেকটি সংলাপ মুখর এবং তা দর্শকদের অন্তরে রসানুভূতি সৃষ্টি করতে সমর্থ। তা'ছাড়া নাটকটি মানবতাবোধের চরম উৎস হিসেবেও স্বীকৃত।

তরুণ কথাশিল্পী মুহাম্মদ রিফাত আল-মাহীমু-এর 'রেজালুন ফি মালাবিসু বায়জায়ু' (শ্বেতপোশাকের মানুষ) নাটকটিও আরবী নাট্যসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আল-মাহীমু সমাজ-জীবনের চলমান ঘটনাকেই নাট্যরূপ দেওয়ার পক্ষপাতী এবং 'রেজালুন ফি মালাবিসু বায়জায়ু' নাটকে তিনি সমাজ-জীবনের চিত্রই পরিস্ফুট করেছেন। সমাজের এক শ্রেণীর ভালোমানুষপদবাচ্য ধোঁকাবাজ লোক সমাজকেই শুধু শুষে খাচ্ছে না—সমাজদেহে তারা দূষিত ক্ষতস্বরূপ। এদেরই কাহিনীর রসাত্মক পরিণতি এই নাটক। সমসাময়িক ঘটনাবলীর এমন জীবন্ত রূপ আধুনিক আরবী নাট্যসাহিত্যে একরূপ নজিরবিহীন বলা চলে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গীর চমৎকারিত্ব ঘটনাপ্রবাহকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, পাঠক ও দর্শক-মনে সহজেই তা আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ।

আবদুল আতি জালাল রচিত 'গুরুবুল আতলানতিস' (আটলাণ্টিকের পতন) একটি ঐতিহাসিক নাটক। 'যুদ্ধ-অভিশাপ না আশীর্বাদ?' এই নীতিবাক্যের ব্যাখ্যাই আশ্রয়লাভ করেছে 'গুরুবুল আতলানতিস' নাটকে। দ্বিতীয় মহাসময়ের ধাক্কা একটি দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সমাজ চেতনার কতটুকু ক্ষতিসাধন করেছিল এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তাদের কতটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তারই পূর্ণ রূপ আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু। আবদুল আতি জালাল একজন সমাজ-সচেতন লেখক; তাই তাঁর রচনায় স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেম এবং ঐতিহ্যপ্রীতি খুব প্রকট এবং 'গুরুবুল আতলানতিস' সেসবেরই আলোকে সমুজ্জ্বল।

কবি আহমদ শাওকী যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নাট্যজগতে আবির্ভূত হয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত কবি খলীল মোতরানকেও তাঁর উত্তর-সাধক বলা চলে। নাটকরচনার বিষয়বস্তুতে সামান্য পার্থক্য থাকলেও ভাষা ব্যবহারের

দিক দিয়ে খলীল মোতরান আহমদ শাওকীর অনুসারী। খলীল মোতরানও নাটকের ভাষায় কাব্যরীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী এবং এই প্রমাণ বিধৃত হয়ে আছে তাঁর 'তাজেরুল বান্দুকিয়াতা,' 'আতিল,' 'মুকাব্বাস হুম্মেলাত' প্রভৃতি নাটকে। তাঁর অধিকাংশ নাটকের বিষয়বস্তুই সমসাময়িক ঘটনা-বলীকে কেন্দ্র করে। তবে তাঁর বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ রচনাকে করেছে সার্বজনীন এবং কালোত্তীর্ণ। প্রসঙ্গতঃ তাঁর 'তাজেরুল বান্দুকিয়াতা' (বন্দুকের নায়ক) নাটকটির উল্লেখ করা যায়। একজন শিকারপ্রিয় ভবঘুরে শিকারীর জীবন-আলেখ্যই নাটকের বিষয়বস্তু। শিকারীর জীবনে দৈবাৎ এবং আকস্মিকভাবে আবির্ভূতা হয় এক রমণী এবং এই রমণীর প্রেমাশ্রিত জীবনেই নাটকের মূল সুর অনুরণিত।

খলীল মোতরান মূলত কবিতাই কাহিনী-নির্মাণে আবেগের অতিরেক থাকলেও চরিত্রচিত্রণে ভারসাম্য অবক্ষিত হয় নি। তাছাড়া গদ্যকবিতায় সংলাপ গঠনও আকর্ষণীয়।

মিশরের প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক এবং কবি মুহাম্মদ আবদুল গনি হাসানও নাট্যসাহিত্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার। তিনি তাঁর অধিকাংশ রচনায় ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু এবং শৌর্যবীর্যের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। 'ইবনে জায়দুন', ইমরুল কায়েস' এবং 'ক্লিওপেট্রা তাঁর ঐতিহাসিক নাটক।

ইসলাম পূর্ব-যুগের ইতিহাস-খ্যাত এবং আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েসের জীবনকাহিনীই 'ইমরুল কায়েস' নাটকের বিষয়বস্তু। মদ, মাংস এবং নারী—এ তিনের সমন্বয়ই ছিল ইমরুল কায়েসের কবিতার উপজীব্য। তা'ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল। অথচ একটিমাত্র সংঘাতে তিনি মদ, মাংস এবং নারী সংসর্গ পরিহার করতে বদ্ধপরিকর হন। সে সংঘাত তাঁর পিতৃহত্যার পরিশোধগ্রহণ। ভোগবিলাস প্রেম-সংঘাত ইত্যাদির বিশ্লেষণাত্মক দিক ছাড়াও 'ইমরুল কায়েস' নাটকে তৎকালীন আরবের যে সমাজচিত্র পরিস্ফুট তা নাট্যকার হাসানের কৃতিত্বের পরিচয়ই বহন করে। নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক 'দারাতে জুল জুলির' (জুল জুল পুকুর) স্নানের দৃশ্য। ইমরুল কায়েসের নিজের ভাষায় 'আলা রুব্বা মিনহুন্না কানা সালেহ, ওয়ালা সায়েমা বিদারাতে

জুলজুলি'—জীবনের অনেক কাহিনীই বিস্মৃত প্রায় কিন্তু দারাতে জুলজুলির দিন অবিস্মরণীয়। এই দৃশ্যে স্নানরতা রাজকুমারী উনায়জার বস্ত্রহরণ হিন্দু-উপাখ্যান খ্যাত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ইমরুল কায়েসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে, নাটকের এ দৃশ্যও আমাদেরও স্মৃতিপটে অটুট থাকবে।

মুহম্মদ আবদুল গনি হাসানের অপর একটি নাটক 'মিন নাফিজাতুল তারিখ' (ইতিহাসের পাতা থেকে)। এই নাটকটিও ঐতিহাসিক কাহিনী ভিত্তিক এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ও মহান পরিকল্পনা নিয়ে রচিত। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। এই বিরাট নাট্য-গ্রন্থে তিনি মানব-সমাজের বিভিন্ন স্তরের ইতিহাস ও বিবর্তনের নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাটকটি আকারে বৃহৎ এবং এতে চরিত্রসংখ্যাও প্রায় দুই শত। কাজেই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে নানা অসুবিধে। লেখকের উদ্দেশ্য নিজের বক্তব্য প্রকাশ করা, অতএব তিনি মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনার দিকে হয়ত মনোনিবেশ করেন নি

হাঙ্গেরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইমরে মাদাক রচিত 'ট্রাজেডী অব ম্যান' নাটকটির প্রভাব 'মিন নাফিজাতুত তারিখ'-এ স্পষ্ট। তথাপি লেখকের বক্তব্য কোথাও ফাঁক নেই। প্রত্যেকটি চরিত্রই লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্ট এবং সামাজিক জীবনের সব খুঁটিনাটি ঘটনাই চরিত্রগুলোতে তিনি ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

তরুণ কথাশিল্পী আবদুল্লাহ্ আবদুল জাব্বারও নাটক রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মনেপ্রাণে আধুনিক। কাজেই আধুনিক সভ্যতার অতি উগ্রতা তাঁর নাটকে আশ্রয়লাভ করেছে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে 'উম্মি' (আমার মা) এবং 'আল উমমু শাহতুত' (শাহতুতের মা) আধুনিক আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আধুনিক সভ্যতার অতি উগ্রতা বিশেষ করে নারীসমাজের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তারই পূর্ণ আলেখ্য তাঁর রচনায় বিদ্যমান। তাঁর দৃষ্টিতে 'আন্ নেসায়ুল মাজিয়াতা' (অতীতের রমণী) এবং 'আন্ নেসায়ুল আন্' (বর্তমানের রমণী) কোন পর্যায়ে ছিল এবং কোন্ পর্যায়ে

পৌঁছেছে তার রূপকধর্মী আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মন নাড়া দেয়। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী, প্রকাশের চমৎকারিত্ব এবং ভাষা ও সংলাপের মাধুর্য সত্যি আকর্যণীয়।

মুহম্মদ হাসান আল ওয়াসও আধুনিক আরবী নাট্যসাহিত্যে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। সবচেয়ে চিত্তাকর্যক একাঙ্ক নাটক 'আশ্ শায়াতিনুল খুরম যুগের শয়তান আশ্ শায়তিনুল খুরম' মুহম্মদ হাসান আল্-ওয়াসের বাস্তবধর্মী শিল্পকর্ম। ইতিপূর্বে আমরা আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্য এক প্রখ্যাত কবি আব্বাস মুহম্মদ আল-আক্কাদের 'শয়তান' শীর্যক কবিতার উল্লেখ করেছি। 'শয়তান' কবিতার মূল বক্তব্য : লাম্পট্য এবং কুকীর্তির বেড়াজালে যদি সবাই আবদ্ধ তবে শয়তান নিঃশেষ হয়ে গেছে, তার কাজ ফুরিয়ে গেছে। সমাজসচেতন লেখক মুহাম্মদ হাসান আল-ওয়াসও নাটকের মাধ্যমে একই বক্তব্য পেশ করেছেন। 'আশ শায়াতিনুল খুরম' নাটকের চরিত্রগুলোর অধিকাংশই প্রগতিবাদীদের প্রতীক। এছাড়া একটি চরিত্রে রয়েছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের রূপকধর্মী চিত্র। লেখকের শিল্প-চাতুর্যের মহিমায় প্রত্যেকটি চরিত্র এক-একটি বৈশিষ্ট্যময় টাইপে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি নাটকটিতে আধুনিক সমাজের পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার আশ্চর্য সুন্দর ব্যাখ্যাও স্থানলাভ করেছে। নাটকটির ভাষা ব্যবহারেও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আরবী 'সাজ' ছন্দে রচিত অর্থাৎ গদ্য-পদ্য উভয় রীতির সমন্বয়ে সংলাপগুলো স্বাদেও অতুলনীয় মনে হয়। মঞ্চ-চাহিদা মেটাতেও নাটকটি সক্ষম।

'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' কাহিনী অবলম্বনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনার পরিসর বিস্তৃত করেছেন। ডিকেন্স, টেনিসন, থ্যাকারে, মতোস্কির মতো বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিকরাও 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' কাহিনী প্রত্যক্ষভাবে কাজে খাটিয়েছেন। ইতিপূর্বে আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও ঔপন্যাসিক তাওফীক আল-হাকীমের 'শাহেরজাদ' নাটকটির উল্লেখও করা হয়েছে। তাছাড়া আল-আহদাব, আদিব ইসহাক, খলীল ইয়াজেজী, নাজীব হাদ্দাব প্রমুখ নাট্যকাররাও যে, 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' কাহিনী নাটক রচনার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কেও ইতিপূর্বে ইংগীত দেয়া হয়েছে। মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

মুহম্মদ আওয়াদ ইবরাহীমও একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক 'লায়লাতুস্ সানিয়াতা আশরাতা' (দ্বাদশ রাত্রি) 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা'-এর 'লায়লাতুস সানিয়াতা' (দ্বিতীয় রাত্রি) নামক গল্পের কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত। আলোচ্য নাটকের মূল বিষয়বস্তু প্রেম। এ কারণে চরিত্র-চিত্রণে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার রঙ আরোপিত হয়েছে অধিক মাত্রায়। তবুও চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত, সজীব। লেখকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, অতীতকে তিনি বেঁধে রেখেছেন আধুনিক যুগের মানস-সূত্র দিয়ে। তাছাড়া ট্রাডিশনের প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাতিত্বও লক্ষ্য করবার বিষয়।

আরবী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় নাট্যশাখাও বর্তমানে অগ্রগতির পথে। অনেক প্রগতিশীল লেখক ও কবি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন নাটক রচনায়। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সত্যি আরবী নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে।

আরবী লোকগীতি

আরবী সাহিত্যে লোক-গীতির ভূমিকা

লোক-গীতি থেকেই আরবী সাহিত্য উৎসারিত—এই উক্তিতে আশা করি কারও দ্বিমত থাকবার কথা নয়। কেননা, আরবী সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীনতম শাখা কবিতা যখন লিখিত রূপ পরিগ্রহ করেনি তখন কেবল লোক-গীতিই প্রচলিত ছিল, এবং সত্যি কথা বলতে কি লোক-গীতিই ছিল আরববাসীদের প্রাণ।

আরবী কবিতার প্রচীনতম ধারা হিদা, হিজা, রাজায ও কাসাস প্রভৃতি সবই লোক-গীতিকেন্দ্রিক বিভিন্ন সুরবিন্যাস। এ সম্পর্কে 'কাব্যসাহিত্য' শীর্ষক আলোচনায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এমন কি লোক-কাহিনীভিত্তিক গীতি-কবিতার প্রাচুর্যও তৎকালে ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর হাতিম আত্-তাঈ-এর পূর্ব পর্যন্ত আরবী সাহিত্যে কেবল লোক-গীতিরই সন্ধান পাওয়া যায় এবং হাতিম আত্-তাঈতে এসে আমরা আরবী কবিতাব লিখিত রূপের সন্ধান পাই।

আরবী লোক-গীতির প্রাণধারা সেই আবহমানকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমান গতিতেই বয়ে চলছে। পৃথিবীর সব দেশের লোক সাহিত্যের অন্যতম শাখা লোক-গীতির মত আরবী লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যময় শাখা লোক-গীতিও যে বিশেষ জনপ্রিয় সে বিষয়ে আশা করি সন্দেহের অবকাশ নেই।

আরববাসীদের সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লোক-গীতির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বেদুইন জীবনযাত্রার হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, আশা-নিরাশা ইত্যাদি লোক-গীতি আশ্রয় করেই অনুরণিত। উত্তপ্ত মরুভূমির বুকে কারাভাঁ-চালকের মুখের সুললিত সুরসন্নিবিষ্ট লোক-গীতি শুধু যাত্রীদেরই মনোরঞ্জন করে না, গীতির তালে তালে পা ফেলে উষ্ট্ররাজিও দূরের যাত্রায় পাড়ি জমায়।

ইসলাম পূর্ব যুগে লোক-গীতির মাধ্যমে যুদ্ধে জয়লাভ, এমন কি বিপক্ষীয় গোত্রকে পর্যুদস্ত করা হতো এরূপ নজির অনেক রয়েছে। তাছাড়া, লোক-গীতির আয়োজন করে গাভী দোহন করতে গেলে গাভী বেশী পরিমাণে দুধ দেয় এমন বিশ্বাসও আরববাসীদের মধ্যে রয়েছে।

রাসূলে করিমের জীবদ্দশায় আরবের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা 'দফ' বাজিয়ে লোক-গীতির মাধ্যমে রাসূল-আল্লার মনোরঞ্জন করতো এরূপ ঘটনাও বিরল নয়। এসব লোক-গীতিতে হাস্যরস ছাড়াও সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন। সাউদী আরবের বহুলপ্রচলিত একটি লোক-গীতিতে সে আভাস স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়:

একদা এক মুটে বলে রাসূল-আল্লার কাছে:
'বেহেশ্‌ত মাঝারে যে অট্টালিকা আছে
রাজমিস্ত্রী কি ছোঁয় নি তাহা কোন কালে।'

আমাদের প্রিয় নবী বলেন হেসে হেসে:
'যাও না ভাই তুমি সেথা তাহা ভালোবেসে।'

মুটে বলে নবীর ঠাঁই: দরজার অন্তরালে
অনেক বিশ্বাসী সে মনের আলো জ্বালে;
আমি যদি কভু সেথা দেখিতে পৌঁছে যাই
বলবে তারা এতদিন কোথা ছিলে ভাই?'

আরবী ভাষাভাষী সউদী আরব, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, সুদান, তিউনিস, ফেলিস্তিন, জর্দান, মরক্কো, আল-কোয়েত, লিবিয়া প্রভৃতি আরব রাজ্যগুলোর আনাচে-কানাচে অজস্র লোক-গীতি ছড়িয়ে রয়েছে। সে-সব সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়ে আরবী লোক-সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলপরিমাণে।

বর্তমানে লোক-সাহিত্য নিয়ে মার্কিন ও অন্যান্য দেশে গবেষণা ও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। আরবী কবি-সাহিত্যিকরাও এ ব্যাপারে পশ্চাৎপদ নন। এমন কি লোক-সাহিত্যের ভাষাও তারা

উন্নত সাহিত্যে স্থান দিয়ে সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করার প্রয়াস পাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে ইবরাহীম জাবরা, ইবরাহীম শোকরাল্লাহ্, সুহাইল ইদরীস, ইউসুফ ইদরীস, তাওফীক আল-হাকীম, ইবরাহীম নাজী, মিসাল তার-আদ প্রমুখ সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখ করা চলে। লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ তাঁদের রচনার উপজীব্য। লোক-সাহিত্যের উপকরণকে রচনার উপজীব্য করার ফলে আরবী সাহিত্যে এক নতুন ধারার সূচনা হয়েছে। এসব রচনার পাঠকবর্গ একদিকে যেমন নতুন রস আস্বাদনে সমর্থ হচেছ, অপরদিকে তেমনি লোক-সাহিত্যের রস আহরণেরও সুযোগলাভ করছে।

আরবী লোক-গীতিও অন্যান্য দেশের লোক-গীতির মতোই পল্লীবাসীর মুখে মুখে প্রচারলাভ করে আসছে। এসব গীতিকার রচয়িতার কোন হদিস আজ পর্যন্ত কেউ উদ্ধার করতে পারে নি। তবে আবহমানকাল থেকে পল্লীবাসীর মুখে মুখেই এসব প্রচারিত হয়ে আসছে এবং কেবল তাদের স্মৃতি-ভাণ্ডারেই লোক-গীতির অবস্থান। এ ধারা অনাদিকাল পর্যন্ত চলবে। কেননা, এ সবের জীবনীশক্তি ও চিরত্বগুণ এতই প্রবল যে, মানুষের মনোরঞ্জনে চিরকালই এগুলো সক্ষম হবে।

আরব রাজ্যগুলোর অনেক পল্লীগ্রামেই লোক-গীতির আসর বসে। বিবাহ ও আনন্দ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই সাধারণতঃ এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তা'ছাড়া গায়েন সম্প্রদায় লোক-গীতির দল গঠন করে বিভিন্ন স্থানে গান পরিবেশন করে অর্থোপার্জন করে এমন রীতিও বিরল নয়।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীত বা উচ্চতর সঙ্গীতের ন্যায় আরবী লোক-গীতির জন্যেও কোন উস্তাদের শরণাপন্ন হতে হয় না কিংবা দীর্ঘকাল সাধনায়ও লিপ্ত থাকতে হয় না। সমাজে যার কণ্ঠস্বর যত বেশী মধুর এবং স্মরণশক্তি প্রখর সেই ব্যক্তিই লোক-গীতির গায়েন বা পরিচালকের যোগ্য বলে বিবেচিত হন। রাগ-সঙ্গীতের ন্যায় বিভিন্ন সুর-সংযোজনের নিয়ম লোক-গীতিতে প্রচলিত নেই। একটিমাত্র সুরই এইসব লোক-গীতিতে অনুরণিত হয়। কাজেই সুর আয়ত্ত করতে গায়কদেরকে বেশী বেগ পেতে হয় না।

সুমিষ্ট সুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিই লোক-গীতির গায়ক হওয়ার যোগ্য, কিন্তু দোহার বা ধুয়া ধরবার অধিকার প্রায় সবারই থাকে। কারণ ধুয়া ধরতে সুমিষ্ট সুরের প্রয়োজন হয় না। এইজন্যেই দেখা যায়, পল্লীগীতির আসরে কমবেশী সবাই গায়ক। যে ধুয়া ধরতে পারে না কিংবা গান গাইতে পারে না সেও মনে মনে গানের সুর ভেঁজে মাথা নাড়িয়ে হাতে তালি বাজিয়ে সমর্থন জানায়।

লোক-গীতির প্রাণশক্তি এতই সজীব যে, এর সুর যাকে স্পর্শ করে তার প্রাণই সজীব হয়ে ওঠে। আরবী লোক-গীতি যে কতটা জনপ্রিয় কায়রো-বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত লোকগীতি গায়িকা উম্মে-কুলসুমের গান তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। কেননা, উম্মে-কুলসুমের গান শুরু হলে কয়েক মিনিটের জন্য কল-কারখানা, অফিস-আদালত ইত্যাদি অচল হয়ে পড়ে। এমনকি কৃষক তার লাঙ্গল থামিয়ে গানের সুরে সুরে মাথা নাড়ে, এ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল মিশরের আল-আকসাম পত্রিকায়। সমগ্র আরব-জগতের লোক উম্মে-কুলসুমের গানের ভক্ত এবং তাদের প্রধান লক্ষ্য 'আস-সাউতুল কাহেরায়' (কায়রো বেতার) উম্মে-কুলসুমের গানের প্রোগ্রাম আছে কি না।

আরবী লোক-গীতির একটিমাত্র সুর থাকলেও অঞ্চলভেদে সুরের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সউদী আরবের তায়েফ বা রিয়াদ অঞ্চলের সুরের সঙ্গে সুদানের খার্তুম অঞ্চলের পল্লীবাসী কর্তৃক গীত সুরের যেমন পার্থক্য দেখা যায়, তেমনি পার্থক্য ধরা পড়ে মিশরের আল-আমান অঞ্চলের সঙ্গে সিরিয়ার মাসকিনি অঞ্চলের। এই আঞ্চলিক বিভিন্নতা স্বীকার করে নিলেও এসব লোক-গীতিকায় যে একই সুরের রাজত্ব তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আরবী লোক-গীতিকায়ও কথার চেয়ে সুরেরই প্রাধান্য। গীতিকা-গুলোর কথার অর্থ উদ্ঘাটন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় কিন্তু সুরপ্রধান বলে সমাজ-মন এতেই তৃপ্ত। এসব গীতিকার ভাষা জীবন্ত। কেননা, শব্দসম্ভার এমনভাবে গ্রথিত যে, পড়তে গেলে ধ্বনি ও সুরে এমন তালের সৃষ্টি করে যাতে মানব-মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হতে বাধ্য। তবে

গীতিকাগুলো প্রত্যেক অঞ্চলেরই নিজস্ব ভাষায় রচিত যে জন্যে নিজ নিজ এলাকা ছাড়া এই সব গীতিকায় অর্থ অনেক সময় বোধগম্য হওয়া কষ্টসাধ্য।

লিখিত ভাষা ও আঞ্চলিক কথ্যভাষার তফাৎ শুধু আজকের নয়। সকল দেশে সকল কালে এ প্রভেদ চলে আসছে। কোনো বিদেশী আরবী অভিজ্ঞ লোক লেবাননের সুদূর পল্লী অঞ্চলর আল-হারমিল গ্রামে উপস্থিত হলে কোন গ্রাম্যলোক যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করে 'মিসমুক' তখন সেই ভদ্রলোকের হা'করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

'মিসমুক' যে 'মা এসমুকা' (আপনার নাম কি?) এর আঞ্চলিক কথ্য ব্যবহার এটা জানা না থাকলে হা'করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে অনেক সাহিত্যিকই লোক-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন এবং লোক-সাহিত্যের অনেক উপকরণ উচ্চতর সাহিত্যে স্থান দিয়ে আরবী সাহিত্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ আনয়ন করতে প্রয়াস পাচেছন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মিশরের মোহাম্মদ তাইমুর, ওসমান জালাল, আনতুন ইয়াজবাক প্রমুখ নাট্যকার যখন নাটকের ভাষার সংলাপে আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহার শুরু করলেন তখন আরবী সাহিত্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি হলো। শুধু আলোড়ন নয়—জনসাধারণও তাতে সায় দিলো। কবিরাও এগিয়ে আসলেন এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

লেবাননের প্রখ্যাত কবি মিসাল তার-আদ লোকগীতির আঙ্গিক, এমনকি শব্দব্যবহার রীতিকে হুবহু অনুকরণ করে কাব্য-সাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। নমুনা হিসেবে এখানে মিসাল তার-আদ রচিত এবং লেবাননের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত দু'টি লোকগীতির অনুবাদ উল্লেখ করছি:

১. ও বাড়ীর মেয়েটা কেবল
আমাকে পাবার জন্যে প্রার্থনার জল
দুই চোখে আনে।

তাকে তুমি বলো:
কি যে এক মোহময় টানে

সে যে তার স্বর্গ বিকিয়েছে
সামান্য লাভের প্রত্যাশায়।
এখানে দুয়ারে শুধু
শোকাচ্ছন্ন সুর মুরছায়।

সব তার গেছে
অযথা চোখের ছলোছলো।

২. মেয়েটার নীলাভ 'দু'চোখে
প্রতিজ্ঞার স্বীকারোক্তি জ্বালে;
বসন্ত বাগান জুড়ে বহু বিচরণ
অবশেষে একাকিনী মন
মুখর উন্মুখে
হঠাৎ কুড়াতে গিয়ে ফুটন্ত গোলাব
দশটি আঙুল তার হারালো নিজেই
গোলপের পাতার আড়ালে।

গীতিকাগুলোর ব্যবহারিক মূল্য ছাড়াও সাহিত্যিক মূল্য অত্যধিক। শুধু বর্ণনায় নয় ভাবের দিক দিয়েও গীতিকাগুলো অর্থবহ, এবং এ-সবের অন্তর্নিহিত আবেদন স্বভাবতঃই আমাদেরকে বিমোহিত করে।

বাংলা লোক-গীতির মতো আরবী লোক-গীতিগুলোও ব্যবহারিক জীবনের বিশেষ প্রয়োজনে এবং উপলক্ষে গীত হয়। এমনকি কোন কোন গীতিকার গীতি-নিয়মের সঙ্গে আদিম মানবমনের সংস্কারবদ্ধ ধারণাও সম্পৃক্ত। যেমন বিয়ের গানে কোন পুরুষ গায়কের অংশ গ্রহণ করবার অধিকার থাকে না। এ কারণেই দেখা যায় সিরিয়ার পল্লী অঞ্চলে বিয়ের গানের অনুষ্ঠানে সুকণ্ঠী নারী গায়িকার অভাব ঘটলে পুরুষগণ নারীর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে নারী সেজে গান পরিবেশ। করে। তা'ছাড়া বৃদ্ধের মুখে প্রেমের গান, বিধবার কণ্ঠে বিয়ের গান প্রায়ই শোনা যায় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিশরের পল্লী অঞ্চলের বিবাহ উৎসবের উলুধ্বনিও গীতিকার পর্যায়ভুক্ত। কেননা এসবের মধ্যেও একটি বিশেষ সুর অনুরণিত।

এই ওলুধবনিও মেয়েদের নিজস্ব ব্যাপার। কোনো পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশের হিন্দু-সমাজের বিয়েতে মেয়েদের ওলুধ্বনি মিশরীয়দেরই প্রভাব কিনা সেটাও অবশ্যি গবেষণাসাপেক্ষ।

আরবী লোকগীতিতেও সমাজের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র পরিস্ফুট। কোথাও প্রেমিকাকে না পেয়ে প্রেমিকের হতাশার অন্ত নেই; আবার কোথাও প্রেমিক-প্রেমিকার মান-অভিমানের চিত্রও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। নিম্নোদ্ধৃত আরবী লোকগীতিটির অনুবাদে বিরহীর আক্ষেপের করুণ চিত্র রূপকের মাধ্যমে কিভাবে অঙ্কন করা হয়েছে তা লক্ষ্য করবার মতো:

হে চক্ষু, অমন করে কেঁদো না, কেঁদো না তুমি আর।
যদি বা ঝরাও পানি সর্বক্ষণ, দুচোখ শুকিয়ে যাবে আহা!

এবং হারাবে তুমি দৃষ্টিশক্তি, সবাই হাসবে কৌতুহলে,
হে চক্ষু, অমন করে কেঁদো না, কেঁদো না তুমি আর।

চক্ষু এই উপদেশ-বাণী শুনতে রাজী নয়। তার মনের জ্বালা উপদেশ-বাণীর চেয়েও প্রবল। তাই কোনকিছুই যেন তাকে সান্ত্বনা দিতে অসমর্থ। চক্ষু এবার নিজের আক্ষেপ ব্যক্ত করে:

আমাকে কাঁদতে দাও, আমাকে কাঁদতে দাও!
আমি তো কাঁদি না কোনো লোভনীয় সম্পদের মোহে;
এবং কাঁদি না আমি যে পৃথিবী ছেড়ে গেছে মোরে
তাকে মনে করে।

আমি তো কেবলি কাঁদি আমার প্রিয়কে মনে করে,
যাকে আমি কাছে পেলে ভুলে যাই সকল যাতনা,
কোথা দিয়ে দুঃখ যায় কিছুই জানিনা আর আমি।

উপর্যুক্ত ধরনের গীতিকাসমূহ গাওয়া হয় প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে। দুইদল অনুরূপ গীতি পরিবেশনে অংশ গ্রহণ করে। এক দল প্রশ্ন করে, অপর দল উত্তর দেয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গীতি পরিবেশনের রীতি শুধু আরব রাজ্যগুলোতে কেন, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর

অন্যান্য অঞ্চলেও রয়েছে। বাংলাদেশের কবির মুখনিঃসৃত গান 'নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ, জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত' সকল দেশের সকল মানুষের সাথে সমানভাবেই প্রযোজ্য।

কোন কোন আরবী লোক-গীতিতে আবেগধর্মিতার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। এই আবেগ সাধারণতঃ ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকার আর্তিতে। 'যাকে ভালবাসা যায় তার হাতে মৃত্যুও শ্রেয়' এই ধরনের আবেগপ্রবর্ণতা অনেক আরবী লোক-গীতির বিষয়বস্তু। যে প্রেমিক বা প্রেমিকা একে অপরকে চিরদিন ঠকিয়েছে, প্রবঞ্চনা করেছে অথচ প্রেমের এমনই লৌহচুম্বক আকর্ষণ যে, তারা উভয়েই পরস্পরের জন্য ব্যাকুল। একজনের হাতে অপরের মৃত্যু হোক তাতেও তাদের আপত্তির কারণ নেই। আরবী সাহিত্যে এসব অভিনব ঘটনা নয়। 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' মূলকাহিনীই তাই। মৃত্যু জেনেও কেন হাজার হাজার রাজকন্যাকে তুলে দিতেন তাদের বাবা-মা রাজকুমারের হাতে? যাহোক, মিশরের বহুল প্রচলিত নিম্নোদ্ধৃত লোক-গীতিকাটিতে ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকার ভাবপ্রবণতার মূর্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়:

তোমার জন্যে সাগরে অপেক্ষা করলাম,
তুমি আমাকে ডাঙায় ত্যাগ করে গেলে।

তোমাকে আমি সোনার মূল্যেও বিক্রী করি নি,
তুমি আমাকে খড়-কুটোর মূল্যে বিক্রী করে গেলে।

আমি ছিলাম বাগানের ফুটন্ত গোলাব
তুমি তা সমূলে বিনাশ করে গেলে।

আমি ছিলাম ঘরের জ্বলন্ত মোমবাতি
তুমি তার শীষ কেটে দিয়ে গেলে।

আমি যদি তোমার কাছে ফিরে যাই
তুমি আমাকে বিষের পিয়ালা দিও,
তোমার হাতের সেই পিয়ালা আমি
এক চুমুকে খাবো।
তুমি আমাকে বিষের পিয়ালা দিও।

প্রায় একই ধরনের আবেগপ্রবণতা সউদী আরবের একটি লোক-গীতিতে লক্ষ্য করা যায়। উপর্যুক্ত মিশরের গীতিকাটিতে প্রেমিকা বিষের পিয়ালা প্রার্থনা করছে প্রেমিকের হাতে আর সউদী আরবের গীতিকাটিতে প্রেমিক হাজার যাতনা-যন্ত্রণা ভোগ করেও শেষ পর্যন্ত তার প্রেমিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ প্রশংসা কি সুখের না দুঃখের সেটা অবশ্যি ভাববার বিষয়।

জয়নব, তুমি আমাকে পাগল করেছো।
জয়নব, তুমি আমার রোগের কারণ।

জয়নব, তুমি কতই না যাদু জানো,
জয়নব, বনের পাখী তোমার কাছে ছুটে আসে।
জয়নব, তুমি কতই না যাদু জানো।

রোগের দুঃসহ যাতনায় আমি ছটফট করছি।
অথচ ডাক্তার রোগ ধরতে পারে না।

আমার আত্মা-পাখী খাচা-ছাড়া হওয়ার আগে
জয়নব, তোমাকে স্মরণ করছি।

জয়নব, আজকে বুঝতে পেরেছি—
জয়নব, তুমি সত্যি বিদুষী অন্ততঃ আমার কাছে!

অধিকাংশ আরবী লোক-গীতিই প্রেমাশ্রিত। এই প্রেম কোথায়ও স্পষ্ট কোথায়ও বা জটিলতার কুয়াশায়-আচ্ছন্ন। এ সত্ত্বেও গীতিকাগুলো যে প্রেমেরই পরিচয় বহন করে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তা'ছাড়া এসবে আরব-জগতের সমাজ-চিত্রও পরিস্ফুট। মিশরের বহুলপ্রচলিত নিম্নোদ্ধৃত গীতিকাটিতে প্রেম ছাড়াও নৃশংসতার স্ফুরণ লক্ষ্য করবার মতো:

হে শায়িখ কন্যা,
তোমার খোঁপায় কী সুন্দর রেশমী সুতো জড়ানো।
তুমি তো রূপের আধার।

তোমার বাবা কি নির্বোধ।
কেন তোমাকে একা পাঠিয়েছেন জলের ঘাটে।

এখন আমি কি করি? আমি কি করি?
আমার এই দামী গাড়ীটা
কসাইয়ের কাটা মাংসের নৃশংসতার সাথে
নির্বিঘ্নে বদল করতে পারি।

শিখতে পারি কসাইয়ের নির্দয় রীতি—
তখন তোমার বাবাকে ... ...

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সব আরবী লোক-গীতির অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তথাপি চটুল চটুল শব্দ এবং সুরের ঝংকার আমাদেরকে বিমোহিত করে। নিম্নোদ্ধৃত গীতিকাটিতে প্রেম প্রচ্ছন্ন থাকলেও জীবন-যন্ত্রণার মূর্ত স্বাক্ষর বর্তমান:

সাতটি জলের কল কাঁদলো
সাতটি জলের কল কাঁদলো;
আমার প্রেম আমাকে
সেই সব কলের খবর দিয়ে গেলো।

আগুন বেড়েই চললো
আগুন বেড়েই চললো
আমার প্রেম আমাকে
সেই সব আগুনের খবর দিয়ে গেলো।

আগুন আর নিভল না
আমার দু'চোখ আগুন
আমার হাড়গুলো আগুনের লৌহ-শলা
আগুন আর নিভল না।

ঢেউ আমার ঘর
সমুদ্রতট আমার বিছানা

সাতটি জলের কলস কাঁদলো
আগুন বেড়েই চললো
আগুন আর নিভলো না।

উপরোক্ত গীতিসমূহ ছাড়াও শোক-গীতি (মর্সিয়া), বিরহ-গীতি, ভাবসঙ্গীত ইত্যাদি আরবী লোক-সাহিত্যের অঙ্গবিশেষ। পালা-গানের প্রচলনও কোথাও কোথাও দেখা যায়। কাহিনী কে কেন্দ্র করে গল্প বলার সময় মাঝে মাঝে লোক-গীতির প্রয়োগে শ্রোতৃবর্গের বিমুগ্ধ করবার রীতিও আরবী লোক-সাহিত্যে প্রচুর রয়েছে। ভূত-প্রেত, ডাইন-ডাইনী প্রভৃতি অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেও লোক-গীতির আশ্রয় নেয়া হয় এরূপ নজিরও বিরল নয়। এসব ক্ষেত্রে গীতিতে মন্ত্রের সুর পুরোপুরি থাকলেও গীতিকার আমেজই অধিকপরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এসব গীতিকায় জীবনের কোন জটিল সমস্যার কিংবা লোক-জিজ্ঞাসার বিকাশ অনুপস্থিত কিন্তু জীবনের প্রত্যক্ষতা ও স্বাভাবিকতা রয়েছে। গীতিতে রূপক ব্যবহার রীতি সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য না হলেও সমাজভুক্ত প্রত্যক্যের কাছেই তার নিগূঢ় অর্থ ধরা পড়ে।

আরবী লোক-গীতি সাধারণতঃ আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ভাব এবং তাৎপর্য সেই ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডি অতিক্রম করে আমাদের দীর্ঘ চিন্তার রাজ্যে নিয়ে যায়। এবং গীতিকাগুলোর মাহাত্ম্যই এইখানে।

আধুনিক জীবন-চৈতন্যও আরবী লোক-গীতিতে ব্যাপ্ত। বিজ্ঞানের প্রসার এবং প্রচার এবং আরাম-আয়াসকেন্দ্রিক লোকগীতির সন্ধানও আরবী লোক-সাহিত্যে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে লেবাননের বহুল প্রচারিত 'টেলিগ্রাফের তার এবং স্ফীত রেলগাড়ী' শীর্ষক গীতিটির উল্লেখ করা যায়। এটি দীর্ঘ হলেও পুনরুক্তিজনিত মাত্র, বিষয়জনিত নয়। এখানে গীতিকাটির কিছু অংশের অনুবাদ দেয়া হলো:

প্রথমে প্রশংসা করি মহান আল্লার,
দুঃখ-খাওয়া জাত মোরা জানা আছে তাঁর।
পরে যে প্রশংসা করি আল্লার নবীকে
যাঁর আলো ফুটে আছে এই চারদিকে।

১৪—

পাহাড় পর্বত নদী সে আলোয় হাসে,
নবীর নূরানী আলো দেখি চারপাশে।
এবারে শুনুন সবে দিয়ে মন-প্রাণ
আশ্চর্য কাহিনী আমি করবো বয়ান।

মস্তিষ্কের বুদ্ধি খোলে সে কাহিনী শুনে,
অন্তরে চিন্তার বীজ সে কাহিনী বোনে।
'টেলিগ্রাফ-তার আর স্ফীত রেলগাড়ী'
আশ্চর্য কাহিনী শুনে মন হবে ভারী।
আল্লার শরণ চাই, যাঁর কৃপা বলে
অমাবস্যা তকু যেন এ কাহিনী চলে।

আশ্চর্য লোহার চীজ দেখি যে এখন,
ভিতরে লোকের ভিড় খোঁয়াড়ে যেমন।
বুকেতে আগুন তার চোখে অগ্নি-জ্বলে,
সাপের মতন সে এঁকে বেঁকে চলে।
এমন আশ্চর্য চীজ দেখে খোলে 'ব্রেন'
শুনুন নামটি তার জ্যান্ত স্ফীত ট্রেন।
পাশে পাশে আছে তার 'টেলিগ্রাফ-তার'
প্রতিশব্দ অভিধানে নাই যে আমার।

চার'শ চল্লিশ দিন চললো লড়াই,
অতঃপর টেলিগ্রাফ তার এলো ভাই।
অভিশাপ যায় নি ক তবু একেবারে,
পাখীরা কেমন মরে টেলিগ্রাফ তারে।
ট্রেনের গার্ড যে বলে: দ্যাখো, সাবধান;
যদি বা না দাও এই আমার সম্মান
হাড় গুঁড়ো করে দেবো। চোখের পলকে
কেমন আসছে ধেয়ে সাপ লকলকে।

ট্রেন বলে: 'লাল চক্ষু গাধার মতন
আমি চলি, পিঠে মোর বোঝা অগণন।

অন্ধজন সেও বোঝে আমার এ গতি,
ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দে মোর নেই কোন ক্ষতি।
গাছ্ বৃক্ষ আশে পাশে থর থর কাঁপে,
রাজার প্রাসাদ সেও শক্তি মোর মাপে,
আমার সম্মুখে আসা সনাতন পাপ,
চোখের পলক মাত্র হয়ে যাবে সাফ।

নড়বড়ে চারপায়া কাঁপে থর থর,
যদি কেউ বসে তাতে আছে ভয়-ডর।
আমাতে চড়লে কেউ পড়ে না কখনো
যদিও ঝাঁকানি দেব, ভয় নেই কোনো।
যখন চলন্ত গতি ফিরে না তাকাই
যদিও হাজার টাকা দেয় কোনো ভাই।'

টেলিগ্রাফ তার বলে: 'পণ্ডিত প্রবর,
নিশ্চয় রাখেন সবে আমার খবর।
মুহূর্তে কোথায় যাই দেশ-দেশান্তরে,
মিনিটে কুশল বার্তা পৌঁছে দিই ঘরে।
ঘোড়ার দুরন্ত গতি মানে পরাজয়,
ট্রেন সে তো কোন্ ছার। জানবে নিশ্চয়।

ট্রেনের কয়লা গেলে গাভীর মতন,
কেমন থাকে যে পড়ে যেন অচেতন।
আমিই তখন তার বার্তা নিই বয়ে,
সাহায্য তখনি আসে দু'শ শক্তি হয়ে।
ট্রেন সে বিকল হলে সকলের আগে,
সাহায্যে এগিয়ে যাই আমি পুরোভাগে।

গীতিকাটি সুদীর্ঘ। টেলিগ্রাফের তার এবং রেলগাড়ী পরস্পর ঝগড়ার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করছে। এতে বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞানের অবদানে কতটুকু উপকৃত হচেছ সে ইঙ্গীতও পাওয়া যায়। এর রচয়িতার কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও এতে যে কাব্যগুণ রয়েছে তাতে সেই অজ্ঞাত কবির শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করতে হয়।

কিছু কিছু আরবী লোক-গীতিতে ছড়ার আমেজ বর্তমান। চটুল শব্দসমন্বয়ে এবং মধুর সুরের মাধুর্যে গীতিকাগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু অর্থের সঙ্গতি তাতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সউদী আরবে প্রচলিত অনুরূপ একটি গীতিকার অনুবাদ পেশ করছি :

এখানে কাচি ওখানে কাচি
কাচি কাচি কাচির পাহাড়
হেজাজ থেকে আসল মেয়ে
মেষের পশম চুলে যে তার।

চুল গুঁজেছে চুল গুঁজেছে
কোথায় গুঁজেছে ?
আস্তাবলে ঘোট্‌কী দিল
তার সে মাথাতে।

ঘোটকী কোথায় ? ঘোট্‌কী কোথায় ?
আস্তাবলে।
মই আনো, মই আনো
যাবো চলে।

মই রয়েছে সুতোর বাড়ী
সুতোর চায় লৌহ-শলা
লৌহ-শলা কামার বাড়ী
কামার চায় ডিম এক হালি
ডিম রয়েছে মুরগীর পেটে
মুরগী চায় শস্য-কণা
শস্য-কণা সদাগর বাড়ী
সদাগর চায় নগদ টাকা
নগদ টাকা বকসীর কাছে
বকসী চায় মেহেদির পাতা

মেহেদির পাতা রাঙায় হাত
ফোঁড়ায় ঢাকছে চোখের পাত।

আরবী লোক-সাহিত্য যে লোক-গীতি-সমৃদ্ধ তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। মিশরের প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এবং কবি ডক্টর ইবরাহীম নাজী তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ 'লায়ালিল কাহিরা' (কায়রোর রাত্রি)-এর 'শুববাক' (জানালা) শীর্ষক কবিতায় উল্লেখ করেছেন: 'কবিতা আমার কাছে জানালাস্বরূপ। এই জানালা দিয়ে আমি জীবনের ছবি দেখতে পাই।'

লোক-সাহিত্যের উল্লেখে অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনতে পাই প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক আহমদ আবদুল গাফূর আল-আত্তারের কণ্ঠে। তিনি বলেন: 'আরবী লোক-সাহিত্য পাহাড়ী ঝরণাসদৃশ। এতে গ্রাম্য সমাজ-জীবনের মুখচ্ছবি পরিদৃষ্ট হয়----------এবং 'নাশিদুল কোরা' (লোক-গীতি) গ্রাম্য-জীবনের অন্তরনিঃসৃত রস, যে রসে অবগাহন করে আমরা পরিতৃপ্ত হই।-------''

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আরব রাজ্যগুলোতেও লোক-গীতি বা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উপর বর্তমানে গবেষণামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। লোক-গীতির সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে আরবী সাহিত্যিকদের তৎপরতা লক্ষ্য করবার মতো। লোক-সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসারে এ প্রচেষ্টা নতুন আশার সঞ্চার করবে, সন্দেহ নেই।

গ্রন্থপঞ্জী

Arberry, A. J. : *Modern Arabic Poetry*, Taylor's Foreign Press, London, 1950

Gibb, H. A. R. : *Arabic Literature*, London, Oxford University Press, 1926.

Lyall, Sir C. J. : *Some Aspects of Ancient Arabic Poetry*, H. Milford, London, 1918.

Nazibullah, Dr : *Islamic Literature*, New York, 1963.

Nicholson, R. A. : *A Literary History of the Arabs*, Cambridge University Press, 1930.

আবদুল হামিদ, মুহম্মদ মহীউদ্দীন : 'আল্ উমদাতাল আদাব,' বৈরুত, লেবানন, ১৯৫৯
'মাগানি উল লাবীব,' বৈরুত, লেবানন, ১৯৬১

আবদুর রাজ্জাক হামিদাহ, ডক্টর : 'শায়াতিনুশ্ শোয়ারা,' জোয়াহাইর বা' আল-বাকী, লেবানন, ১৯৫৯

আবি ইসহাক কিরওয়ানী : 'জাহর-উল-আদাব,' মাক্তাবাতাল মা'রেফ, বৈরুত, ১৯৬৫.

আহমদ মুহম্মদ আল হাওফী, ডক্টর : 'আল হায়াতুল আরাবিয়্যাতা মিনাল শে'রেল জাহেলী,' আল্ কাহেরা, ১৯৫৩.

আবদুহ ইসমাইল আত্ তাহ্তাবী: 'কাসাম মিনাল শারক ওয়াল গারব,' আল-কাহেরা, ১৯৬৭.

আলী আবদুল ওয়াহেদ ওয়াফী, ডক্টর: 'ফেকহুল লুগাত,' আল-কাহেরা, ১৯৬৭.

আধুনিক আরবী গ্রন্থাবলী

[আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এক বছরে একই বইয়ের কয়েকটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এমন নজিরও বিরল নয়। উদাহরণস্বরূপ ডক্টর তাহা হোসাইনের 'আল আইয়্যাম'-এর নাম করা যায়। একই বছরে এর দশটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়।

একমাত্র লেবাননের 'মাকতাবাতাল মা' আরেফ,' 'দার উল-আন্দালুস,' 'মাকতাবাতাল তুজ্জারী,' 'জোহাইর বা'আল বাক্কী' প্রভৃতি পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ বছরে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কয়েক হাজার। এখানে বাংলা-ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার গত কয়েক বছরে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কিছুসংখ্যক পুস্তকের নামের তালিকা প্রদত্ত হলো।]

কাব্য-সাহিত্য

আবদুর রহমান আল্-বারকুকী

দীওয়ান আল্-মুতানববী (সম্পাদিত);

[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল হামিদ বাকদাশ

আল্-হান আল্-আজারী;

[মাকতাবাতাল তুজ্জারী বৈরুত, লেবানন।]

আবুল কাশেম শাবী
আগানীল হায়াত;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবুল কাশেম মুহাম্মদ আল্-কারো
কাফাহ্ ওয়া হুববু,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবি ইবাদাতুল বুহতারী
আল-হামাসা, সম্পাদিত;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আজীজ আবাজা
আনাতু হায়েরাত,
আওরাকুল খারীফ,
গুরুবুল আন্দালুস এবং
ইল্লাল হায়াত;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আল-ফায়তুরী
আগানী আফরিয়্যাকা,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত লেবানন];
মেনদিলুন আবিয়াজ,
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

আল-হাসান ইবন হানী
দীওয়ান আবু ন'বুাস (সম্পাদিত);
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত লেবানন।]

আল-বুসতানী
রুবাইয়্যাত আল্-খায়্যাম, (অনূদিত);
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আলী আর্-রাকায়য়ী
আল্-খীনুজ জামিআ,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আলী বিন হাদিয়াহ
ওহি উল্-খারিফ,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আলী শাহাতা
নুজুম ওয়া রুজুম,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আলী সা'দ, ডক্টর
মিন শের নাজিম হিকমত (অনূদিত) ;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আতেফ কারাম
মিন হাওয়ানা,
[দার-উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ আস্-সাফী আন্ নাজফী
শারার,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবান]

আল-আগুয়ার,
[দার-উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ মহম্মদ আল-হাওফী
আল-গাজাল ফিল আসরে আল-জাহেলী ;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ মহম্মদ জামাল
আত তালায়েয়ু,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ রামী
দীওয়ান রামী, রুবাইয়্যাত আল-খাইয়্যাম (অনূদিত),
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ শাওকী
আস্‌-ওয়াকুজ্‌ জাহাব, আশ্‌-শাওকিয়াত ;
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ শাবীদ
বাবলু নেরুদা (অনূদিত) ;
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

ইদনান আস্‌-আদ
খামরু ওয়া জামরু,
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

ইদরীস মহম্মদ জামাল
লেহজাতু বাকিয়াত ;
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

ইবন ওয়ালেস আল-হামোবী
তাজরিদুল আগানী,
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

ইবরাহীম নাজী, ডক্টর
লায়ালিল কাহিরা,
[আশরাকাতাল আরাবিয়্যাতা আল্‌-কাহেরা, মিসর।]

ইলিয়াস আবু শাবকাহ্‌
আও সুককার ওয়া ইয়ালেদ,
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আফায়ীল ফেরদাউস,
নেদায়ুল কুলুব, ইল্লাল হান,
ইলাল আবেদ ;
[দার-উল-মাকশেফ বৈরুত, লেবানন।]

ওমর আবু-সায়িদীল গারিবী
আল্ কুয়ুদ,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

ওমর দাসোকী
আন নাবেগাতুজ জুবিয়ানী (সম্পাদিত),
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

করাম আল-বুসতানী
দীওয়ান ইবন হানী,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

খলীল মাৎরান
দীওয়ান আল্-খলীল,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত লেবানন।]

আত-তোফাত,
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

জাকী মুবারক
দীওয়ান অল্-হান আল খুলুদ, (সম্পাদিত)
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

জামিলা আল্-লায়লী
ইলা ইবনাতি,
মিন ওয়াহিউল ফজর ;
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, আল্-কাহেরা, মিশর।]

জালিলা রীদা
আল্ লাহনাতুত্ তাসের,
আল-সাহনুল বাকী ;
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, আল-কাহেরা, মিসর।]

জীবরান খলীল জীরান
রুম্‌মান ওয়া জাবেদ,
আন্-নাবী,
আরায়েসেন মুরুজ,
ইয়াসূয়্‌ ইব্‌ন আল্-ইনসান,
আল্-মু'আকেব,
আল্-আরোয়াহ্ আল্ মুতাম্মারদ ;
[দার উল-আন্দালুস, বৈরুত, লেবানন।]

নাজিক আল্-মালাইকাহ
কারারাতাল মাওজাতা,
ওয়াজাদতাহা,
লায়লাতু ফিল কারি য়াত ;
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

নাদিম মাহমুদ
ফেরাশাতা ওয়া আনাবেক ;
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

ফাদওয়া তাউকান
ওয়াজাদতাহা,
লা'নাতাজ জামান ;
[আশরাকাতাল আরাবিয়্যাতা, আল কাহেরা, মিশর।]

বুতরুস আল-বুসতানী
দীওয়ান জামিল বুসিনাতা,
আশ-শুয়ারাউল ফেরসান ;
[দার উল মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ আলী আল্-হুমানী
হাওয়াউল মুলহামাত,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ আবদুল গনি হাসান
আশ-শের উল আরাবী ফিস মুঅহার,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, লেবানন।]

মাজা মিনাল আমর,
মিন নাবউল হায়াত,
মিন ওরাহুল আফাক ;
[দার-উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ আবদুল আজীজ আল কাফরানী
আশ-শেরুল আরাবী বায়নাল জমদাকুন নাতুর,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ আস্-সাবায়ী
রুবাইয়্যাত আল-খাইয়্যাম (অনূদিত) ;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ আহম্মদ আলভী
ইবারুশ্ শের,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ ইউসুফ নাজম, ডক্টর
দীওয়ান জামিল সিদকী আল জাহাবী, (সম্পাদিত) ;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ কামেল ফরিদ
দীওয়ান আবু নু'ৱাস (সম্পাদিত) ;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ কুরদ আলী
শের মির্নাস মুজহার ;
[মাকবাতাল মা' আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ মহীউদ্দীন আবদুল হামিদ
সারহে দীওয়ান উমর বিন আবি রাবিয়াহ্ ;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ মুসতাফা আল-বাদুবী, ডক্টর
রাসায়েল মিন লনদন ;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ মুসতাফা হাদরোহ্
সারকাতে আবু নু'বাস ;
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

মহম্মদ সায়ীদ মুসলিম
শাফাকাল আহলাম,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মহী উদ্দীন ফারেস
আত-তীন ওয়াল আজাফের ;
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

মা'রুফ আর-রুসাফী
দীওয়ান আর-রুসাফী ;
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

মিখাইল নাঈমা
কারাম আ'লা দারব
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

মিশাল বাশির
গুরুব,
[দার উল-মোকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

মুসতাফা আব্দুল লতীফ আস্ সাহবাতী, ডক্টর
শের-উল্-ইয়াওমা,
[দার-উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

সালাহ লাবকী
ওহী-উল-খারীফ ;
[আশরাকাতাল আরাবিয়্যাতা, আল্-কাহেরা, মিশর।]

সালীম হায়দার, ডক্টর
আফাক
[দার-উল্-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

সালেহ জোয়াদাতা
লায়ালিল হারাম ;
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

সোসায়মান আল্-ইসা
কাসায়েদুল আরাবিয়্যাতা ;
[দার উল মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

হাসান ইসমাইল
আয়নসার মা'ফারর, হাকাজা ওগানী ;
[আশরাকাতাল আরাবিয়্যাতা, আল-কাহেরা, মিশর।]

শাওকী বাগদাদী
আনা আহলামু,
[আশরাকাতাল আরাবিয়্যাতা, আল-কাহেরা, মিসর।]

প্রবন্ধ ও গবেষণা

আবদুর রহমান আল-জাজিরী
কিতাবুল ফেকাহু আলাল মুজাহেবুল আর বা'আত,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুর রহমান আদ-দাবা আ
আল-আনাবিশ,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুর রহমান আর-রাফায়ী, বেগ
মুসতাফা কামাল বায়েগা আল হারকাতাল ওয়াতিনাতা,
[মাকতাবাতাল মা' আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুর রহমান বাদুবী
আল-আফলাতুনিয়াতুল মুহাদ্দেসাতা ইনফাল আরাব,
আল- বুরহানু মিন কিতাবিল সানায়ূ,
আল-হিকমাতুল খালেদাতা, আরসেতু ইনদাল আরাব,
মুনতেকে আবসেতু.
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুর রাজ্জাক নাওফেল
আল্লাহ ওয়া ইলমুল হাদিস
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুর রহমান বিন খালদুন
আত-তা'রিফ বে ইবন খালদুন
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল আজীজ ইজ্জাত
সাওরাতিল তাহবির ওয়া আসলাহা আল ইজ্তামায়ী
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল আজীজ আতিয়াহ
আল আকিদাতুল ইসলামিয়্যাতা ফিল মা'রাত,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল আ'জীম আবদুস্ সালাম শারফ
ইবন কায়্যেম আল জাওজিয়াতা আসরিহী ওয়া মুনহাজেহী

ওয়া আরাহু ফিল ফিক্‌হে ওয়ান নুসূফ ওয়াল আকায়েদ,
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত লেবানন।]

আবদুল আজীজ তাওফীক জাবিদ
হাজারাতুল ইসলাম,
[দারউল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল আজীজ হাসান কামেল
ফুন্‌নুত তাসবির উদ্‌ দো'য়ী,
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল কাদের সাবোর
মিন আলামুল নসূফ আল ইসলামী,
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল কাদের হামজাহ্‌
জামিলুহু বু'হারিদ
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল ফাত্তাহ্‌ আবদুল মাকসূদ
আল ইমামু আলী বিন আবি তালিব,
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল ফাত্তাহ্‌ আল-ইয়াফী
আল-ইরাক বায়নাল ইনকিলাবিন,
[দারউল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল মুত-আল আস্‌ সায়িদী
আল হুরিরয়াতুল দীনিয়াতু ফিল ইসলাম,
সেমাজা আনাল মুসলিম,
কাদিয়াতু মুজাহেদ ফিস অসলাহ,
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল মজিদ নাফায়ুল মাহামী
আল-সালামুল ইজতামায়ী,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল মুনীম আল-বিহ্
ইকতেসাদুল নকোদ ওয়াল বানোক,
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল মুনয়েম মহম্মদ জিয়াদী
ফুনুনুল হায়াত,
আল-মারদুন নাফ্সী
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল মুনয়েম আজ-জাবাদী
আতা-আ লেনাফসুকা ফারসাতু,
আদকায়ী যাওজুকা ইলান-নাজাহ্,
আয়নাস সায়াদাত
তারিখুল শাখসিয়াতুল জাজায়েতু,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল হাফিজ আবু সাউদ
মহম্মদ ওয়া সাহাবেহী,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবুল হামিদ আহমদ হানাফী
সায়্যারাতুল আরাবুল হেজাজিয়্যাত,
সায়্যারাতুল আরাবুল হালালিয়্যাত,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল হামিদ জোয়াদাতাস্ সাহার
আবুজর আল গিফারী,
হায়াতুল হোসাইন, আব-রাসূলু হান্নাতু মহম্মদ,

সা'দ ইবন আবি ওকাজ,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আবদুল হামিদ হাসান
আল-ওসুলুল ফুননিয়াতা ফিল আদাব,
[দার উল-আন্দালুস, বৈরুত, লেবানন]

আবদুস সালাম হারুন
আল বযানুত তাবেয়ীন,
তাহজিবুস সাহাহ.
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

আব্বাস মাহমুদ আল-ওকাদ
মুজমায়ু উল আহিয়ায়ু,
ইবন আর রুমী হায়াতুহু ওয়া শেরহু,
আস-সাদিকাতু বিন্‌তি সিদ্দীক,
আবকারিয়াতে উমর,
আবকারিয়াতে সিদ্দিক,
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

আবি ইসহাক আল-কিরওয়ানী
জাহরুল আদাব,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আলী আদম
নাজাতুফিল হায়াতু ওয়াল মুজতামায়ু,
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

আলী রাফায়ী
মাহাসেনুল ইসলাম,

আলী-আর-রায়য়ী
আস-সাওরাতুল আয়ারল্যান্দিয়াতা

আলী আল-জারেম
দালিলুল বালাগাতুল ওয়াজিহাত,

আলী আব্দুর রাজ্জাক
মিন আসারি মুসতফা আবদুর রাজ্জাক
[মাকতাবাতুল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ আমীন
আশ-শারকু ওয়াল গারবু,
ফায়জুল খাতের,
জাহিউল ইসলাম, জাহাবাল ইসলাম,
ফাজরুল ইসলাম,

আহমদ আল-বাতাবী, ডক্টর
আল জিনসূল বাশারী

আহমদ আল-শুরবাসী
আল কাসাস ফিল ইসলাম,
ফি আলেমুল মাকফুফীন,
সালুআত আলা আশ্শাতীয়ু,
গুরবাতুল ইসলাম

আহমদ আস্-সাবী মহম্মদ
বালজাক,
ফাওশিহী আও আল হুববায়ু আল- হামরায়ু

আহমদ আবদুর রহমান মুসতাফা
তাওফীক আল-হাকীম

আহমদ আতীয়াতুল্লাহ্
কামুস আস-সাওবাতাল মিসরিয়্যাতা,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ জাকী, ডক্টর
সা'আতেন্ সাহের

আহমদ ফখরী
আল-হাজারাতুল মিসরিয়্যাতা,

আহমদ তাইমুর
আ'লমুল মুহেন্দেসীন ফিল ইসলাম,

আহমদ বাকোর
হাজিহি হেইয়া আশ্-শাজালিয়াতে

আহমদ মহম্মদ আল-হাওফী, ডক্টর
আল হায়াতুল আরাবিয়্যতা মিনাস্ শেরুল জাহেলী,
আবুল হায়ান আত্ তাওহিদী

আহমদ রুশদী সালেহ
আল-আদাবুশ শা'বী

আহমদ লুৎফী আস্-সায়ীদ
আদ-দাকতোর মহম্মদ হোসাইন হায়কল,

আহমদ শায়ের
তারিখুল নাকায়েদ ফিশ শেরুল আবাবী

আহমদ সায়ীদ মাহমুদ
আল-ইনশাউল আসারী
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ হাসান আজ-জুবাত
ওহিউর রেসালাত
[দার-উল মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ হামদী আন না আল
আল ওয়াতানাল আরাবী,
[দার-উল-আন্দালুস, বৈরুত, লেবানন।]

আহমদ হোসনী আহমদ
মুশকেলাতুদ দওলাব
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

ইউসুফ কারাম
তারিখুল ফালাসাফাতাল ইউনানিয়াতা
আল আকলু ওয়াল বুজুদ
[জোহাইব বা'আল বাকী, বৈরুত, লেবানন।]

ইউসুফ সাবারী আল-হেজাজী
আল-মুমেনুনা বিল ইনসান
[দার-উল আন্দালুস, বৈরুত, লেবানন।]

ইবরাহীম আবদুল মজিদ আল-লেবান
ওয়া সায়েলুন তাজদিদুল মুজতামায়ু
[দার-উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

ইবরাহীম আবদুল কাদের আল-মাজানী
হাসাদুল হাকিম,
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবান।]

ইবরাহীম আল-গাতরিফী
আল-আ'মালু ওয়াল ইনতাজ
[দার-উল-আন্দালুস, বৈরুত, লেবানন।]

ইবরাহীম মহম্মদ হাবীব
ওয়ুব আল হেকম ওয়া ওয়ুব আল-মুজতামায়ু
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

ইবরাহীম আল-হাদ্দাদ
আল আসতারাকিয়াতুল আমালিয়াতু
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

ওসমান খলীল ওসমান, ডক্টর
মুজেজা আল-কানুন আল-আদারী
আদ-দীনু কারাতাবাল ইসলামিয়্যাতা
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

ওসমান খযরাত
মোবফোলজিয়া আন-নাবাত
[দার-উল-আন্দালুস, বৈরুত, লেবানন।]

কামেল আন নাহাস, ডক্টর
সায়কালিযাতুজ্ জামিব

কামেল মেহদী
আনিকিত
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

খালেদ মহম্মদ খালেদ
লেকাইয়া লা তাহরাসু ফিল বাহাব,
মাআ আলাত তারিক মহম্মদ ওয়া মাসিহ্
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

জাকারিয়া আলী ইউসুফ
ইজতামা উল জয়ূশ আল-ইসলামিয়্যা,
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

জাকী মুবারক
আন-নাসারুল ফুনুনী,
[জোহাইর বা'আদ বাকী, বৈরুত, লেবানন।]

জামাল উদ্দীন আর রামাদী
আদাবুল বাশারী

জালাল উদ্‌দীন সুয়ূতী
সানানান নেসারী
[দার উল মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

জুরজী জায়দান
তারিখুল তামাদ্দুন আল ইসলামী,
বানাতুল নাহদাতুল আরাবিয়্যাতা,
আল-আরব ফিল ইসলাম,
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

তাওফীক আল হাকীম
ফুনূনুল আদাব
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈকত, লেবানন।]

তাকী উদ্‌দীন আল- মাকরিজী
আগাসাতুল ওম্‌মাতু বিকাশফেল গাম্‌হে

তাহা আবদুল কাদের সারোব
জামাল আবদুল নাসের রাজুলু গায়রা ওয়াজহেত্‌ তারিখ,
দাওলাতুল কুরআন,
[মাকতাবাতাল মা' আরেফ, বৈরুত, লেবানন।]

তাহা হোসাইন, ডক্টর
হাফেজ ও শাওকী
আদিব
তাজদিদ জিকরী আবিল উলা
হাদিস উল আরবাআ
ফিল আদাবিজ জাহেলী
ফসুল ফিল আদাব ওয়ান নাকাদ
• মাআল মুতানাব্বী

মুসতাকবালাম্ সাকফোতা ফি মিশর
[মাকতাবাতাল তুজ্জাবী, বৈরুত, লেবানন ।]

বুতরুস আল-বুসতানী
মা' আরেকাল আরব ফিল আন্দালুস
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন ।]

মহম্মদ আবদুল্লাহ্ আস্-সামান
বেসালাতে রামদান
আবকানিদ্ দোআতুল ইসলামিয্যাতা
আসাদুল হেকম ফিল ইসলাম

মহম্মদ আবদুল্লাহ্ ওসমান
দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস

মহম্মদ আবদুল্লাহ দারাজ, ডক্টর
আস-সাওম তারবিয়্যাতা ওয়া জেহাদা

মহম্মদ আওদ মহম্মদ
মিন হাদিস আশ-শারক ওয়াল গাবব

মহম্মদ আবদুল গনি হাসান
তালগিস্থুল বয়ান ফি মুজেজাতিল কুরআন

মহম্মদ আবদুল আজীজ আল-খোলী
ইসলাহাল ওয়াজীদ দী'নী

মহম্মদ আবুল ফজল ইবরাহীম
আল-বুরহান ফি ওলুম আল কুরআন

মহম্মদ আহমদ যাদাল মওলা
আয়্যামুল আরব ফিল ইসলাম

মহম্মদ কুতুব
ফিন নাফ্‌স ওয়াল মুজতামায়ূ

মহম্মদ কুরদ আলী
ইমরাউল বয়ান,
রাসায়েলুল বালাগা
আল-ইসলাম ওয়া হাজারাতাল আরবিয়্যাতা

মহম্মদ গাজ্জালী
মিন মু'আল্লেমুল হাক,
খুলকুল মুসলিম
আকিদাতুল মুসলিম

মহম্মদ খলীফা বারকাত, ডক্টর
ইবাদাতা আল ইলাজুন নাফ্‌সি

মহম্মদ তালায়াত ইসা, ডক্টর
আল-মুজতামায়ূল মিশরী

মহম্মদ বদিউশ্ শারীফ
ফি জেনালিল হুবিরয়াত

মহম্মদ মহীউদ্দীন আবদুল হামিদ
ফাওয়াতাল ওয়াফিয়াত

মহম্মদ হাসান হায়কল
হায়াতু মহম্মদ
আল-ফারুকে উমর

মাহমুদ সালাম জানাতী
আল-মারাতু ইনদা কাদমাউল ইউনান
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরূত, লেবানন ।]

মুসতাফা আবদুল আজীজ, ডক্টর
• মিন কাসাসুল ওলামা

মুসতাফা জায়েদ
সুরাতুল আনফাল

মুসতাফা ফাহমী, ডক্টর
সায়কোলোজিয়াতুত তায়াল্লাম
আশ শাজুজুন নাফ্সি

মুসতাফা সাদেক রাফায়ী
আওরাকুল ওয়ারদ
ওহিউল কালাম
তারিখুল আদাব আল আরব

রাফিক আল-মোহায়নী
তারিখুল খোলাফাতুল মাবীয়াতু ওয়াল আব্বাসিয়তু

সালামাহ্ মূসা
বারনারদ শও
আকলি ওয়া আকলুকা

সালেহ আবদুন
আস-সাকাফাতুল মুসিকিয়্যাতা

হোসাইন ফাওজী
আল মুসিকী উস্ সানফোনিয়াতা
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

কথা-সাহিত্য

আবদুল আ'জীম বাদুবী
আল-আমিরে আ'লা

আবদুল ওহাব আন্-নাজার
কাসাসুল আন্বিয়ায়্

আবদুল কাদের আবু ছুরুস
নুফুসে হায়েবাত

আবদুল হামিদ জোয়াদাতাস্ সাহাব
ফি কাফেলাতেজ্ জামান
সাদা আস-সিনীন
কাসায় মিনাল কিতাবুল মোকাদ্দাসাতা
আন-নাকাব
আল-মুসতানকায়া
হামজাতুশ্ শায়াতীন
আমিরাতু কারতাবাতা
ফিল অজিফাতা

আবদুল হামিদ হানাফী
আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা (সম্পাদিত)

ইউসূফ কামাল আবু জায়েদ
ইনতেকামাল আমির

ইউসূফ ইদরীস
আল-বাতাল—মজমুআতে কাসাসে মিশরিয়্যাতা

ইউসূফ আস-সাবায়ী
মিন হায়াতী
আল-ওয়াস ওয়াসাল খান্নাস
আতীয়াফ
সানাতা আশারাতা ইমরাতিন
আসনা আশারা রাজুলান
আগনিয়াত
আ'নি রাহেলাতা
আরদুন নাফাক
বায়নাল আতলাল

আল বাহাস আনে যাদ্দু
রুদ্দে কালবি
আস-সাকামাত
সামারুল লায়ালী
সেত্তু নেসায়ু ওয়া সেততু রেজালুন
সাওক তাবানাল আসাল
লায়লাতুল খামব
হাজা ওয়া হুব্বু
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

ইবরাহীম আবদুল কাদের আল-মাজানী
ইবরাহীম আস-সানী
[আশরাকাতাল আরাবিয়্যাতা, আল-কাহেরা, মিশর।]

ইবরাহীম আল-খাতীব
মুফামারাতু শাগিরাতু
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

ইবরাহীম বেক জালাল
আল-আমিরে হায়দার

কামাল সানো
ইন্নি আ'তারাফা

খালীল রাওকাজ
কুফর ওয়া ঈমান

জর্জ আমাদো
দোরোবুল জোয়্

তাহা হোসাইন, ডক্টর
আল-আইয়্যাম
আল-ওয়ান

জান্নাতুল শাওক
দোআ উল কারুয়া
শাজারাতুল বুয়ুস
আল ওয়াদাল হক
[মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত, লেবানন।]

তাওফীক আল হাকীম
আহ্‌লল কাহাফ
আরানি আল্লাহ
তাহাতা শামসিল ফেকর
হেমারুল হাকিম
রাকেসাতুল মা'বুদ
রাসাসাতু ফিল কালব
জাহরাতুল আম্‌র
শাজারাতুল হেকম
আওদাতের রুহ্
আহাদাশ্ শায়তান
[মাকতাবাতাল তুজ্জাকী বৈরুত, লেবানন।]

ওয়ুফুরু মিনাশ শারক
রেহলাতু ইলাল গাদ
[আসরাকাতাল আরাবিয়্যাতা, আল-কাহেরা।]

নাজীব আল-আকিকী
আরদ আল্লাহ্

নাজীব মাহফুজ
বাদিয়াতা ওয়া নেহায়াতা
বায়নাল কাসরায়নে
খানাল খালিলী
কাসরুশ্ শাওক
আস-সারাব

আবাসাল আকদার
আল-কাহেরাতুল যাদিদাতা

শাজীয়াতা তামের
আদ-আলাতাস্ সামায্

মহম্মদ আতিয়াহ্ আল-আবরাশী
আবতা'লানাল ফেদাওনা
অরুয়ুল কাসাস
মহম্মদ আল-মারজুকী
আরকুবুল খায়েব

মহম্মদ আস্-সাবার্বী
১০০ কাসাস

মহম্মদ ফরিদ আবু জাদিদ
মা আজ্-জামান
আল-ওন্মু মা'আন

মহম্মদ আবদুল হালিম আবদুল্লাহ্
আলওয়ান মিনাস-সা'আদাত
বায়াদাল গুরুব
সাজারাতুল বালাব
শামসুল খারিফ
গুশনুজ জয়তুন
আল মা'জী লা ইয়ায়ুদ
মিন আজলে ওয়ালেদী
আন-নাফেজাতুল গারবিয়াত

মাহমুদ তাইমুর
আবুল হোল ইয়াতির
ইবন জা'লা
দনিয়া যাদীদাতুন

সাবী কি মুহেব্বের রী
শাবাব ওগানিয়াত
আতাবা ওয়াদুখান
কেজ্‌ব ফি কেজ্‌ব
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

হাওবিয়াতুল বাহার
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

মুসতাফা লুৎফী আল-মুনফালুতী
আল-আবরাত
আল-ফাদিলাতা
আন নাজারা'ত
ফিসাবিলুত্‌ তা'জ
আল-ইনতেকামা

লুৎফী আল-খোলী
বেজালুন ওয়া হাদিদুন

হাসান মু'নেস
হেকায়েত খায়বে সুনান

হাসান রেশাদ
মুরকুল হারিয়াত

হাসান ইসমাইল
গুরানিস খিয়াম
[মাকতাবাতাল তুজ্‌জারী, বৈরুত, লেবানন।]

সালাহ্‌ লাবকী
মিন আ'মাকেল জাবাল
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন।]

———